মানুষের জীবনই তো উপন্যাস

আত্মকথা

খন্দকার আবদুর রহিম

মানুষের জীবনই তো উপন্যাস

খন্দকার আবদুর রহিম

আত্মকথা

খন্দকার প্রকাশনী

www.pathagar.com

পরিবেশনায় ঃ
খন্দকার প্রকাশনী
জাতীয় সাহিত্য সৃজনী সংস্থা
নূরজাহান ভিলা
এতিমখানা রোড
টাংগাইল

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৯৪ ইং
আষাড় ১৪০১ সাল

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ ঃ
কোহিনূর আর্ট প্রেস
২, রমাকান্ত নন্দী লেন, ঢাকা

সৌজন্য মূল্য ঃ ১০০·০০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

- জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র
  বঙ্গবন্ধু এভিনিউ,
  ঢাকা-১০০০।
- কোহিনূর পাবলিকেশন্স
  ৩৮, বাংলাবাজার,
  ঢাকা-১১০০।

The Life of a man is a Novel— AUTOBIOGRAPHY o
KHANDKER ABDUR RAHIM

Distributor :
KHANDKER PRAKASHANI
Nurjahan Villa. Etimkhana Road
Tangail 1900.

Complimentary Price : Taka 100 only.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

স্ত্রী — বেগম নূরজাহান রহিম

ছেলে — পারভেজ

ছেলের বৌ — রুবী বেগম

মেয়ে — মুন্নী

মেয়ের জামাই — মোঃ নাজমুল হুদা তাজ মিঞা

যেটা তোমাদেরই আমরণ হেফাজতের জিনিস সেটা হায়াত থাকতেই তোমাদের হাতে তুলে দিলাম–

খন্দকার আবদুর রহিম

www.pathagar.com

এই লেখকের

☞ শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী
১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খন্ড

☞ বাংলাদেশী উপন্যাসের ধারা
১ম ও ২য় খন্ড

☞ টাংগাইলের ইতিহাস
১ম, ২য় খন্ড

☞ পলাশ ডাঙার উপকথা

☞ যমুনা চরের বাসিন্দা

☞ দুই উঠোনের ছায়া

☞ বারোয়ারী মন

☞ পদ্মা যমুনা মেঘনা

☞ শেষ প্রহরের চিঠি

☞ ফসলের স্বপ্ন

☆ ☆ ☆

www.pathagar.com

মানুষের জীবনই তো উপন্যাস

খন্দকার আব্দুর রহিম

আত্ম কথা

আমি রায় দৌলতপুর গ্রামের এক শরীফ ও খান্দানী বংশে পয়দা হয়েছি। আমার আব্বাজান মুন্সী মোহাম্মদ নূর বক্স খোন্দকার এবং আমার আম্মাজান জামিরন নেসা বিবি খুবই পরহেজগার ছিলেন। তাদের জবানীতে আমি ওয়াকিব হয়েছি যে, ১লা ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল আমার পয়দায়েশের দিন।

আমার নিজের কথা বলার আগে আমার গ্রামের কথা কিছু বয়ান করতে হয়। আমার আব্বাজান যা বয়ান করেছেন, তাতে দেখা যায় আমার গ্রামের একটা চমৎকার ইতিহাস আছে। আমার গ্রামের নাম রায় দৌলতপুর। কিন্তু আমার আব্বাজান বলতেন গ্রামের নাম ছিল শুধু দৌলতপুর। এবং পরে হয়েছিল শরাই দৌলতপুর।

এই শরাই দৌলতপুরকে ইংরেজ আমলে ব্রাহ্মন্য কাল্‌চারের নিশান বরদারেরা রায় দৌলতপুরে বদল ঘটায় ; যেমন তারা মোমেনশাহী কে ময়মনসিংহ, ঈশার ডিহিকে ঈশ্বরদি, কিষান গড়কে কৃষ্ণনগর, আলেপশাহীকে আলাপসিং, কীলায়ে হাতীকে কালিহাতী নবীগঞ্জকে নারায়নগঞ্জ প্রভৃতিতে বদল ঘটিয়েছে।

আমার পাশের গ্রাম রসূলপুর, পঞ্চক্রোশী, জটিবাড়ী ও শাওকোলা। এদের মধ্যমনি দৌলতপুর ধনদৌলতে পূর্ন ছিল। উল্লেখ থাকে যে, রায় দৌলতপুর গ্রামটি কামার খন্দ থানা ও সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত।

ইংরেজ আমল শুরু হওয়ার পর যখন আম-জনতা মালুম করতে পারলো যে, ধলা চামড়ার লোকদের আর কিছুতেই হটাবার উপায় নাই, তখন তারা নছিবের উপর দোষ চাপিয়ে জিন্দেগী কাটাতে থাকে। এদিকে গ্রামে গ্রামে কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বর, প্লীহাজ্বর ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ বালাই হরহামেশা লেগেই থাকতো। তার সঠিক কোনো দাওয়াই ছিল না।

যাদের ধন দৌলত ছিল, যারা চাকরী বাকরী করার মতো লেখাপড়া হাসিল করেছিল, তারা গ্রাম ছেড়ে ইংরেজের গড়ে তোলা আধুনিক শহর কলিকাতায় গিয়ে বসবাস করতো। কিন্তু আমজনতা নছিবে করাঘাত করে গ্রামের ভিটাতেই মাথা গুঁজে থাকতো।

www.pathagar.com

তাদের সেই অসহায় অবস্থার সুযোগে বহু রকমের ফিকিরের লোক ধান্দাবাজির আশ্রয় নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেরিয়ে বিনাশ্রমে রুজি রোজগার করে খেতো। সেই সব ধান্দা বাজেরা শিরনী মানতের বিনিময়ে বালামুসিবত দূর করার ভরসা দিয়ে আমজনতাকে বশীভূত করে রাখতো। তাদের মধ্যে এক শ্রেনীর লোক কামরুপ কামাক্ষার যাদু টোনার তেলেস্‌মাতি দেখিয়েও মুফতে রুজি করে খেতো।

একজনের দরগায় কিছুদিন শিরনী মানত করে সে পুরাতন হয়ে গেলেই নতুন আরেক জনের দরগায় শিরনী মানত করার উৎসাহ যোগাবার জন্য ধান্দাবাজদের হামেশা আনাগোনা ছিল। এভাবে এক এক অঞ্চলে একজনের পর আরেক জন পীর ফকির গজিয়ে উঠতে থাকতো। এভাবে ওলা বিবি, হাওয়া বিবি, শীতলা বিবি, সত্যপীর, কালুপীর, গাজীপীর, মাদার পীর, বদর পীর প্রভৃতি পীর ফকিরের মাজারে শিরনী মানত করা, মোমবাতি জ্বালানো, বাতাসা বিলানো, সাধারন মানুষের মধ্যে রুটিন মাফিক রেওয়াজ পয়দা হয়েছিল।

ইংরেজ আমলে একশত বছরের মধ্যেই গ্রাম বাংলায় শেরেক বেদাত এমন জেঁকে বসেছিল, যা দেখে বিবেকবান জিন্দা দিল লোকেরা বেজায় পেরেশানীর মধ্যে ছিল। তারা পরিবেশের খপপড়ে পড়ে বুলন্দ আওয়াজে প্রতিবাদ করতে সাহস পেতো না; কিন্তু কেউ না কেউ প্রতিবাদ করুক এটা তারা মনে প্রাণে চাইতো।

এই মুদ্দতে সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভীর (১৭৮৭–১৮৩১) নেতৃত্বে অবিভক্ত ভারতে ওহাবী আন্দোলন বা তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া আন্দোলন শুরু হয়। বাংলাদেশের বহু আলেম তরীকায়ে মোহাম্মাদীয়া আন্দোলনে সবক গ্রহন করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। তারা মুসলিম কওম থেকে শেরেক বিদাত দূর করার জন্য ওয়াজ নছিহত করতে থাকে এবং সেই সূত্রে ফতোয়াও দিতে থাকে।

বাংলাদেশের দক্ষিন এলাকায় এই শ্রেনীর আলেমদেরকে বলতো ফারাজী মৌলবী এবং উত্তর এলাকায় বলতো ওহাবী মৌলবী। ফরাজী আন্দোলন বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার প্রবর্তক ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ ও পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া। ওহাবী আন্দোলন ছিল নিখিল ভারতব্যাপী আন্দোলন। আরবী উর্দু ফারশী হিন্দী, পশতু, পাঞ্জাবী, গুজরাটী মাদ্রাজী, বোম্বাই সব ভাষাভাষী আলেমগন ওহাবী আন্দোলনকে শেরেক বেদাত উৎখাতের পাশাপাশি ইংরেজ তাড়াবার লড়াইয়ে পরিনত করেছিলেন।

ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ১৮৩১ ইছায়ী সনে বালাকোট নামক স্থানে ইংরেজ তাড়াবার লড়াইয়ে শাহাদৎ বরন করেন। তাঁর শাহাদতের পর তাঁর অনুসারীগন গ্রামে গঞ্জে শেরেক বেদাৎ উৎখাতের লড়াইয়ে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের সেই শেরেক বেদাত হটাবার লড়াইকে বলা হতো শারা জারি করা।

www.pathagar.com

দৌলতপুর গ্রামে শরা জারি করেছিলেন আমার প্রপিতামত অর্থাৎ আমার দাদার বাপ মৌলবী আব্দুল হামিদ খোন্দকার । শরাজারি হয়ে গেলে অন্যান্য গ্রামের থেকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করার তাগিদেই গ্রামের নাম হয়েছিল শরাই দৌলতপুর অর্থাৎ শরাজারির পর শেরেক বেদাত মুক্ত যে গ্রাম।

কিন্তু ইংরেজ আমলে মুসলমান কওমের নছিব ছিল মন্দ । ১৭৫৭ ইছায়ী সনে জগৎ শেঠ, রায় দুর্লভ, উমিচাঁদ ও নদকুমারের সহায়তায় পলাশী প্রহসন যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলাকে খতম করে এ দেশের দন্ড মুন্ডের কর্তা হওয়ার সৌভাগ্যের কথা ইংরেজরা ভুলতে পারে নাই । কাজেই তারা এদেশের হিন্দু কওমের সাথে নিজেরা গাঁটছড়া বেধে চলতেই অভ্যস্ত ছিল।

১৮৫৭ ইছায়ী সনে সিপাহী বিদ্রোহ বা প্রথম আজাদী লড়াইয়ের পর মুসলমান কওমের অবস্থা আরো নাজুক হয়েছিল । এদেশের গর্দানে চেপে বসা ইংরেজ মনিব মনেপ্রাণে মুসলমানকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গণ্য করতো এবং হিন্দুদেরকে মনে করতো সহায়ক শক্তি কিংবা তাবেদার শ্রেনী হিসাবে । অফিস আদালত সর্বত্র হিন্দু কওমের আধিপত্য এবং একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত ছিল । ১৮৭১ থেকে ১৮৮১ ইছায়ী সনের মুদ্দতে ইংরেজ সরকার দেশব্যাপী তাবেদার শ্রেনী পয়দা করার উছিলায় পারিবারিক পদবী ও নাম ঠিকানা রদ বদলের জন্য বিভিন্ন অংকের ফিস্ ঘোষনা করেছিল । সেই ঘোষনার উদ্দেশ্য ছিল এদেশের বুকে ব্রিটিশ মেড্ ভদ্রলোক ও জনপদ পয়দা করা । সেই ঘোষনার ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা সুবিধা ভোগ করেছিল এদেশের হিন্দু কওম । তারা ইংরেজ কোষাগারে ফিস জমা দিয়ে পছন্দ মাফিক পারিবারিক পদবী জোগাড় করেছিল । ইংরেজের কোষাগারে নির্দিষ্ট অংকের ফিস দিয়ে কৈবর্ত বা বৈশ্য শ্রেনীর হিন্দুরা চৌধুরী, সেন, গাঙ্গুলী, মজুমদার বা দাস পদবী এস্তেমালের পারমিট হাসিল করতো । নির্দিষ্ট অংকের ফিস দিয়ে কোনো মহল্লা বা জনপদের নাম পছন্দ মতো বদল করে নিতো । সেই সুযোগেই শরাই দৌলতপুরের রায় বংশীয় জমিদারেরা গ্রামের নাম বদল করে রেখেছিল রায় দৌলতপুর । নবী গঞ্জ যেমন হয়েছে নারায়নগঞ্জ, তেমনি শরাই দৌলতপুর হয়েছে রায় দৌলতপুর ।

এই রায় দৌলতপুর গ্রামটি একটি বিরাট গ্রাম । ইংরেজ সরকার যখন প্রতি বিশ ত্রিশ মাইল অন্তর একটি পোষ্ট অফিস স্থাপন করেছিল, তখন রায় দৌলতপুরে স্থাপিত হয়েছিল একটি পোষ্ট অফিস ।

ইছায়ী ১৯০৯ সনের পরে যখন সারা দেশে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হল তখনই গঠিত হয়েছিল রায় দৌলত পুর ইউনিয়ন বোর্ড ।

রায় দৌলতপুর পোষ্ট অফিস এবং রায় দৌলতপুর ইউনিয়ন বোর্ড সরকারের যাবতীয় রেকর্ডপত্রে জারি হয়ে আছে । শরাই দৌলত পুরের ইতিহাসটা এখন জন শ্রুতিতে গিয়ে ঠেকেছে ।

www.pathagar.com

ইংরেজ আমলেই এই গ্রামটি ছিল ধন দৌলতে পরিপূর্ণ স্বনির্ভর একটি গ্রাম। এগ্রামে ছিল ৩৩ জাতির বাস। হিন্দু কওমের সব শ্রেনী যথা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শুদ্র এবং মুসলমান কওমের হানাফী মোহাম্মদী তাঁতী–কলু প্রভৃতি সব শ্রেনীর লোকই এ গ্রামের বাসিন্দা ছিল এবং এখন পর্যন্ত আছে। ইছায়ী ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পরে কিছু ব্রাহ্মণ ও কায়াস্থ শ্রেনীর লোক গ্রাম ছেড়ে হিন্দু স্থানে পাড়ি জমিয়েছে ;কিন্তু তা সত্বেও ৩৩ জাতির বসবাস এ গ্রামে ঠিকই আছে। বাংলাদেশে এ রকম একটা সমৃদ্ধ গ্রাম খুব কমই আছে।

দুটি বংশ এ গ্রামে প্রায় দশ আনা অংশ জুড়ে আছে। একটি সরকার বংশ অপরটি ভূইয়া বংশ। এদের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা হামেশা লেগেই আছে। এদের পাশা পাশি সিদ্দিক মন্ডল আকন্দ ও প্রামানিক বংশ গুলি নিজ নিজ পরিচয়ে বিকশিত হয়ে আছে।

গ্রামে আমার নিজ ঘনিষ্টদের মধ্যে সরকার বংশের খোতা, খড়ি, টুল তোতা ওয়াশিম, ভূইয়া বংশের কোবাদ, গোলজার, আলতাফ, দিলু, মুকুল আয়না, অন্যান্যদের মধ্যে ময়নাল, হবি, আবুল, প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

আমার পত্র পুরুষ তকি মাহমুদ খোন্দকার করটিয়ার খামপন্নী জমিদারদের কাছ থেকে দৌলতপুর মৌজায় পীরালী সম্পত্তি নিয়ে বসবাস শুরু দেন। তকি মাহমুদ খোন্দকারের পূর্ব পুরুষ চৌহালী উপজেলার আজোগাড়া গ্রামের বাসিন্দা।তকি মাহমুদ খোন্দকার থেকে আমার নিজ পর্যন্ত বংশ তালিকা নিম্ন রূপ ঃ

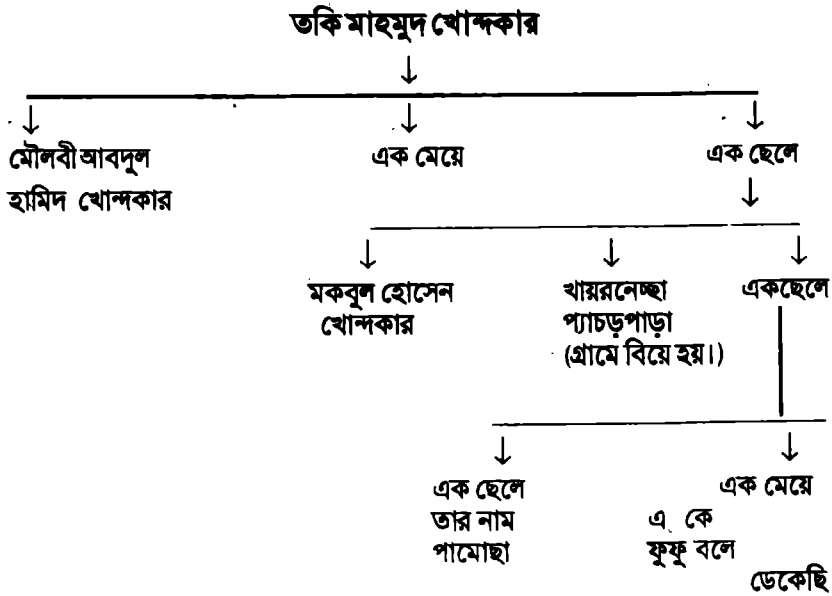

www.pathagar.com

আত্ম কথা

মকবুল হোসেন খন্দকার ↓ বিশু খোন্দকার

- মুজাম বা মোজাম্মেল হোসেন
- এক মেয়ে
- গুটু খোন্দকার
- ২য় স্ত্রীর গর্ভজাত ২ ছেলে

মৌলবী আবদুল হামিদ খোন্দকার

- মোবারক হোসেন খোন্দকার (ইনি ধুবীল গ্রামে বাস করেন
- এক মেয়ে এর শাদী হয় মৌলবী আব্দুল আলী সিদ্দিকীর সংগে সেই তরফের নাতি
  - খাজা গোলজার হোসেন সিদ্দিকী
  - খাজা বিজরি স কাদের সিদ্দিকী
    - খাজা কায়সার সিদ্দিকী ও হেনা
  - খাজা মতিয়ার রহমান সিদ্দিকী
- মওলাবকস্ খোন্দকার

মোবারক হোসেন খোন্দকার (ধুবীল গ্রামে বসতি)

- মোকশেদ আলী খোন্দকার (অকাল মৃত্যু)
- মোয়াজ্জেম হোসেন খোন্দকার
- আব্দুল হাই খোন্দকার
- বড় মেয়ে (চড়িয়া গ্রামের মনসুর রহমানের সাথে শাদী হয়
  - বড় মেয়ে
  - একমাত্র কন্যা
- ছোট মেয়ে কুচিয়া মোড়া গ্রামে শাদী হয়।
  - ১ম
  - ২য়
  - একমাত্র কন্যা

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন → সাইদুর রহমান

মতিয়ার রহমান

বোয়ালিয়া গ্রামের চাঁন মোহাম্মদ তালুক দায়ের সাথে শাদী হয়।

- আবদুল মজিদ তালুকদার
  - শহীদ তালুকদার মমতা, বেবী
  - পুতুল
- আবদুল হাকিম
- আবদুল লতিফ তালুকদার

মওলা বকস খোন্দকার

- নূর বকস খোন্দকার
- মহসিন আলী খোন্দকার (অকাল মৃত্যু)
  - একমাত্র কন্যা (খাদেজাখাতুন বাঙ্গালা গ্রামে মোঃ রোস্তম মণ্ডলের ছেলে মাজেদ মণ্ডলের সাথে শাদীহয়েছে।)
- আবুল হোসেন ওরফে বদিউজ্জামান খোন্দকার
  - ১ম পক্ষের মেয়ে জোবেদা (অকাল মৃত্যু)
  - ২য় পক্ষের ছেলে বেলাল হোসেন খোন্দকার
- বড় মেয়ে প্যাচোর পাড়া শাদী হয়
- ছোট মেয়ে চিলার পাড়া শাদী হয়েছিল

www.pathagar.com

আত্ম কথা

নূর বকস খোন্দকার
জামিরুন্নেছা বিবি

↓

খোন্দকার ওরফে সাখাওয়াৎ হোসেন খোন্দকার	এক ছেলে (অকাল মৃত্যু)	এক ছেলে অকালমৃত্যু)	খন্দকার আব্দুর রহিম লেখক স্ত্রী নূরজাহান নীনা	ছালেহা খাতুন অকাল মৃত্যু রায়পুর বাসী মোঃ ওমেদ আলীর সাথে শাদী হয়
↓				
১ম পক্ষের বড় মেয়ে লাইলী, শিরী (মৃত) মিনু,	২য় পক্ষের আঃ হালিম লতিফা বাদল এক মেয়ে	পারভেজ স্ত্রী রুবি বেগম	মুন্নী স্বামী মোঃ নাজমুল হুদা (তাজমিজ)	

আমার শিশু কালের কিছু বয়ান আমার আম্মা ও দুই ফুফুর কাছে শোনা। আমার আম্মা ছিলেন বাড়ির বড় বৌ। ধান পাট তিল তিশি চিনা কাউন যব ও শিমুলের তুলা প্রভৃতি রবি শস্য ঘরে তোলার যাবতীয় দায়িত্ব ছিল আমার আম্মার উপর ন্যস্ত। কাজেই শিশুকাল থেকেই আমার ভাই বোন প্রত্যেকেই লালন পালন করতো আমার দুই ফুফু। তাদের কোলে পিঠেই আমরা প্রতিটি ভাই বোন আদর পেয়ে বড় হয়ে উঠেছি।

আমরা ভাই বোন ছিলাম সাত জন। কিন্তু চার জন অকাল মৃত্যুতে বিদায় হয়ে গেছে দুনিয়া থেকে। বেচে আছি আমাদের সকলের বড় ভাই খোদাবক্স এবং সকলের ছোট আমি।আমাদের সর্ব কনিষ্ঠ ছোট বোন সালেহা খাতুন আমাদের সংসার থেকে তার স্বামির সংসার পর্যন্ত পাড়ি জমিয়েছিল ;প্রথম সন্তান প্রসবের সময়ই সে মুর্দা সন্তান সহ ধনুস্টংকার রোগে এন্তেকাল করে। সিরাজগঞ্জ পৌর এলাকায় রায় পুর গ্রামের মোঃওমেদ আলী মিঞার সংগে সালেহার শাদি দিয়ে আমার আববা বেজায় খুশি হয়েছিলেন।

কিন্তু যখন সালেহা তার স্বামী সংসার ত্যাগ করে চলে গেলো ,তখন কীভাবে যে সেই শোক আমার আম্মা আববা সহ্য করেছিলেন ,আজো সেকথা মনে পরার সংগে সংগে আমার চোখের পাতা আসুর দানায় ভিজে উঠে।

www.pathagar.com

আমার আববা, আম্মার চোখের সামনে আমাদের ভাই বোন গুলি একে একে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে বড় ভাই খোদাবক্স ও আমি তাদের চোখের মনি ছিলাম বলে মনে হয়।

বিশেষ করে আমার বড় ভাই সংসারে যা তছরুপ করেছে ,তা সত্বেও আমার আববা-আম্মাকে রাগা রাগি করতে দেখি নাই।

আমার বড় ভাই খোদাবক্স গ্রামের পাঠশালায় বাংলা অংকের পাঠ চুকিয়ে কামার খন্দ মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হয়েছিল। আমার আববার আশা ছিল খোদাবক্স মস্ত বড় আলেম হয়ে বংশের মুখ রক্ষা করবে। কিন্তু সে মাদ্রাসায় একদিন যায় তো তিন দিন যায় না। সে মেতে থাকে ফুট বল খেলা নিয়ে।

অবশ্য ফুট বল খেলায় আমার বড় চাচা ও ছোট চাচার বেজায় নেশা ছিল। আমার বড় চাচা মোহসিনুল হক তখন করটিয়া সাদত কলেজে এফ এ পড়তেন। এফ-এ ইংরেজ আমলের শেষের দিকে আই-এ তে পরিবর্তিত হয়। আই-এ, বর্তমানে এইচ, এস, সি, তে পরিবর্তিত হয়েছে।

১৯২৮ সনে আমার বড় চাচা করটিয়া কলেজ থেকে এফ,এ, পাশ করার পর কোনো সরকারী চাকুরীতে না ঢুকে তারাকান্দি মাইনর স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরীতে জিন্দেগী শুরু দিয়েছিলেন, কিন্তু শিক্ষকতর মধ্যেও তিনি ফুটবল খেলা ছাড়েন নাই। আমাদের গ্রামের ফুটবল মাঠটা ছিল দেশবিখ্যাত। গ্রামের মাঠেই আমরা কলিকাতার মোহামেডানের যাদুকর সামাদের খেলা দেখেছি। কলিকাতার মোহনবাগান ও দমদম স্পোর্টিং ক্লাব আমাদের গ্রামের মাঠে ফাইনাল খেলে শিল্ড বিজয় করে নিয়ে যেতো আমাদের গ্রামের বিখ্যাত খেলোয়ার তনুপাল দমদম টিমের সাথে গ্রামে আসতেন। একদিকে আমার বড় চাচা মোহসিনুল হক, আমার ছোট চাচা আবুল হোসেন ও আমার বড় ভাই খোদাবকস, ঘোতা সরকার, গোলজার ভুঞা, জ্ঞান ঠাকুর,সুনীল গাঙ্গুলী প্রমুখ কলিকাতা টিমের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে খেলতো।

আমাদের গ্রামের মাঠে যাদুকর সামাদের খেলা আমরা দেখেছি। সেই কৈশোরের স্মৃতি এখনো তাজা আছে। সারা মাঠ শুধু হেটে বেড়ালেন যাদুকর সামাদ। গ্রামের লোকেরা মাঠের চার পাশে ভীড় করে যাদুকর সামাদের খেলা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু সেদিকে সামাদ সাহেবের কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। সময় শেষ হয়ে যায়। দর্শকদের মধ্যে কিছু কিছু গালি গালাজের আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে। এমন সময় দেখা যায়,আমাদের মাঠের উত্তর কোনা থেকে একটি বল নিয়ে দৌড় দিয়েছেন যাদুকর সামাদ। সোজা দক্ষিন কোনায় পৌছে তিনি এক শর্টে বল প্রবেশ করিয়ে দিলেন গোলে। হাততলি শুরু হয়ে গেলো। হাত তালি শেষ হতে না হতেই বল সেন্টার থেকে আবার চলে গেলো মাঠের উত্তর কোনায় সামাদ সাহেবের কাছে। সামাদ সাহেব আবারও চোখের পলকে দৌড় দিলেন দক্ষিন কোনে এবং এক শর্টে প্রবেশ করিয়ে দিলেন গোলে।

www.pathagar.com

একই হেকমতে মাত্র তিন মিনিটের ব্যাবধানে তিনটি গোল দিলেন যাদুকর সামাদ আমাদের গ্রামের দলকে। আমাদের গ্রামের লোকদের সে জন্য মোটেও আফসোস করতে দেখা গেল না। তার পরিবর্তে সকলকে উল্লাস করতে দেখা গেলো যাদুকর সামাদকে ঘিরে। গ্রামের মানুষের কাছে যাদুকর সামাদ ছিল কিংবদন্তির নায়ক।

সেই ইংরেজ আমল থেকেই আমাদের গ্রামটি পোষ্ট অফিস, ইউনিয়ন অফিস ও ফুটবল মাঠের জন্য আশপাশের পঞ্চাশটি গ্রামের মধ্যে মশহুর ছিল। গ্রামের ফুটবল মাঠ আমাদের গ্রাম থেকে কয়েকজন নামকরা খেলোয়ার পয়দা করেছিল। তাদের মধ্যে একজন আমার চাচা মহসিন খন্দকার এবং অন্যজন আমার বড় ভাই খোদাবকস খোন্দকার। কিন্তু আমার চাচা ও ভাই এর চেয়েও নামজাদা খেলোয়ার ছিলেন আমাদের গ্রামেরই পালবংশের ছেলে তনুপাল। তিনি কলিকাতা মাঠে খেলতেন। তিনি বারাকপুর স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি গ্রামে এসে গ্রামের নবীন খেলোয়ার দের মধ্যে প্রদর্শনী খেলা দেখিয়ে উৎসাহিত করার কোশেশ করতেন।

আমার চাচা মহসিন খোন্দকার ছিলেন প্রায় ছয় ফুট লম্বা এবং জোয়ান মর্দ। লোকেরা ফুটবল মাঠে তাকে জুম্মা খান বলে ডাকতো। আমার ভাই খোদাবকস খোন্দকার সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা এবং জোয়ান মর্দ প্রায় একই রকম। আমার চাচা এবং ভাই উভয়েই ব্যাকের খেলোয়ার ছিলেন। আমার ছোট চাচা আবুল হোসেন ছিলে হাফ ব্যাকের প্লেয়ার। আমিও কলেজ জীবনের পূর্ব পর্যন্ত ফুটবল খেলোয়ার হিসাবে এলাকার মধ্যে নামকরা ছিলাম। বিশেষ করে মফিজ,শাহজাহান ও আমি এই ত্রয়ী শক্তি ছিলাম তৎকালিন ফুটবল মাঠের ত্রাস। আমরা কতোবার কতো দুর্গম গ্রামে হায়ারে খেলতে যেতাম, সে সব গ্রামের নাম ধাম এখন ভুলে গেলেও তার কিছু তিক্ত মধুর স্মৃতি আজো আমাদের তিনজনের কাছে জীবন্ত হয়ে আছে।

এখানে প্রসংগতঃ বলে রাখা ভালো, খেলাধুলার ট্রাডিশন আমাদের পরিবারে রীতি মত বহাল আছে। আমার একমাত্র সন্তান পারভেজ টাংগাইল জেলায় ব্যাডমিন্টন ,ফুটবল ,ক্রিকেট ও সাইক্লিং এ চ্যাম্পিয়ান প্লেয়ার হিসাবে যে রেকর্ড করেছে সেটা টাংগাইলের ইতিহাসে উল্লেখ আছে।

আমার বড় ভাই জীবনের বৃহৎ অংশ ফুটবল খেলেই কাটিয়ে দিয়েছেন। বংশের বড় ছেলে বলেই বোধহয় আমার আব্বা-আম্মা তার উপর রাগ গোশা টিকিয়ে রাখতে পারতেন না। শেষ মেষ তারা ছেলেকে সংসারে বাঁধার ব্যবস্থা গ্রহন করলেন। চিলার পাড়া গ্রাম থেকে এক হল্‌দে পক্ষীর ছাও এর মতো খুবছুরাত ডালিমন নেছাকে পুত্র বধু করে ঘরে আনলেন। তাও যদি তাদের সুপুত্র ঘরে আট্‌কে থাকে।

কিন্তু খোদাবক্‌সের মতিগতি আগপাছ একই রকম রইলো। সে সকালে আম্মার কাছ থেকে আবদার করে পানি পান্তা খেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতো ফুটবল খেলার আনজাম আয়োজনে। কোনো দিন রাত্রিতে দশ এগারোটার সময় ফিরে আসতো। কোনো দিন রাত্রিতেও আসতো না। সেদিন তাদের বেটার বউ এর জন্য

www.pathagar.com

আব্বা-আম্মার চোখের ঘুম হারাম হয়ে থাকতো। আমি তখন পাঠশালায় পড়তাম। সে সময় আমাদের বাড়িটা ছিল আনন্দের হাট। আমার সেই কাঁচা চোখে আমি আনন্দের হাটই দেখতাম। কারচোখে কতোটা পানি ছিল সেটা বোঝার মতো বয়স আমার তখন হয় নাই।

ইছায়ী ১৯২৮ সনে আমার বড় চাচা করটিয়া সাদত কলেজ থেকে এফ·এ· পাশ করে তারাকান্দি মাইনর স্কুলে শিক্ষকতার চাকরী নিয়ে দীর্ঘ দিন বাড়ি মুখী হন নাই। হিসাব করে দেখা যায় ইছায়ী ১৯২৮ সনে আমারও জন্ম হয়েছে।

আমার দাদা মওলা বক্স খোন্দকার আমার ঘর বিরাগী বড় চাচাকে বাড়ি ফিরিয়ে আমার জন্য তারাকান্দি গিয়েছিলেন একথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

আমার দাদা তাঁর তৎকালিন উচ্চশিক্ষিত ছেলেকে ধুবীল জমিদার বাড়ির ডাকসাইটে নায়েব মোহনপুর গ্রাম নিবাসী বছির উদ্দিন সরকারের একমাত্র খুবছুরাত কন্যা ফাতেমা বেগমের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। তখনকার আমলের বাপ মায়ের চোখে ফাতেমা বেগম বিবাহযোগ্য বিবেচিত হলেও আসলে তিনি ছিলেন নাবালিকা। আমার কলেজ ফেরৎ চাচা তার ঘরে নাবালিকা বউ দেখে মনের দুঃখে বাড়ি থেকে তার কর্মস্থল তারাকান্দি মাইনর স্কুলে গিয়ে কয়েক বছর গুম মেরে ছিলেন ; আর বাড়িমুখী হন নাই।

এদিকে আমি আমার আব্বার কাছে ছেপাড়া ছাড়িয়ে কোরান শরীফ ধরেছি। আমাদের বাড়ির দুই বাড়ী ফর্দে মছির মৌলবী সাহেবের বাড়িতে গিয়ে তার কাছে উর্দু রাহে নাজাত ও ফার্সি কায়দা শিখতে শুরু দিয়েছি।

এমন সময় দেখলাম আমার দাদা মওলা বক্স খোন্দকার অতীব খুবছুরাত এক কন্যাকে বাড়িতে এনে দক্ষিন দুয়ারী ঘরে জায়গা করে দিলেন। কয়েকদিন পরে দাদা চলে গেলেন তারাকান্দি। সেখান থেকে ধরে আনলেন আমার চাচা মোহসিন খোন্দকারকে। আমি দেখে চোখ ছানাবড়া করলাম। বাড়ির সবগুলি মানুষের চেয়ে উঁচু লম্বা তাগড়া জোয়ান আমার সেই চাচা। কাছারী ঘরে পাঁচওয়াক্ত নামাজ জামাতে পড়তেন আমার দাদা, আব্বা ও দুই চাচা। যেহেতু আমার আব্বা নূর বক্স খোন্দকার ছিলেন বড় আলেম, সেই হেতু তিনি হতেন ইমাম। দাদা, বড় চাচা ও ছোট চাচা এরা হতেন মোকতাদী। সেই জামাতে দাঁড়ালে সকলের মাথার উপর দিয়ে মাথা দেখা যেতো আমার বড় চাচা মোহসিন খোন্দকারের।

ইতিপূর্বে বয়ান করেছি, ফুটবল মাঠে গ্রামের লোকেরা আমার বড় চাচাকে বলতো জুম্মা খাঁ। 'কিন্তু আমি বলবো, আমার চাচা জুম্মা খানের চেয়ে দুই আনা নিম ছিলেন।

দাদা ঘরে ফিরিয়ে আনার পর আমার চাচা মোহসিন খোন্দকার সত্যিকার ভাবেই ঘরমুখী হয়ে পড়লেন। তারা কান্দিতে গিয়েই তিনি ফিরে আসতেন। বাড়িতে এলে তিনি যেতে চাইতেন না। এ অজুহাতে সে অজুহাতে বাড়ীতে থাকতেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ নারাজ হতে শুরু দেওয়ায় শেষে একদিন আমার চাচা তারাকান্দি স্কুলের চাকুরী ছেড়েই দিলেন।

www.pathagar.com

আমার যে চাচি সাবালিকা না হওয়ার জন্য আমার চাচা তারাকান্দি মাইনর স্কুলে চাকুরী নিয়ে দীর্ঘদিন বাড়ি থেকে গায়ের হয়ে ছিলেন, সেই চাচি সাবালিকা হওয়ার পর, কেন যে আমার চাচা তারাকান্দি স্কুলের চাকরীটাই ছেড়ে দিলেন, সেটা বোঝার বয়স আমার তখন হয় নাই।

আমার চাচা ও চাচি আমাকে সন্তানতুল্য লালন পালন করতেন। আমার চাচা আমার আম্মাকে বলতেন

ভাবী! রহিমের দাবী তুমি ছাইড়া দাও।

রহিম তো তোমাগোরেই ছাওয়াল। আমি দাবী করমু ক্যা?

আমার আম্মা হেসে হেসে জবাব দিতেন।

আপা! তাই যেন ঠিক থাকে, বলতেন আমার চাচি আম্মা!

আমি তখন চাচির কোলে বসে তার হাতের বানানো ভাতের নলা মুখে তুলে চিবাতে থাকতাম। সেই সব কথা গুলি আমাকে নিয়েই বলা হতো বলে আমি খুব মজা পেতাম।

ইছায়ী ১৯৩৯ সনে দুনিয়া জোড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাছিরে বাংলাদেশে জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। তার ফলে দেশের সর্বত্র জনজীবনে দারুন পেরেশানী শুরু হয়। আমার ছোট চাচা তখন নিউ স্কীম মাদ্রাসার পড়াশোনায় ক্ষান্ত দিয়ে চাষাবাদের কাজে শরীক হন। এতকাল আবাদ বসত করতেন আমার দাদা এবং আব্বা জান, তাদের সাথে ছোট চাচা শরীক হওয়ার ফলে আবাদ বসতে খুব জোর পয়দা হলো। আমার দাদা ছিলেন সরকার বাড়ির মসজিদের ইমাম এবং আব্বাজান ছিলেন পাড়ার মসজিদের ইমাম। পাড়ার মসজিদ হচ্ছে মোহাম্মদী জামাতের। সরকার বাড়ীর মসজিদ হচ্ছে হানাফী জামাতের। বাপবেটা উভয় মসজিদের ইমাম। একই বাড়ী থেকে দুই জামাতের জন্য দুইজন ইমাম মেনে চললেও হানাফী মোহাম্মদী জামাতের মধ্যেকার ব্যবধানটা দূর হতো না কিছুতেই। হানাফী জামাতের লোকেরা মোহাম্মদী জামাতের লোকদের বলতো লা মোযাহাবী। যারা মোযাহাব স্বীকার করে না, তারা লা মোযাহাবী–এটা মিথ্যা কোনো তহমত নয়। তবুও লা মোযাহাবী বললে অনেকেই ক্ষেপে যেতো।

একবাড়ি থেকে বাপবেটা দুইটি বিপরিতমুখী জামাতের ইমাম হিসাবে কতোটা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন, সেটা তারাই মালুম করতে পারবে যারা এ রকম দু একটা নজির আর কোথাও দেখেছে। এমন বিরল ঘটনা আমাদের জানা নাই। হানাফী জামাতের ইমাম হিসাবে আমার দাদার যোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত।

আমি অনেক দিন দাদার বিছানাতেই থাকতাম। দাদার সাথে শুক্রবারে আমি হানাফী জামাতের মসজিদে নামাজ পড়তে যেতাম। আবার কোনো কোনো দিন আব্বার সাথে যেতাম পাড়ার মসজিদে মোহাম্মদী জামাতে নামাজ পড়তে।

দাদার কাছে হানাফী জামাতের জুম্মার নামাজের নিয়ম শিখে সেখানে এস্তেমাল করতাম। আবার আব্বার কাছে মোহাম্মদী জামাতের জুম্মার নামাজের নিয়ম শিখে সেখানে এস্তেমাল করতাম।

www.pathagar.com

এভাবে মোহাম্মতী ও হানাফী উভয় জামাতের শিক্ষা আমার মধ্যে মিলিত হওয়ার ফলে সেই ছোটকাল থেকেই আমি দুই জামাতের ভেদাভেদ দূর করার নিয়াত বেঁধেছিলাম।

আমার ছোট চাচা আবুল হোসেন খোন্দকার ওরফে বদিউজ্জামান যখন নিউ স্কীম মাদ্রাসার পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে আবাদবসতে মন বসালেন, তখন দুনিয়াজোড়া মহাসমর ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। তাতে আমাদের দেশের অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পড়েছে। ঘরে ঘরে দৈন্য দশা শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধের আগে যে টাকায় যা পাওয়া যেতো যুদ্ধের মধ্যে তার চারগুন টাকায় তা পাওয়া যায় না। ফলে মানুষের পুঁজি শেষ হতে থাকে; কিন্তু বছর ঘুরে আসে না।

আমাদের সংসারেও টানাটানি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ছোট চাচা এসে আবাদ বসতে শরীক হওয়ার ফলে লাংগল এক খানা বেশী হল। আগে ছিল দাদা ও আব্বাজানের দুটি লাংগল। দুই জোড়া গরু। ছোট চাচার দৌলতে হল তিনটি লাংগল। তিনজোড়া গরু। আমাদের গ্রামের উপরে দাদা ও আব্বাজানের যা কন্ট্রোল ছিল তাতে তারা যদি গ্রামের হিন্দু জোতদারদের সমুদয় জমি বর্গা চাষ করতে চাইতেন, তাই তারা পেতেন। কেননা, বর্গাচাষ করে জোতদারের অংশ ইনছাফ মতো তার বাড়ীতে পৌছে দেওয়ার অভ্যাস খুব কম লোকেরই ছিল। কিন্তু ইমাম বাড়ীতে সে সম্পর্কে তিল মাত্র সন্দেহ ছিল না। ইমাম বাড়িতে দুধে কখনো পানি মিশানো হতো না। ইমাম বাড়ির দুধের দোনাটা তেল দিয়ে রোদে শুকিয়ে রাখা হতো।

সকাল বেলা দুধের জন্য আসতো রায় বাড়ি মুখার্জি বাড়ি বা ঠাকুর বাড়ির লোক। তাদের সামনেই সেই তেলে শুকানো দোনায় দুধ দুইয়ে পাকা মাপে মেপে দিতেন আমার দাদা কিংবা আব্বা। মুখ ফুটে কেউ প্রশ্ন তুলতো না। অথচ সেই লোকই আফসোস করে বলতো, অমুক বাড়ীতে দোনার মধ্যেই পানি থাকে। সেই দোনায় দুধ দুইয়ে মেপে দেয়। একসের দুধ জ্বাল দিয়ে অর্ধেক করে ফেললেও দুধের পানসে স্বাদ মরেনা।

দ্বিতীয় মহাসমরের ডামাডোলের মধ্যেও আমাদের সংসারের মধ্যম গোছের স্বচ্ছলতা ছিল। ছোট চাচার শাদী মোবারক খুব শান শওকতের সাথে করার খায়েশ থাকলেও আমার দাদা কিছুতেই রাজী হলেন না। খান্দানী পরিবারের শাদী মোবারকে যেটুকু না করলেই নয়, সেটুকুই দাদা আনজাম করলেন। একটা তাজী ঘোড়া ভাড়া করে আনলেন। সংগে থাকলো দুলহিনের পালকী।

আমার চাচা মাথায় পাগড়ী পরে ঘোড়ায় উঠে বসলেন। দাদা আমাকেও ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দিলেন। ছোট চাচা আমাকে খুব আদর করতেন। তিনি বললেন, রহিম ! তুই ভাল করে আমার কোমর ধরে থাক।। দুলকি চালে তাজি ঘোড়া চলতে লাগলো দুলহিনের বাপের বাড়ি দশশিকা গ্রামের দিকে। সংগে পালকী এবং বরযাত্রী।

www.pathagar.com

বিয়ের দিন ছাড়াও ফিরন্নীর দিনও আমাকে চাচা ঘোড়ায় চড়িয়ে তার শশ্বড়বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন তার শশুড় বাড়িতে যা খেয়েছিলাম আজো তার স্মৃতি অম্লান হয়ে আছে। ঘরে পাতা দৈ এক থালা বোঝাই করে এনে দিলেন, তার মধ্যে বড় বড় কদমা দিলেন পাঁচ ছয়টা। কদমাগুলি দইয়ের মধ্যে চুবাতেই গলে লা-পাত্তা হয়ে গেল। সে কি অপূর্ব স্বাদ। কিন্তু পেটে আটে না।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ সন। অর্ধেক শতাব্দী অতীত হয়ে গেছে। কিন্তু আজো আমার ছোট চাচার শশুড় বাড়ীতে ঘরপাতা দৈ খাওয়ার স্মৃতি ভুলি নাই।

আমার ছোট চাচি কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়তো। একবছরের মধ্যে তার একটি মেয়ে হলো। মেয়েটির নাম রাখা হল জোবেদা। কিন্তু সন্তানের জননী হয়েও তার ভিতরের কিশোরীর চপলতা কিছু মাত্র কম-বেশী হলো না। রান্নাঘরে আমার আম্মা ও দু'চাচি কারন অকারনে হেসে গড়িয়ে পড়তো। আমার আম্মা ছিলেন বাড়ির কর্তি। তদুপরি কয়েকটি সন্তানের অকালমৃত্যুর শোকে জর্জারিত। তা সত্বেও ছোট চাচির হাসির প্রভাবে আমার আম্মার মধ্যেও কিছুটা উচ্ছলতা দেখা দিয়েছিল।

আমার দাদা মওলা বক্স খোন্দকার ছিলেন হুশিয়ার ব্যক্তি। তিনি তার তিন বেটার বৌয়ের ছাদ ফাটানো হাসি শুনে উঠোনে দাঁড়িয়ে আমার মাকে শুনিয়ে বলতেন-বড় বৌ! তুমি তো জানো, যত হাসি তত কান্না।

শশুরের কথা শুনে আমার মেঝো চাচি ফাতেমা বেগম হাত দিয়ে আমার ছোট চাচির মুখ চেপে ধরতেন। মুখ চেপে ধরলে কিছুক্ষন তিনি হাসিও চেপে রাখতেন। কিন্তু মুখ ছেড়ে দিলে আবার যেমন তেমনি হেসে গড়িয়ে পড়তেন তিনি।

আমার দাদা যা-ই মনে করুন, আমাদের বাড়িটা আসলে ছিল আনন্দের হাট। সেই আনন্দের হাটে আরো একমাত্রা যোগ হলো যখন আমার বড় ভাইকেও দাদা নিজে পছন্দ করে মেয়ে দেখে শাদী করালেন। দাদা নাতি বৌ দেখার খায়েশ করেছেন। কাজেই আমার আব্বা-আম্মার কোনো ওজর থাকতে পারেনা। তারা কোনো ওজর দেখানও নাই। ডালিমন্নেছা আমার ভাবী, আমার চেয়ে বয়সে বড়। পাকা ডালিমের মতো তার গায়ের রং। দাদার পছন্দের তারীফ সকলেইকরতো।

আমার আম্মা আমার দু'চাচি আমার ভাবীর মতো আরেকটি নতুন বৌ পেয়ে আমাদের বাড়িটা চাঁদের হাটে পরিনত করলেন। গরীবানা হালেও হাসি আনন্দের ভিতর দিয়েই একটি সুখী পরিবার দিন গুজরান করছিল।

১৯৪২ সনের প্রথম দিকের কথা। আমার বড় চাচা মোহসিনুল হক খোন্দকারের ঔরষে একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহন করলো। বহু প্রতীক্ষা ও বহু তাবীজ কবজ ঔষধ পত্রের পর সেই কন্যা সন্তান পেয়ে আমার বড় চাচা ও চাচি গভীর আনন্দে উদ্বেলিত হলেন। সেই কন্যা সন্তানের নাম রাখা হল খোদেজা বেগম। যেহেতু মায়ের নাম ফাতেমা বেগম তাই মেয়ের নাম রাখা হল খোদেজা বেগম।

www.pathagar.com

খোদেজা খুব হৃষ্ট পুষ্ট চেহারার মেয়ে। আব্বা-আম্মার পরিনত বয়সের সন্তান খোদেজা এক বছর বয়সেই নাদুস নুদুস চেহারায় সকলকে তাক লাগিয়ে দিল। আমার বড় চাচা তখন কুষ্টিয়া সেটেলমেন্ট অফিসারের চাকরী করতেন। ঘন ঘন বাড়ি আসতেন এবং খোদেজাকে দুহাত দিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই আবার দুহাত দিয়ে খপ করে ধরতেন। তার আদরের ধরন দেখে আমরা তো ভয়ে সিটকে যেতাম। কিন্তু খোদেজা মোটেই ভয় পেতো না। সে খিল খিল করে হাসতে থাকতো।

খোদেজা যখন আমার বড় চাচির কোল জুড়ে এলো, তখন অনেকেই মনে করেছিল যে এইবার রহিমের আদর কমে যাবে। কিন্তু দেখা গেল যে, সন্তানের আদরের জন্য মায়ের বুক কখনো কৃপণ হয় না। একমায়ের বারটা সন্তান থাকলেও তিনি কোনো সন্তান কেই অবহেলা করেন না। কোন্ সন্তান যে তার চোখের মনি,-একথা কোনো মায়ের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

কাজেই খোদেজার আবির্ভাবের পরেও আমার বড় চাচির কাছে আমার আদর কিছুমাত্র কমলো না।

১৯৪২ সনের শেষের দিকেই আমার বড় চাচা এন্তেকাল করলেন। তখনকার আমলে হার্টফেল বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে এন্তেকালের বিষয় কেউ জানতো না। কেউ হঠাৎ পড়ে গিয়ে এন্তেকাল করলে বলতো কে বা কারা বান মেরেছে। পারনিসাস ম্যালেরিয়াতে একদিনের জ্বরেই অনেকে এন্তেকাল করতো।

আমার বড় চাচা যেভাবে এন্তেকাল করেছেন তাকে তখনকার আমলে যাই বলা হোক, এখনকার বিচারে হার্টফেল ছাড়া অন্য কিছু বলার সংগত কারন নাই। অনেক দিনের ব্যবধানে আমার দাদা ও আমার আব্বা এন্তেকাল করেছেন। হার্টফেলই ছিল তাদের এন্তেকালের কারন। কিন্তু সে ব্যাপারগুলি আমরা যথা সময়ে বয়ান করবো।

আমার বড় চাচার এন্তেকালের পরে আমাদের সোনার সংসারটা একেবারে ছারে খারে যাওয়ার যোগার হল। আমার চাচি খোদেজাকে কোলে নিয়ে বিধবার বেশে মোহনপুর গ্রামে তার আব্বা-আম্মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। যেহেতু এখানে আমার আব্বা-আম্মা ভাই বোন আছে ভাবী আছে, কাজেই আমাকে এখানেই তিনি রেখে গেলেন। কিন্তু যাওয়ার সময় যেভাবে তিনি কান্না কাটি করে গেলেন, তাতে মনে হল, তিনি শুধু দেহটা নিয়েই তার আব্বা-আম্মার কাছে গেলেন। তার আত্মাটা রেখে গেলেন এই খোন্দকার পরিবারে।

১৯৪২ সনে আমি ক্লাশ ফোরের ছাত্র। ক্লাশ ফোরের বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়াবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে তালীম দিচ্ছিলেন গ্রামের হেড পন্ডিত আব্দুল হামিদ ভূয়া সাহেব। আমাদের গ্রামের প্রাইমারী স্কুল থেকে এ পর্যন্ত কেউই ক্লাশ ফোরের বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি পায় নাই। আমাকে দিয়ে বৃত্তি পাওয়ায়ে রেকর্ড পয়দা করার খোয়াব দেখছিলেন হামিদ পন্ডিত সাহেব।

এরই মধ্যে আমাদের সাংসারিক জীবনে শুরু হয়ে গেলো হাসির পরিবর্তে কান্নার দিন। আমার দাদা আমার আম্মাকে হুশিয়ার করতে গিয়ে বলতেন। বড় বৌমা। যত হাসি তত কান্না। দাদার সেই কথা গুলি ১৯৪২ সন থেকেই ফলতে শুরু দিয়েছিল।

www.pathagar.com

আমার চাচিকে আমাদের বাড়িতে ধরে রাখতে না পারার যে দুঃখ, সেই দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়েই আমি বৃত্তি পরীক্ষা দিতে গেলাম। আমাদের পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল সিরাজগঞ্জ জ্ঞান দায়িনী মাইনর স্কুলে। আমি জায়গীর থাকলাম সয়া ধানগড়া গ্রামে মওলানা আব্দুল হামিদ খান তাসানী সাহেবের জ্ঞাতি গোষ্ঠির মধ্যে। প্রায় দুই সপ্তাহ কাল জায়গীর ছিলাম। তখনকার আমলে জায়গীরদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেওয়া হতো।

লোকে বলতো, নিজেরা যাই খাই, কিন্তু বাড়ির জায়গীরকে তো যা-তা-দেওয়া যায়না। কাজেই সে আমলে জায়গীর বাড়ীতে থাকা খাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট আদর যত্ন ছিল। সয়া ধানগড়া গ্রামে আমার জায়গীরদার আমাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করতেন।

বৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করলাম। বৃত্তি পেলাম। গ্রামের মুখ উজ্জ্বল হল। তখন থেকেই ভাবনা চিন্তা চলছিল কোথায় ভর্তি হওয়া যায়। গ্রামের হামিদ পন্ডিত সাহেব আরো আশা দিতে লাগলেন। গ্রামের পাশে চৌবাড়ী হাই স্কুল। সেখানেই ভর্তি হওয়া যায়। কিন্তু পন্ডিত সাহেব পরামর্শ দিলেন, মাইনর বৃত্তি পরীক্ষা দিতেই হবে,

এ রকম মেধাবী ছেলের ভবিষ্যত নষ্ট করা যাবেনা। আমি চলে গেলাম নানার বাড়ি মোহনপুর গ্রামে। আমার সদ্য বিধবা বড় চাচি আম্মার কাছে। অর্থাৎ আমার নানা বছির সরকার ও মামা মিজান সরকারের কাছে।

আমার আপন নানার বাড়ি ছিল গাবের পাড়া গ্রামে। আমার নানার নাম ছিল আলেপ সরকার। তখন জিন্দা ছিলেন না। আমার একমাত্র মামা ফরমান সরকারকে রেখে আমার নানা আলেপ সরকার এন্তেকাল করেছেন।

গাবের পাড়া গ্রামে আমার নানি বেঁচে ছিলেন। আমি আমার নানা বাড়ি প্রায় দশ মাইল রাস্তা পায়ে হেটে যাওয়ার পর আমার হাত পা ফুলে যেতো। আমার নানি আমাকে কোলে বসিয়ে সরিষার তেল গরম করে পায়ে মালিশ করে দিতেন। আমার আপন নানির কথা তাই আমি কখনো ভুলি নাই।

মোহনপুর গ্রামে আমার চাচির আম্মা অর্থাৎ আমার মোহনপুরের নানিও ঠিক আমার আপন নানির মতোই সরিষার তেল গরম করে আমার পায়ে মালিশ করে দিতেন। এ জন্য চোখের পানি ফেলে আমাকে আবদার করতে হতো না। সব নানির প্রাণই এক রকম।

আমার ছোট বোন খোদেজার জন্মের পূর্বে আমি যে আমার বড় চাচির পালিত পুত্র ছিলাম সেটা মোহনপুরের নানা নানী ও মামানী খুব ভালই ওয়াকিব ছিলেন। আমার নানা বছির সরকার এবং মামা মিজান সরকার আমাকে অত্যাধিক স্নেহ করতেন।

বছির সরকার ছিলেন ছিটগ্রস্থ মানুষ। তবুও আমাকে দাদুভাই বলে ডাকতেন এবং আদর করে কাছে বসিয়ে কতগুলি আজগুবী সওয়াল করতেন, যার অর্থ আমি কোনোকালেও জানিনা। তিনি বলতেন, তো দাদুভাই হাঁস নামাজ পড়তে পারে না কেন?

www.pathagar.com

আমার আব্বা মোহনপুর গ্রামে যেতেন কেবল আমাকে আমার চাচি আম্মার কাছে কিংবা নানা নানির কাছে পৌঁছে দেওয়ার গরজে নয়। মোহনপুর গ্রাম অতিক্রম করেই যেতে হয় কুচিয়ামোড়া গ্রামে। সেই গ্রামে বিয়ে হয়েছে আমার আব্বার চাচাতো বোনের। আবার আমার নানা বছির সরকারের ছোট ভাই মছির সরকার বিয়ে করেছেন আমার বড় চাচা অর্থাৎ আব্বার বড় ভাই মরহুম মোকশেদ আলী খোন্দকারের বিধবা বৌকে।

মোকশেদ আলী খোন্দকারের ঔরষের একটি মেয়ে সহ মছির সরকার আমার বড় চাচিকে নিকাহ্ করেছেন। আমার আব্বা যেতেন তাদের বংশের বড় বৌ এবং বংশের প্রথমা কন্যা আব্বার ভাই ঝিকে দেখার জন্য। সেই সাথে নিজের অপর চাচাতো বোনকে দেখতে যেতেন তিনি কুচিয়া মোড়া গ্রামে। আমি আমার আব্বার সাথে কুচিয়া মোড়া গ্রামেও যেতাম। কিন্তু আব্বা যখন বাড়িতে ফিরে আসতেন, আমি তখন থেকে যেতাম মোহনপুর গ্রামে আমার নানা নানির কাছে।

বছির সরকার আমার নানা। অথচ তার ছোট ভাই মছির সরকার নিকাহ করেছেন আমার চাচিকে। আমার চাচির সাথে আছে আমার চাচাতো বড় বোন। আবার মছির সরকারের ঔরষেও আমার চাচির দুটি ছেলে পয়দা হয়েছে। বড়টির নাম রশিদ, ছোটটির নাম ছামাদ। রশিদ আমার সমবয়সী। ছামাদ আমার ছোট। তারা বাপের দিকের হিসাবে আমার মামা, মায়ের দিকের হিসাবে আমার ভাই। অবশ্যি শরিয়ত মোতাবেক বাপের দিকের হিসাবটাই গ্রহনযোগ্য।

একথা অস্বীকার করার উপায় নাই, মোহনপুর গ্রামের সরকার বংশ রায় দৌলত পুরের খোন্দকার বংশের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। মছির সরকারের ছেলে রশিদ পিতার দিক দিয়ে আমার, মামা, মায়ের দিক দিয়ে আমার ভাই; সে-ও আমাদের রায় দৌলতপুর গ্রামেই শাদী করে আমাদের সাথে আত্মীয়তাকে আরো মজবুত করেছেন। রশিদ শাদী করেছে আমাদের গ্রামের নামকরা ফুটবল খোলোয়ার ঘোতা সরকারের মেয়েকে।

মাইনর বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার নিয়াত বেঁধে আমি মোহনপুর নানার বাড়ি গিয়ে মানসিক দিক দিয়ে একটা আঘাত পেয়েছিলাম। নানা নানীর কাছে গিয়ে আমার খাওয়া দাওয়ার পরে প্রায় এক দেড় ঘন্টা কেটে গেল, তবুও আমার চাচি আম্মাকে দেখতে পেলাম না। ইতি উতি করে খুঁজতে লাগলাম। এবং আগে নানা বাড়ি উঠে সোজা চাচি আম্মার কাছে গিয়ে আমি দাঁড়িয়েছি। আমার চাচি আম্মা তখন যেখানে যে অবস্থাতেই থাকতেন, সেখানে থেকে দৌড়িয়ে এসে, আমার সোনা এসেছে, বলে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিতেন এবং গভীর মমতার সংগে আদর করতেন।

এখন আমার নানি বলেন, আয় দাদু ভাই আয়। আমার নানি আমাকে আদর করে তার কোলের কাছে টেনে নেন। কিন্তু আমার মন যে তাতে মোটেই ভরে না, সেটা তিনি মালুম করতে পারেন না।

www.pathagar.com

আমার মিজান মামা ও আমার মামিও কিছু বলেন না। এ বাড়িতে আমার চাচি আম্মাকে না-দেখা মাত্রই যে আমার বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠেছিল, সেটা তারা সকলেই মালুম করেছিলেন বলেই, তারা চেয়েছিলেন আমাকে আস্তে আস্তে ব্যাপারটাবুঝিয়েবলতে।

আমার চোখ দুটো তখন ছলছল করছিলো। আমি সেই অবস্থায় আমার নানির বিছানায় শুয়ে দীর্ঘ পথযাত্রার হয়রানীতে কাহিল হয়ে বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম থেমে উঠে দেখলাম আমার চাচি আম্মা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললেন, সোনা? আমার বড় আপা কেমন আছেন, ছোট আপা কেমন আছেন, আমার বৌমা কেমন আছেন? বৌমা মানে আমার বড় ভাই খোদা বক্‌সের বৌ ডালিমন নেছা।

আমি শুধু মাথা ঝুকিয়ে বুঝাতে লাগলাম, তারা সকলেই ভাল আছেন। আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আমার চাচি আম্মাকে তন্ন তন্ন করে বুঝতে চাচ্ছিলাম, এতবেলা তিনি কোথায় ছিলেন; কোথা থেকেই বা তিনি উদয় হলেন। এমন সময় দেখতে পেলাম হাটি হাটি পা- পা করে আমার ছোট বোন খোদেজা আমার কাছে এসে হাজির। খোদেজা আমাকে একটুও ভোলে নাই। সে ভুলবেই বা কী করে ? তার ও আমার দেহে যে মওলা বক্স খোন্দকারের রক্ত প্রবাহিত।

খোদেজাকে কোলে নেওয়া মাত্র সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আদর জানাতে লাগলো। এমন সময় আমার নানা এসে বললেন, চল দাদু ভাই। আমরা হাটে যাই।

মোহনপুর গ্রামের পশ্চিমে কুচিয়া মোড়া গ্রাম। সেই গ্রামেই কুচিয়া মোড়া হাট। হাটের পশ্চিমেই আমার ফুফুর বাড়ি। আমি মোহনপুর নানা বাড়িতে আসার খবর শোনার পর আমার ফুফু আম্মা উতালা হয়ে ওঠেন আমার মুখ দেখার জন্য। কিন্তু আমি কচিয়া মোড়া বেশী যাই না। আমার ফুফু আম্মা ও আমার ফুফাত ভাইদের শত খাতির যত্ন ও আমার মন ভরাতে পারে না।

মোহনপুর গ্রামে আমার নানা-নানী মামা-মামী-এদের সংগে আমার আত্মার বন্ধন নাই বললেই চলে। কিন্তু কুচিয়া মোড়া গ্রামে আমার ফুফু আম্মা এবং আমার নিজ দেহে মৌলবী আব্দুল হামিদ খোন্দকারের রক্ত হতো প্রবাহিত।

আমি বছির সরকারের মেয়ে ফাতেমা বেগমের গর্ভজাত ছেলে হলে ফাতেমা বেগমের বিধবা হওয়ার পরেও আমার নানা-নানীরা আমারই থাকতেন। যেমন খোদেজার বেলায় তার নানা নানী ঠিক তারই আছেন।

কিন্তু সংসারে বহু কিছুই ব্যতিক্রম দেখা যায়। এবং সেই ব্যতিক্রমগুলি যদি আমরা ঠিকমতো তুলে ধরতে পারি, তাহলে সমাজ জীবনের কিছু চমৎকার ছবি দেখে আনন্দিত হতে পারি।

আমার নানা বছির সরকারের দুটি ছেলে একটি মেয়ে। ছেলে দুটির বিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু বছরের পর বছর তাদের কোনো সন্তানাদি হয় নাই। আমি মিজান মামা ও মামানির কাছে মাঝে মাঝে থাকতাম। তাদের দুজনের আত্মায় একটা সন্তানের কামনা কতো যে তীব্র ছিল, সেটা আমার প্রতি তাদের মমতা দেখেই মালুম করতে পেরেছি।

www.pathagar.com

একটি নাতির মুখ দেখার তীব্র সাধ আহলাদ ছিল আমার নানা-নানির মধ্যেও। সেই সাধ তারা পূরন করেছেন আমাকে পেয়ে। অর্থাৎ আমার নানা-নানী দুধের সাধ ঝোলে মিটিয়েছেন।

কিন্তু যখন আমার চাচি আম্মা ফাতেমা বেগমের গর্ভজাত সন্তান খোদেজাকে পেয়েছেন, তখন আমার নানা-নানী ও মামা মামানীর আত্মার শূন্যতা অনেকটা লাঘব হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমার নানা-নানী মামা-মামানীর শুন্য কোল খোদেজাকে দিয়েই ভরাট হয়েছে।

কিন্তু আমাকেও তারা ছেড়ে দেন নাই। মিজান মামা আমার আপন মামা ফরমান সরকারের চেয়েও আমার নিকটতম ছিলেন। নিঃসন্তান মিজান মামার হৃদয়ের অনেক খানি জুড়ে ছিলাম আমি।

নানার সাথে বেশ কয়েকবার আমি কুচিয়া মোড়া হাটে গিয়েছি। নানা খুব কিপটেপণা করলেও আমার ব্যাপারে তার হাত ছিল উদার। সে আমলে তিলের নাড়ু ও মোয়া কদমা ছিল প্রত্যেক হাট বাজারের প্রধান আকর্ষন। সারি সারি দোকানে মোয়া খাজা, জিলাপী, গজা, কটকট, নই, বাতাসা কদমা, ঝুড়ি, মুড়ি, সাঁচ ইত্যাদি সাজানো থাকতো। হাট ফেরৎ কেউই খালি হাতে বাড়ি ফিরতো না। কিছু না কিছু মিঠাই তারা বাড়িতে ছেলেমেয়ের জন্য সওদা করতো।

আমি যাই খেতে চেয়েছি আমার নানা সেটাই কিনে দিতেন। ওজর আপত্তি ছিল না তার।

এবারে নানা যখন আমাকে নিয়ে বাজারে যেতে চাইলেন, আমি আনন্দে নেচে উঠলাম। কিন্তু নানী বললেন, তোমার আজকে হাটে যাওয়ার দরকার নাই। মিজান হাটে যাচ্ছে। দাদু ভাই ওর মামার সাথে গিয়েই বাজার করে আনতে পারবে।

নানীর কথায় নানা যেন মমের মতো গলে গেলেন বলে আমার মনে হলো। নানা আমাকে ডেকে বললেন, আয় দাদুভাই শোন! আমার জন্য তামাক আনবি। আর তরিতরকারী কিনবি। কৈ মাগুড় মাছ কিনবি। কেমন?

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নানা তার তহবিল থেকে টাকা বের করে আমার হাতে দিলেন। মামার সাথে আমি হাটা দিলাম কুচিয়া মোড়া হাটের দিকে। বাড়ি থেকে খুব বেশী হলেও বিশ পা পথ পাড়ি দিয়েছি। এমন সময় পিছন দিক থেকে ডাকাডাকি শুরু দিয়েছেন আমার নানা। দাদুভাই! দাদুভাই! শুনে যা?

মিজান মামা আমাকে ঠেলা দিয়ে বললেন, যা রহিম! শুনে আয়! নতুবা মহা কেলেংকারী লাগাবেন। আজ তোকে বাড়ীতে ঢুকতেই দেবে না।

তাই নাকি! তাহলে যাই। আমি ফিরে গিয়ে দাঁড়ালাম নানার সামনে। নানা বলতে লাগলেন, তামাকের দোকানে গিয়ে দোকানদারকে বলবি, আমার নানা বছির সরকারের জন্য তামাক দিন। তাহলে ঠিক তামাকই দেবে। আর মাছ কিনবি যেন বেশী তাজাও না হয়, যেন বেশী মরাও না হয়।

www.pathagar.com

আচ্ছা ঠিক আছে, বলেই আমি দৌড়িয়ে গিয়ে মামার পিছ ধরি । মামা তখন বাড়ি থেকে বিশত্রিশ হাত দুরে গেছেন।

নানা পিছন থেকে আবার ডাক শুরু দেন, দাদুভাই? শুনে যা? আয় শুনে যা? মামা ইশারা করেন ফিরে যেতে। বাধ্য হয়ে আবার ফিরে আসি নানার কাছে। নানা প্রশ্ন করেন –

বলতো দাদু, আমি তোকে কি বলেছি? আমি ঝট্‌পট্‌ জবাব দেই, আমি দোকানদারকে বলবো, আমার নানা বছির সরকারের জন্য তামাক দেন। আর মাছ যেন বেশী তাজাও না হয়, যেন বেশী মরাও না হয়। তাজা হলে দাম বেশী লাগবে আবার মাছ বেশী মরা হলে খাওয়া যাবেনা

আমার নানা দুপা এগিয়ে এসে আমার মাথায় স্নেহের হাত বুলাতে থাকেন। তারপর বলেনঃ মাছ বেশী মরা হলে খাওয়া যাবে না। বুঝলি তো দাদু!

আমি মাথা ঝুকিয়ে বুঝাই যে, আমি সব ঠিক ঠিক বুঝে ফেলেছি।

আমার নানা তখন বলেন, বলতো দাদু? আমি কি বলেছি?

আমি ঝট পট জবাব দেই। মাছ বেশী তাজা হলে দাম বেশী লাগবে, বেশী মরা হলে খাওয়া যাবে না।

নানা হাসতে থাকেন। এবং বলেন, এইবার তাড়াতাড়ি যা। তুই দাদু বেজায় আকেলমন্দ হবি।

আমি আকেলমন্দ কথাটার মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে না পেরে নানাকে শুধাই? আকেলমন্দ হলে কী হয় নানা?

দেমাগ বহুৎ ভাল হয়। যা দাদু ভাই। আর দেরী করিস নে?

বলেই নানা আমাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিতেন হাটের পথে। ততক্ষনে মিজান মামা বহু দূরে চলে গেছেন। টানা দৌড়ে গিয়ে মামাকে ধরতাম আমি।

সেদিন হাট থেকে ফিরে এসে রাত্রির খাওয়া শেষ করে নানীর কাছে শুয়ে ঘুমিয়েছি। সকালে উঠে হাত মুখ ধুইয়ে নানীর কাছে সকালের নাস্তা চাচ্ছি। নানী আমাকে বলেন। দাদু ভাই ! তোর নাস্তা বানিয়ে নিয়ে তোর চাচি আম্মা কখন থেকে বসে আছেন। চল যাই ?

বলেই নানি আমার হাত ধরে উত্তরের বাড়ির দিকে এগিয়ে যান। আমার নানার উঠান ছেড়ে মছির সরকারের উঠান পাড় হয়ে গেলেই যে আঙিনা শুরু হয়, সেই আঙিনার রান্না ঘরে নিয়ে আমার নানী আমাকে ছেড়ে দেন। আমি দেখতে পাই, খোদেজা খাচ্ছে। আমার থালা সামনে নিয়ে আমার চাচি আম্মা বসে আছেন।

আমাকে দেখা মাত্র আমার চাচি আম্মা পূর্বে যতটা উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন, ততটা হলেন না বলে আমার বুকে খট্‌ করে কি যেন আট্‌কালো। আমার চাচি আম্মার কন্ঠ থেকে দোমড়ানো একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম।

www.pathagar.com

আয় সোনা ! বয় ? তুই না হাঁসের গোশত এবং চাউলের রুটি খুব ভালবাসিস। এই নে খা ! তোর জন্য বানিয়ে রাখছি কোন্ সকালে। সব ঠান্ডা হয়ে গেল।

আমি খেতে থাকি চুপচাপ। কোনো কথা আমার মুখ দিয়ে গোছায় না। আমি বুঝে উঠতে পারছিনা, হাঁসের গোশ্ত এবং চাউলের রুটি আমাকে খাওয়াবার জন্য আমার নানা-নানীর ঘর ছেড়ে উত্তরের বাড়ির রান্না ঘরে কেন আমার চাচি আম্মা বন্দী হয়েছেন।

খাওয়া শেষে আমি নানীর বিছানায় এসে ফুঁফিয়ে কাঁদতে শুরু দিলাম। আমার নানী যে আমার অন্তরের প্রতিটি কথাই মালুম করেছেন, সেটা তার কয়েকটি সুন্দর কথায় আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম।

আমার নানী বললেনঃ দাদু ভাই ! তোর চাচি আম্মা যাতে তোর নজরের সামনেই থাকে, আল্লাহর মরজিতে সেই ব্যবস্থাই হয়েছে। ঐ উত্তরের বাড়ির তোর মামা জোনার আলীর বৌ মারা গেছে তিনটি ছেলে মেয়ে রেখে। এদিকে ফাতেমাও বিধবা হয়ে এলো একটি মেয়ে কোলে নিয়ে। জোনার আলী ও ফাতেমা এরা দুজন চাচাত ভাই-বোন। আমরা মুরুব্বিরা বসে ঠিক করলাম, এদের দুজনের মধ্যে নিকাহ হলে উভয় কুলই রক্ষা পাবে। মাস দুই আগে এদের নিকাহ হয়েছে। দাদু ভাই! তুই বড় হলে সব বুঝতে পারবি।

আমার চোখের পানি বোধহয় সকলেই দেখেছিল। তাই পরদিনই এই পরিবেশ থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে ভিন্ন একটা পরিবেশে রাখার কোশেশ করা হয়েছিল।

মোহনপুর গ্রাম থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পূর্বে গয়হাটা। গয়হাটা থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পূর্বে আমাদের রায় দৌলতপুর গ্রাম। অর্থাৎ গয়হাটা হচ্ছে আমাদের গ্রাম ও মোহনপুরের প্রায় মাঝামাঝি। কিন্তু মোহনপুরের লোকদের কাছে গয়হাটা খুব প্রিয় স্থান। গয়হাটার হাট খুব বিশাল। গয়হাটা মাইনর স্কুলও খুব নাম করা। মোহনপুরের অনেক শিক্ষিত ছেলেই গয়হাটা মাইনর স্কুলের ছাত্র।

সেই গয়হাটা মাইনর স্কুলে ভর্তি করার জন্য আমার নানার পরামর্শে মিজান মামা আমাকে গয়হাটা নিয়ে এলেন। হেড মাষ্টার সাহেব যখন শুনলেন আমি প্রাইমারী বৃত্তি পেয়েছি, মাইনর বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য খুবই আগ্রহী তখন আমাকে খুবই দরদের সংগে স্কুলে ভর্তি করে নিলেন। স্কুল থেকে পাঁচশ মিটার দূরে স্কুলের সেক্রেটারীর বাড়ী। সেক্রেটারী সাহেব নিজেই আগ্রহ করে আমাকে তার বাড়িতে ঠাই দিলেন। তার বাড়িতে তিনজন জায়গীর আছে। অন্য কোথাও যতদিন আমার জায়গীর না হবে ততদিন আমিও সেক্রেটারী সাহেবের বাড়ীতেই থাকবো। তার তিনটি জায়গীরের সংগে আমিও থাকলে তার ভাতের অভাব হবে না।

www.pathagar.com

কিন্তু বাংলা প্রবাদ হচ্ছে এই যে , একে নিদ্রা, দুইয়ে গল্প, তিনে গন্ডগোল , চারে হাট। সেক্রেটারী সাহেবের বাড়িতে যখন চার জন ছাত্র একত্র হলাম , তখন সে ঘরে পড়াশোনার কোনো পরিবেশ রইলো না। হয়ে গেল হাট। সেক্রেটারী সাহেব আমার বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার কথা ইয়াদ করেই আমার জন্য একটি আলাদা জায়গীর ঠিক করলেন। জাগয়ীরটি স্কুলের কাছাকাছি। গয়হাটা হাটের দক্ষিনপশ্চিম পাড়ায়। জায়গীরদার দুভাই। তারা মধ্যবয়সী। দুজনই বিবাহিত। সংসার ভিন্ন। দুজনই গয়হাটা হাটে পিয়াজ মরিচের দোকান করে। সপ্তাহের ছয়দিন চুটিয়ে আবাদের কাজ করে। বাড়িতে কামলা রেখেছে তিনজন। তার একজন ঠিকা ; বাকী দুজন মাসোহারা গরুর রাখাল। সেই দুজন গরুর রাখাল কাছারী ঘরে রাত কাটায়। সেই কাছারী ঘরের একপাশে আমার জন্য চৌকি ও টেবিল দেওয়া হয়েছে।

সবে মাত্র ক্লাশ ফাইভে পড়ি। একা একা কাছারী ঘরে রাত্রি কাটাতে ভয় করে। তবে কামলা দুজনের জন্য সেই ভয় আমার ছিল না। সারাদিন অক্লান্ত মেহনত করতো দুজন কামলা। কাজেই রাত্রিতে দুমুঠো ভাত মুখে দিলেই তাদের দুচোখে ঘুম নেমে আসতো। দেখতে দেখতেই তারা অঘোড়ে ঘুমিয়ে পড়তো।

আমার জায়গীর ওয়ালা গয়হাটা হাটের দিন প্রায় রাত্রি ৯ টার সময় বাড়ি ফিরতেন। তখন সমস্ত বাড়িটা নিটাল। কেবল কাছারী ঘরে আমি হারিকেল জ্বালিয়ে জেগে জেগে পড়াশোনা করতাম।

জায়গীর বাড়ির ছেলেমেয়েরা ধুলাকাদায় খেলতো ; কিন্তু পড়াশোনার ধারে কাছেও ঘেষতে না। সেজন্য বাপ-মা কারোই কোনো ভ্রুক্ষেপও ছিলনা। অদ্ভুত পরিবার। টাকা কামাই করতো এবং বছর বছর জমি কিনতো।

আমার জায়গীর ঠিক করে সেক্রেটারী সাহেবই কথার কথায় আমার সামনে জাহির করেছিলেন, আকসেদ মিয়ারা মেলা পয়সার মালিক। কিন্তু ভীষন কিপটে। রহিম ! তুমি আল্লাহ ভরসা করে যাও তো ! থাকতে পারো কিনা দেখোগা।

আমি জায়গীর বাড়ি এসে দেখলাম, আজব ব্যাপার। এ বাড়িতে সারা দিন রাত ধানের মলন চলছে। অথচ খাওয়ার সময় ধানের চাউল চোখে পড়েনা। সকালের পান্তা কাউনের চাউল, দুপুরের ভাত, কাউনের চাউল, রাত্রির ভাত কাউনের চাউল। সাথে লাউয়ের পাতা ভাজি অথবা ভর্তা। সেই সাথে পানি ঢলঢল খেসারীর ডাউল। কিন্তু ধানের চাউলের কোনো কিছুই এ বাড়িতে চলে কিনা বলার যো নাই। ধান ও পাট ঘরে তোলা থাকে। ভাল দাম পাওয়া গেলেই বিক্রী হয়ে যায়। জমি পাওয়া গেলে গুদাম সাফ করে সেই জমি কেনা হয়।

সারা বছর খাবার জন্য চিনা কাউনের চাউলই সম্বল।

দুমাস এক নাগাড়ে কাউনের পান্তা কাউনের ভাত, লাউয়ের পাতা ভাজি বা ভর্তা ও খেসারীর ডাউল খেয়ে আমি কালাজ্বরে আক্রান্ত হলাম। আমার প্লীহা বড় হয়ে গেল।

www.pathagar.com

পায়খানা একদম বন্ধ হয়ে গেল। সেক্রেটারী সাহেব আমার এমন মারাত্মক অসুখের খবরে খুবই পেরেশান হলেন। তিনি আমাকে জায়গীর ছেড়ে দিতে বললেন।

আমি চলে গেলাম মোহনপুর। সেখানে মিজান মামা আমার চিকিৎসা করতে লাগলেন। কালাজ্বর থেকে টাইফয়েডে ভুগলাম প্রায় মাস দেড়েক। তারপর যখন গয়হাটা স্কুলে ফিরে এলাম তখন আমার জায়গীর ঠিক হয়ে গেছে রাম কিষ্টপুর গ্রামে মজিবর সরকারের বাড়িতে।

আমার অসুখের সময়েই আমার বড় নানা কছির সরকারের নাতি আব্দুর রহমান মোহনপুরে গিয়ে কয়েকদিন ছিল। আমি গয়হাটা মাইনর স্কুলে বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সুদূর রায় দৌলতপুর থেকে এসেছি, একথা শুনে আব্দুর রহমান আমার প্রতি বিশেষ দরদ অনুভব করেছিল। সে যখন জানতে পেলো যে, আমি একটা ভাল জায়গীর পাচ্ছি না , তখনি সে আমার নানাকে বললো, আমি রহিমের জায়গীর ঠিক করে দেবো। আমার মজিবর চাচার ছেলে ছামাদ গয়হাটা স্কুলে পড়ে। স্কুলটা দূরে বলে ছামাদ একা একা কিছুতেই স্কুলে যেতে চায় না। রহিম মজিবর চাচার বাড়িতে জায়গীর থাকলে ছামাদের পড়াশোনার আরো উন্নতি হবে।

রামকিষ্টপুর গ্রামের মজিবর সরকার সে আমলে ডাক সাইটে লোক ছিলেন ।তিনি তখন বাঙালা ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর। হামেশা তার কাছে লোকজন দেন দরবার করতে আসে। আবার বাঙালা ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব তাকে অনেক সময়ই পালন করতে হয়। সেইজন্য কাজের সুবিধার খাতিরে তিনি বাড়িতে একটা আটচালা টিনের কাছারী ঘর দিয়ে নিয়েছেন। সেই কাছারী ঘরে দুজন মাসোহারা করা কামলা থাকে। দরবারের জন্য টেবিল চেয়ার সে ঘরে সাজানো আছে। কাজেই আমার জন্য রামকিষ্টপুর মজিবর সরকারের বাড়িটি হল সবচেয়ে আরামের। তদুপরি একটু আত্মীয়তার ছোঁয়াচও আছে। আমি বছির সরকারের নাতি–এইটাই ছিল আমার বড় পরিচয়। মোহনপুরের মতো বর্ধিষ্ণু গ্রামের ডাকসাইটে বছির সরকার, তারই নাতি রহিম। বাস এর চেয়ে আর কোনো বড় পরিচয় সে তল্লাটে দরকার হতো না।

১৯৪৩–৪৪ ইছায়ী সনের দেড়টি বছর আমার কেটেছে রাম কিষ্টপুরের মজিবর সরকারের বাড়ীতে। আমার কৈশোর জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন ছিল সেগুলি। এই অবসর জীবনে যখন আমি সেই পিছনের স্মৃতি ঘাটতে যাই, তখন রামকিষ্টপুর গ্রামের জীবন আমার চোখে সবচেয়ে সুখের ও আনন্দের বলে মনে হয়।

মজিবর সরকারের ছেলে সামাদ ছিল আমার ক্লাশমেট। দুজনে গলাগলি বাধা ছিলাম। একত্র গয়হাটা স্কুলে গেছি। একত্র স্কুল থেকে ফিরে এসেছি। ক্লাশে আমি ভালো ছাত্র বলে ছামাদ আমাকে ঈর্ষা করে নাই কখনো। আমি ক্লাশে ভালো ছাত্র এজন্য ছামাদ নিজেই গর্ব বোধ করতো। ছামাদের চাচাত ভাই আবদুর রহমানের আম্মা মোহনপুরের কছির সরকারের মেয়ে তথা বছির সরকারের ভাই। আমি সেই বছির সরকারের নাতি। কছির, বছির, মছির এরা তিন ভাই, কাজেই আমি তাদেরই

www.pathagar.com

একজন আত্মীয়। আমি তো পর নই। সেই জন্য রামকিষ্টপুরের প্রায় সবাই আমাকে অত্যন্ত মমতার চোখে দেখতো। আমার বাড়ি যাওয়ারও সখ হতো না। এমনকি মোহনপুরে আমার চাচি আম্মার কাছেও যেতে ইচ্ছা হতো না।

যেহেতু চাচি আম্মার নিকাহ হয়েছে ,ইতিমধ্যে জনাব আলী সরকারের ঔরষে চাচি আম্মার একটি ছেলেও হয়েছে; সেই হেতু আমার কদর তেমন হওয়ার কথা নয় ভেবেই আমি রামকিষ্টপুরের আদরকেই বেশী বেশী গায়ে মেখেছি।

সেই রামকিষ্টপুরের জীবনটা আরো একটা কারনে আমার কাছে মধুর হয়ে উঠেছিল। আমি তখন গজল গাইতে শিখেছি। আব্বাস আলীর সব গজল আমি খুব সুন্দর গাইতে পারতাম। রামকিষ্টপুরের ছেলেমেয়ে বৌ ঝিরা ছিল আমার গজলের বেজায় ভক্ত। মুরুব্বিরা বাড়িতে না থাকলেই ছেলে মেয়ে বৌ ঝিরা পীড়াপীড়ি করতো আমার গজল শোনার জন্য। আমি একটার পর একটা গজল গাইতাম আর মুগ্ধ শ্রোতাদের তারীফ শুনে উৎসাহিত হতাম।

১৯৪৩–৪৪ ইছায়ী সনের আমল ব্রিটিশ আমলের প্রায় শেষ লগ্ন। তখন রেডিও টেলিভিশন ও সিনেমার কথা কেউই জানতো না। তখন হিজ মাষ্টার ভয়েস কোম্পানীর দৌলতে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল কলের গান। রামকিষ্টপুর গ্রামের আব্দুর রহমান প্রায় প্রায়ই কলের গান ভাড়া করে আনতেন। আমি সেই কলের গান শুনতাম এবং খাতায় লিখে রাখতাম। তারপর সারাদিন রাত সেই গানের কলিগুলো ভাজতাম। দেখা যেতো যে, আমি সেই গানগুলি হুবহু গাইতে পেরেছি। যে গান গজল আমি হুবহু গাইতে পারতাম না, সেজন্য আমার তরফে চেষ্টার মোটেই গাফিলতি ছিল না। কলের গান ভালো করে শুনে আমার সুরের ভুল ভ্রান্তি দূর করার কোশেশ করতাম। আমার সেই কোশেশের ফলে গান ও গজল গেয়ে আমি সবার মন কেড়ে নিতে পেরেছিলাম।

একটি গজল বা গান একবার বা দুবার শুনে কথাসহ তার সুর মনে রাখতে সারা দিনরাত সেই দিকেই আমাকে মগ্ন হয়ে থাকতে হতো। তাতে যে আমার পড়াশোনা প্রায় শিকায় ওঠার যোগাড় হয়েছিল, সেদিকে আমার খুব হুশ ছিল না। গানের দিকে ঝুঁকে পড়ার পর থেকেই আমি কোনো কবিতা বা গল্পের সারমর্ম মুখস্ত রাখতে পারি নাই। পরীক্ষার খাতায় সারমর্ম নিজেই তৈরী করে দিতাম।

সে আমলে অর্থ বই বাজারে প্রচলিত ছিল না। মনে রাখতে হবে , সেটা ১৯৪৩–৪৪ সনের আমল। দুনিয়া জোড়া মহাসমর চলছে। আমরা কিশোররাও পর্যন্ত সেই মহাসমরের প্রভাব মুক্ত ছিলাম না। স্কুলে যাওয়ার পথে উড়োজাহাজ দেখে সবাই মিলে হল্লা করে উঠতাম।

সেই ব্রিটিশ আমলে স্কুলে লেখাপড়া করতে পাঠ্য বই ছাড়া ভিন্ন কোনো সহায়ক বই পাওয়া যেতো না। ক্লাশের শিক্ষক পাঠ্য বই গুলি যেভাবে পড়াতেন, সেইভাবে

www.pathagar.com

ইয়াদ করে রাখতে না পারলে, পরিক্ষার খাতায় লিখে ভাল রেজাল্ট করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

আমি যখন মানুষের মন ভুলাবার শিল্প গান ও গজলের দিকে ঝুঁকে পড়লাম , তখন দশ দিক থেকে আমার উপর তারীফ বর্ষিত হল ঠিকই; কিন্তু ১৯৪৪ সনে ৬ষ্ট শ্রেনীতে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি পেলাম না।

দুনিয়া জোড়া ২য় মহাসমরের (১৯৩৯–১৯৪৫) ধাক্কায় যে অর্থনৈতিক মন্দা পয়দা হয়েছিল, তার ধকল সামাল দিতে না পেরে আমাদের পারিবারিক জীবনে মারাত্মক ধ্বস নেমেছ।

আমি ১৯৪৩–৪৪ এই দুটি বছর বাড়ির বাইরে কাটালেও আমার স্বজন পরিজনদের থেকে আমি একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিলাম না। মাঝে মাঝে বাড়ি এসেছি। দুচার দিন থেকেই আবার চলে গেছি গয়হাটা।

আমার দাদা দাদি আমাকে বেজায় আদর করতেন। আমার দাদা মওলা বক্স খোন্দকার সরকার বাড়ির মসজিদে ইমামতি করতেন। তিনি আরবী ও উর্দু খোতবা পাঠ করতেন। কোরানের আয়াতের তরজমা করে ওয়াজ নছিয়ত করতেন। কিন্তু তিনি বাংলা জানতেন না। আমিই তাকে বাংলা পড়া ও লেখা শিখিয়েছিলাম। জীবনের শেষেও আমার দাদার মধ্যে এলেম হাসিলের তীব্র আকাংখা দেখে আমি তাজ্জব হতাম। শ্লেট পেনসিল নিয়ে হামেশা বাংলা অক্ষর লিখতেন। আমাকে কাছাকাছি দেখা মাত্র, ডাকতেন, আয়তো দাদু! দুটো অক্ষর শিখিয়ে দিয়ে যা। এদিকে আড়াল থেকে আমার খেলার সাথীরা ডাকতো, ওদিকে দাদাও ডাকতেন। আমি দুকূল রক্ষা করে তবে রেহাই পেতাম।

আমার দাদার দেখাদেখি আমার দাদিও আমার কাছে ছেপাড়া পড়া শুরু দিয়েছিলেন। অল্প কিছু শিখতেই দাদির দুটি চোখেই ছানি পড়ে অন্ধ হয়ে গেল। চোখ দিয়ে দেখে ছেপাড়া পড়ার নছিব তার হলো না। সেজন্য তার আফসোসের সীমা ছিল না।

আমার দাদা মাঝে মাঝেই আফসোস করতেন, বুড়িটা যদি আমার আগে যেতো, তাহলেও শান্তিতে চোখ মুদতে পারতাম। আমার এন্তেকালের পর মানুষটার নছিবে বেজায় কষ্ট হবে। অন্ধ মানুষটাকে কে গরজ করে টানবে। যদিও ছোট চাচার মেয়ে জোবেদা এতদিন ঝর ঝরে হয়ে উঠেছে। সেই কচি খুকিই দাদিকে হাত ধরে পিছন বাড়িতে পেশাব ও পায়খানায় নিয়ে যায়। পানি ভর্তি বদনাটা এগিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও আমার দাদার কন্ঠে আফসোস লেগেই ছিল।

আমরা কিশোর বয়সে দাদার সেই আফসোসের কারন বুঝতে পারি নাই। কিন্তু নেক্কার পরহেজগার বান্দার আহাজারি আল্লাহ শুনেছিলেন। তাই আমার দাদার চোখের সামনেই আমার দাদি দুই চোখ চিরকালের জন্য মুদে ছিলেন।

দাদির এন্তেকালের সময় আমি রামকিষ্টপুর গ্রামেই ছিলাম। তার এন্তেকালের খবর পেয়েছিলাম তিনদিন পর।

www.pathagar.com

দাদির এন্তেকালের পর দাদা সংসারের বোঝা টানবার কোনো দরকার মনে করলেন না। ইতি পূর্বে তার মেঝো ছেলে মোহসিনুল হক খোন্দকারের অকাল এন্তেকালে দাদার মধ্যে সংসার বিভাগী মনোভাব তিল তিল করে দানা বাঁধছিল। দাদির এন্তেকালের পর সেটা আরো মজবুত হয়েছিল।

দাদির এন্তেকালের সময় আমি বাড়িতে হাজির ছিলাম না; কিন্তু তার শোক সামাল দিতে না পেরে প্রায় মাসেক খানেক পর জায়গীর বাড়ী থেকে একাই দশ মাইল পথ হেটে আমি বাড়ী এসেছিলাম।

বড়াল নদী পার হয়ে চিলার পাড়া ফুফুর বাড়ীতে এসে আমি একরাত্রি ছিলাম। ফুফু আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইলোনা। সেখানে আমার ফুফাত ভাই কুদ্দুস ছিল আমার খেলার সাথী। কাজেই তাকে পেয়ে আমি তার সাথে আনন্দেই একদিন কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

অতঃপর বাড়িতে গিয়ে দাদির জন্য বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে খানিক ক্ষণ কাঁদলাম।

আমাকে দেখেই দাদা বেজায় খুশি হয়ে উঠলেন। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একসাথে জোহরের নামাজ শেষ করে দাদা,আব্বাজানও চাচা এসে উঠোনে বসলেন। আমাকে দাদা ডেকে নিয়ে কোলে বসিয়ে রাখলেন। তার পর দাদা আমার আব্বাজানও ছোট চাচাকে শুনিয়ে বললেন, আজকের দিন থেকেই আমি তোমাদের দুই ভাইকে আলাদা করে দিলাম। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, এক মাস বড় ছেলে নূরবক্সের ঘরে, পরের মাস ছোট ছেলে আবুল হোসেনের ঘরে খাব। আমার নগদ টাকাকড়ি খুব সামান্যই আছে; সেটা তোমরা আমার এন্তেকালের পরে আমার দাফন-কাফন শেষ করে যদি কিছু বাঁচে, দুভাই সমান ভাগ করে নিও। আমার দুটি মেয়েকে আমি উত্তর চড়ার দু'খানা ক্ষেত দিয়ে দিলাম।

অতঃপর আমি পুনরায় জায়গীর বাড়ি চলে গেলাম। মাস ছয়েক পরে খবর পেলাম আমার দাদা এন্তেকাল করেছেন। দাদি ও দাদা দুজনের মৃত্যু দেখার নছিব আমার হয় নাই।

আমি ১৯৪৪ সনে বাড়ীতে এসে আব্বার সাথে দাদা-দাদীর কবর জিয়ারত করেছি। তখন আমাদের বাড়িটার চেহারা একদম পাল্টে গেছে। বিশাল খোন্দকার বাড়ি ভাগ-বাটোয়ার আঘাতে তছনছ হয়ে গেছে। এভাবে দাদা বেঁচে থাকতেই তার দুটি ছেলেকে আলাদা করে দিলেন। নিজের সমস্ত কর্তৃত্ব ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি রাহেলিল্লাহ হয়ে জিন্দেগী কাটাতে লাগলেন। যে বিশাল পূর্ব দুয়ারী চৌ চালা টিনের ঘরে আমার আব্বা-আম্মা বাস করতেন, যে ঘরে আমরা সবকয়টি ভাই-বোন জন্মেছি ও থেকেছি, সেই বিশাল চৌ চালা টিনের ঘরের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নাই। সেই ভিটার দু'পাশে দুখানা টোঙ পাতা। এক টোঙে ছোট চাচি রান্না-বান্না করেন;

www.pathagar.com

আরেক টোঙে আমার আম্মা রান্না-বান্না করেন। টোঙ হচ্ছে নৌকার ছইয়ের মতো একখানা বাঁকানো চালের ঘর।

১৯৪৫ সনে দুনিয়া জোড়া দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হল। সেই বছরেই আমি বাড়িতে এলাম গ্রামের পাশে চৌবাড়ী ইসলামিয়া হাই স্কুলে ক্লাশ সেভেনে পড়ার জন্য। কিন্তু বাড়িতে এসে দেখতে পেলাম, মহাযুদ্ধের মন্দায় আমাদের আর্থিক অবস্থা ভেংগে চুরমার হয়ে গেছে।

আমার দাদাকে দেখেছি , আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে এক ঘোড়া ধান কিনতে। মহাযুদ্ধের আগে একঘোড়া ধান কিনতে লাগতো আড়াই টাকা। এক ঘোড়ায় ধান আসতো আড়াই মন। তাহলে দেখা যাচ্ছে দাদা প্রতি মন ধান কিনতেন একটাকা দিয়ে। অবশ্য যুদ্ধের ফলে ধান চাউলের দাম কিছু বেড়ে ছিল। আমার দাদা সর্বোচ্চ দেড় টাকা মন ধান কিনেছেন।

২য় মহাযুদ্ধের সময়েও আমরা হাটে বাজারে পাই পয়সা, ডবল পয়সা , এক পয়সা দেখেছি। এক পয়সার মধ্যে পান, সুপারী, খড় তিনটাই পাওয়া যেতো, আধা সেরের মতো কেরোসিন তৈল কিনতে ডবল পয়সা কিংবা তিন পয়সার বেশী লাগতো না। সরিষার তেল ছিল আট আনা সের। ধনী পরিবার প্রতি হাট থেকে চার আনার অর্থাৎ আধা সের সরিষার তেল কিনতো। যুদ্ধের মধ্যেও চাউল চার টাকা, সাড়ে চার টাকা মন বিক্রী হতো। চিনি বিক্রী হতো এক সের পাঁচ সিকায়। তহবন দেড় টাকা, গামছা দুই আনা এবং শাড়ি কাপড় তিন থেকে পাঁচ টাকায় বিক্রী হতো।

কিন্তু ১৯৪৫ সনে যুদ্ধের শেষে বাংলাদেশের বাজার দর বেখাপ্পা মতন বেড়ে গেল। এদিকে মানুষের হাতে পয়সা নাই, ওদিকে জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া। চাউল দশ টাকা মন। ধান পাঁচ ছয় টাকা মন, চিনি পাঁচ সিকা সের, কেরোসিন তেল বার আনা সের। সরিষার তেল আড়াই টাকা সের। তহবন চার টাকা, শাড়ি আট টাকা গামছা দেড় টাকার কমে পাওয়া যেতো না। এদিকে পাটের কোনো দাম নাই। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার ফলে পাটের কোনো খরিদ্দারই রইলো না। কাজেই গ্রামের মানুষ অর্থকরী ফসল পাট, শন, তিল, তিসি বিক্রী করে পুঁজি গঠনের সুযোগ না পেয়ে আবারও মহাজনের কাছে গিয়ে হাত পাততে বাধ্য হলো।

১৯৩৯ সনে শেরে বাংলা ফজলুল হক ও স্যার নাজিমুদ্দীনের উছিলায় ঋন সালিশী বোর্ডের দৌলতে বাংলার কৃষকগন মহাজনদের খপ্পড় থেকে একবার জান বাঁচাবার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৫ সনে মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে দুনিয়াব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারনে আবারও গ্রামের মানুষ সেই মহাজনের খপ্পরেই গিয়ে পড়তে বাধ্য হলো।

এবারে মহাজনেরা নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। আগে টাকা দিতেন, টাকার সুদ, সুদের সুদ আদায় করতেন। এখন টাকা দিয়ে জমির ধান আদায় করতে লাগলেন। টাকা ঠিকই থাকতো, যে জমি বন্ধকী থাকতো, সে জমিতে বছরে যতবার শস্য হতো

www.pathagar.com

চলে গেলেন। তার এন্তেকালের পর তার সুযোগ্য সন্তান অবঃডেপুটি ম্যাজেষ্টিট জনাব আবদুস সাত্তার চৌবাড়ী ইসলামিয়া হাই স্কুলের সেক্রেটারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

সেক্রেটারী জনাব ওয়াহেদ চৌধুরীর এন্তেকালের আগেই আমি জনাব মোজাম্মেল চৌধুরীর বাড়ির জায়গীর ছেড়ে দিয়ে আমার গ্রামের বাড়িতে চলে এসেছিলাম। আমি

চৌবাড়ী ইসলামিয়া হাই স্কুলে ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস এইটে প্রথম স্থান দখল করে ওঠার ফলে আমার গ্রামের মধ্যে আমার কদর বেড়ে গিয়েছিল। কয়েকজন বয়স্ক ছাত্র আমার কাছে মাথাপিছু মাসিক ১০ টাকার বিনিময়ে অংক এ্যালজেব্রা ও জ্যামিতি শেখার জন্য আসতো।

আমার যতদুর মনে পড়ে, সেই ছাত্রদের মধ্যে মঈনুল হক, শাহজাহান, গোলজার, আবুল হোসেন ও হবি ছিলো অন্যতম। তারা ম্যাট্রিক ক্লাসের সব বিষয়েই ভাল ছিল; কিন্তু অংক এ্যালজেব্রা ও জ্যামিতি তে তারা খুবই কাঁচা ছিলো। তারা আমার শুধু দুই ক্লাশ উপরের ছাত্রই নয়, তারা আমার বয়সেও বড় ছিলো। এদের মধ্যে মঈনুল হক ছিলেন আমার মামা।

মঈনুল হক ১৯৩৯ সনে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমাদের গ্রামের গোলাপ সরকারের সাথে এ·আর·পি·তে যোগদান করেছিলেন। ১৯৪৫ সনে মহাযুদ্ধে শেষ হয়ে গেলে, ১৯৪৬ সনে ব্রিটিশ সরকার এ· আর·পি ভেংগে দেয়।তখন মঈনুল ও গোলাপ সরকার গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। গোলাপ সরকার প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কিন্তু মঈনুল অংক এ্যালজেব্রায় ভীষন কাঁচা বিধায় পাশ করতে পারেন না। সেজন্য তারা কয়েকজন মিলে আমার কাছে অংক এ্যালজেব্রা পড়তে আসেন।

মঈনুল হক আমার মামা। ইহিপূর্বে আমি বয়ান করেছি, গাবের পাড়া গ্রামের বাসিন্দা আমার নানার নাম ছিল আলেপ সরকার। সে তরফে আমার আপন মামা ছিলেন ফরমান আলী সরকার। কিন্তু আমার নিজ গ্রামে একটা ফেমিলি ছিল, যে ফেমিলিতে এক ভাইয়ের নাম ছিল আলেপ সরকার, আরেক ভাইয়ের নাম ছিল বছির সরকার। আমার নিজ নানার নাম আলেপ সরকার হওয়ার জন্য আমাদের গ্রামের আলেপ সরকার আমার আম্মাকে মেয়ে হিসাবে এবং আমার আব্বাকে মেয়েজামাই হিসাবে দাওয়াত জিয়াফত দিতেন, আনা-নেওয়া করতেন। সেই নানার বাড়িতে আমার বড়ভাই ও আমিও যাতায়াত করতাম। মোহনপুরের বছির সরকারও আমার নানা। সেইসুবাদে আমার গ্রামের বছির সরকার কেও আমি নানা বলেই ডাকাডাকি করতাম।

তবে আমাদের গ্রামের আলেপ নানা ছিলেন দুনিয়ার ভাল মানুষদের মধ্যে অন্যতম। আমার আপন নানার চেয়ে তার হৃদয়ের মহব্বত খাটো ছিলো না। তার কারণ তার মাত্র দুটি ছেলে। কোন মেয়ে ছিল না। আমার মা কেই তারা মেয়ে হিসাবে পেয়ে খুশী ছিলেন। যদিও আমার নানীর চেয়ে আমার মায়ের বয়স বেশী ছিল এবং আলেপ সরকারের চেয়েও আমার আব্বার বয়স বেশী ছিল, তবুও এই পাতানো আত্মীয়তা

www.pathagar.com

খাওয়া দাওয়া মেলামেশা ইত্যাদি এতটাই গভীর ছিল যে, গ্রামের মানুষ এটাকে স্বাভাবিক চোখেই দেখতো। অর্থাৎ গ্রামের সমাজে আমাদের পাতানো আত্মীয়তাই আসল আত্মীয়তার মর্যাদা হাসিল করেছিল।

মঈনুল মামাকে আমি অংক শিখাতাম যথেষ্ট তাজীমের সাথে! মামার ইজ্জত যাতে কিছু মাত্র ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে আমার হুশ ছিল খুব।

আমি ক্লাশ এইটের ছাত্র অংক কর তাম ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদেরকে। খুবই বিরল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। সেই প্রাইভেট টিউশনীর টাকা দিয়ে আমার ঘরের এক অংশে একটি মুদিখানা দোকান দিয়েছিলাম। যে টাকা প্রাইভেট পড়িয়ে পেতাম, তা দিয়ে আমাদের সাতজন মানুষের একটি পরিবারের খরচ চলতো না। কাজেই একটা মুদিখানা দোকান চালিয়ে আমি আরোকিছু আয় বাড়াবার কোশেশ করেছি। তবে আমার পুঁজি ছিল নিহায়েতই নগন্য। সেই জন্য মুদির দোকান বড় আকারে করতে পারি নাই।

আমার প্রাইভেট টিউশনী খুব ভাল মতোই জমেছিল। আমি ক্লাশ নাইন ও টেনের ছাত্র হিসাবেও চুটিয়ে প্রাইভেট টিউশনী করেছি। টাকার বেজায় ঠেকা আমাদের। আমার আব্বা পাড়ার মসজিদে ইমামতী করতেন আপখোরাকী অর্থাৎ কোনো বেতনও ছিলনা; মজুরীও ছিল না।

কালু সরকারের বাড়িতে তিনি রাত্রিতে মক্তব পড়াতেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আরবী বাংলা পড়াতেন। তাতে সামান্য মুষ্টি পেতেন। সেই মুষ্টির চাউলে আমাদের দুইদিনের খোরাকীও হতো না। আমার টিউশনীর টাকা না হলে আমাদের সাতজনের পরিবারে অনাহার অর্ধাহার প্রতিদিনের ঘটনা হতো।

কিন্তু আমি ক্লাশ এইট,নাইন ও টেনের ছাত্র হিসাবে নিজের পড়া শোনার পাশাপাশি টিউশনী করে সংসার চালিয়ে বাড়িতেই মুদি দোকান চালিয়ে আরো দু'পয়সা রোজগার করেছি।

আমাদের সংসারে এত টানাটানি অবস্থা, তার মধ্যেও ভাইয়ের ফুটবল খেলার নেশা কিছুমাত্র কমে নাই। তার উপরে লাঠিবারি খেলার ওস্তাদী, ম্যাজিক খেলার ওস্তাদী এবং ধূয়াগানের বয়াতীগিরি ইত্যাদি আপখোরাকী কাজে খোদাবকসের জুরি ছিল না। ঘরে তার ডালিমের মতো লাল টকটকে ডালিমুন্নেছা বিবি। তবুও ঘর কুনো না হয়ে সকালে পান্তা খেয়ে খোদা বক্স বাড়ি থেকে কোথায় যেন উধাও হয়ে যেতো; ফিরে আসতো রাত্রি নাগাদ দশ এগারোটায়।

বর্ষা মৌসুমে নাও বাইচ দেওয়া ছিল ভাইয়ের আরেকটা শখ। বহু জায়গায় নাও বাইচ দিয়ে বাইছালদের বয়াতীগিরি করতে করতে খোদাবক্স পানসিনৌকা চালিয়ে আসতো। প্রায় পাঁচ ছয় মাইল দূর থেকে খোদা বক্সের ধূয়াগানের সুর শোনা যেতো। আমরা কান পেতে সেই সুরেলা ধুয়া শুনতাম। এবং ভাবীকে ক্ষেপাতাম, ভাবী; ঐ যে তোমার মাঝি দুনিয়া জয় কইরা আইতাচে !

শুধু খেলাধূলা গান বাজনা ইত্যাদি নিয়ে সারা বছর আমার বড় ভাই খোদা বক্স মেতে থাকতো। কিন্তু আমার আব্বা আম্মা এতই সবুরকারী ছিলেন যে, বড় ভাইকে কখনো উচ্চ বাচ্য কথা বলতে শুনি নাই। আমার আব্বা আম্মা মাটির মানুষ ছিলেন। এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিলনা

www.pathagar.com

ইছায়ী ১৯৪৬, ৪৭ এর আমলে আমার ও কিছু কিছু রাগ গোশা হয়েছে। আমি পড়া শোনাও করবো, টিউশনীও করবো, আবার দোকানদারী করবো, এতা কিছু তো আমার সহ্য হয় না। তবুও সহ্য করতে হতো, কেননা, যে বড় ভাইয়ের উপর সেই রাগের কারণ, দেখা যেতো যে, তিনচার দিন সেই বড় ভাইয়ের কোনো পাত্তা নাই।

বাড়িতে রাগারাগির আঁচ পেলে খোদা বক্স এক নাগাড়ে পাঁচ সাত দিন বাড়িতেই আসতোনা।

খোদাবক্সের ইয়ার দোস্তের কোনো অভাব ছিল না। খেলা ধূলা করতে গিয়ে দশবিশ গ্রামের মধ্যে যে কোনো বাড়িতে খোদাবক্স খোন্দকার পীরজাদার চেয়ে খাতির কম পেতো না। যেকোন জায়গায় গিয়ে আড্ডা জমাতে তার জুরি ছিল না। ম্যাজিক খেলা দেখাতো কিংবা ধুয়াগানের আসর বসাতো, দিনের পর দিন ধুয়াগান গাইতে বলুন, খোদা বক্সের কোনো বিরক্তি নাই। সে হয়রান হতো না।

১৯৪৬ সন থেকেই "লড়কে লেংগে পাকিস্তান" শ্লোগান স্কুলের ছাত্রছাত্রিদের মধ্যে বেজায় চালু হয়ে গিয়েছিল। আমরা কয়েকজন ছাত্র একত্র হলেই "লড়কে লেংগে পাকিস্তান" শ্লোগান দিতে দিতে দৌড়াদৌড়ি খেলাধূলা করতাম। তাতে হিন্দু ছেলেরা ক্ষেপতো। তাদের ক্ষেপতে দেখে আমরা আরো মজা পেতাম। আমরা আরো বেশী জিগির দিয়ে বলতাম "লড়কে লেংগে পাকিস্তান।"

১৯৪৭ সনের শুরু থেকেই পাকিস্তান্তের জন্য আমরা ছাত্র যুবক জনতা বেশী বেশী আন্দোলিত হতে লাগলাম। আমার গ্রামের আমার ইয়ার দোস্তদের মধ্যে শাহজাহান, হবি, গোলজার, ওয়াসিম, আবুল এবাং বড়দের মধ্যে আমার চাচা বদিউজ্জামার আমার ভোই খোদা বক্স এবং গ্রামের খোতা সরকার, ঘড়ি সরকার, গোলাপ সরকার, কুদ্দুস সরকার , মঈনূল, আয়না ভূঞা, ছোটদের মধ্যে তোতা, আলতাফ, পিনু, মুকুল প্রভৃতি পাকিস্তান সংগ্রামে জান কবুল কর্মির ভূমিকা পালন করেছি।

১৯৪৭ সনে আমি ক্লাশ নাইনের ছাত্র। বাড়িতে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদিগকে অংক এ্যালজেব্রা পড়াই, সেই সাথে আমার শোবারঘরের অর্ধেক অংশে বেড়া বিয়ে মুদিখানা দোকান চালাই। আব্বাজান রাত্রিতে মক্তব পড়িয়ে সাপ্তাহিক মুষ্টি পান। তাছাড়া গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আমার আব্বাজানের কাছে পানি-পড়া তাবিজ কবচের জন্য হামেশা মেয়ে- পুরুষ বাড়িতে এসে পাঁচ সিকা; নীচে ছয় আনা পয়সা দিয়ে যায়। এভাবে আমাদের সংসারের গতানুগতিক দিনগুলি চলে যায়।

www.pathagar.com

এর মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। এর মধ্যে পাকিস্তান আসে ইছায়ী ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট। ব্রিটিশ বিদায় হওয়ার পরে পাকিস্তান কায়েম হলেও আমাদের গতানুগতিক জীবন জিন্দেগীর কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখিনা। পরিবর্তনের মধ্যে দেখতে পাই, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু অনীল মুখার্জি ও সুনিল গাঙ্গুলী কলিকাতায় চলে যায়। এরা বিদায়ের সময় বিচ্ছেদের শোকে আমরা কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেই।

সুনীল ও অনিল চোখ মুছতে মুছতে বলে, রহিম ভাই! পরীক্ষা দিয়েই কলিকাতা যাবি। আমার কাছে তারা ঠিকানাও দিয়ে যায়।

আমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করি, তোরা এত সুন্দর ছিমছাম ঘরবাড়ি, এতজমা-জমি, এত ধনদৌলত থুয়ে কলকাতায় যাচ্ছিস কেন?

ওরা জবাব দেয়, বাবা কলকাতায় চলে যাচ্ছেন, তাই আমরাও না যেয়ে আর কী করি।'

ওদের জবাব শুনে মুখ ছোট হয়ে যায় আমার। আমি ওদেরকে যেতে বারণ করলেও ওদের বাবার কাছে গিয়ে দু'কথা বলার সাহস আমার হয় নাই তখন। তারা এলেমদার মানুষ। তারা কী বুঝে আমাদের গ্রামের মধ্যবিত্ত জীবন জিন্দেগীর খোলস ত্যাগ করে অনিশ্চয়তার দিকে পাড়ি দিচ্ছেন, সে কথা তারা ভাল বলতে পারবেন।

আমি বন্ধুদের বিচ্ছেদ ব্যথা ভুলতে না পেরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার বহু পরে ১৯৫২ সনের শেষ দিকে খগেন ভৌমিকের কলিকাতার টালিগঞ্জের বাসায় গিয়ে কিছু দিন ছিলাম। সুনীল গাঙ্গুলীদের বাড়িতে গিয়ে থাকা তো দূরের কথা, শরম পেয়ে ফিরে এসেছি।

আমার ক্লাসমেট ও বন্ধু খগেন ভৌমিক আমাদের গ্রামের ঢুলির ছেলে। হিন্দুদের মধ্যে ঢুলিরা ভূমিহীন শূদ্র। গ্রামের মধ্যে বিঘে খানেকের একটি ভিটা বাড়ি ছাড়া খগেন ভৌমিকের কোনো সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু খগেন ভৌমিক চেহারায় একজন ব্রাহ্মণ সন্তানের মতোই। তার বাবা খরচ জোটাতে পারুক আর নাই পারুক, খগেন আমাদের সাথে গ্রামের পাঠশালায় পড়তো এবং চৌবাড়ি হাই স্কুলেও পড়তো। স্কুলেগরীব মুসলমানদের মধ্যে আমি এবং ভূমিহীন হিন্দুদের মধ্যে খগেন পড়া শোনা করতাম ফুল ফ্রি। আমি প্রাইমারী বৃত্তি পেয়েছিলাম; কিন্তু খগেন বৃত্তি পায় নাই। আমি ক্লাশ এইটের ছাত্র অবস্থায়ও বাড়ীতে ম্যাট্রিক ছাত্রদেরকে অংক এ্যালজেব্রা পড়াতাম এবং সেই টিউশনীর টাকায় সংসার চালাতাম। কিন্তু খগেন শূদ্র বলে তার কাছেকেউ পড়তো না। কাজেই আমাদের গ্রামে খগেনের গলাগলি বাধা বন্ধু হিসাবেতার মনের কথা আমি উপলব্ধি করতে পারতাম। সে চাইতো, সুনীল গাঙ্গুলীর মত একটা স্বচ্ছল জিন্দেগী। কিন্তু হিন্দু সমাজে প্রচণ্ড বর্ণ প্রথার জন্য তার জিন্দেগীর খোলস বদলাবার কোনো উপায় ছিল না। তার একমাত্র উপায় ছিল ম্যাট্রিক পাশ করে কোনো একটা চাকুরী বাকরী জুটিয়ে নিতে পারলে, সেই সুযোগে অবস্থার আমূল পরিবর্তন করা।

www.pathagar.com

সে আমলে ক্লাশ সেভেন থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে পড়াশোনা করতে হতো; নতুবা ম্যাট্রিক পরীক্ষার সুযোগ ছিল না। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান হয়ে গেলেও আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কলিকাতার সিলেবাসের কোনো রদবদল হয় নাই। আমরা ১৯৪৯ সনেও কলিকাতার সিলেবাসে ম্যাধমিক পরীক্ষা দিয়েছি। কিন্তু ১৯৫০ সন থেকেই তৎকালিন ইষ্ট পাকিস্তানে ঢাকা বোর্ডের সিলেবাস চালু হয়ে যায়।

সুনীল গাঙ্গুলী, অনিল মুখার্জি, খগেন ভৌমিক এরা সকলেই কলিকাতায় গিয়ে কলিকাতার সিলেবাসে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। সুনিল মুখার্জি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসার গোছের একটা চাকুরী জুটিয়ে নিয়েছে। খগেন ভৌমিক মাধ্যমিক সার্টিফিকেটে দাস পদবী ধারণ করে কলিকাতা করপোরেশনে একটা কেরানী গিরি চাকুরী জুটিয়ে নিয়েছে। রিফিউজি হিন্দু কায়স্থ পরিবারের একটি মেয়েকে বিয়ে করে খগেন দাস সুখের সংসার পেতেছে। এমন দিনে আমি কলিকাতায় গিয়ে আমার প্রিয় বন্ধু খগেনের টালিগঞ্জের বাড়িতে উঠলাম। আমার মনে আছে, এক নাগারে বারদিন ছিলাম আমি আমার বাল্যবন্ধু খগেনের বাড়িতে। বৌদির আদরের কথা আমি আজও ভুলি নাই। আজও মনে পড়ে খগেনের অনেক চাওয়ার অনেকখানিই সে পেয়েছে এবং একটা সুন্দর সুখী নীড় সে গড়ে তুলতে পেরেছে রায় দৌলতপুর ছেড়ে গিয়ে হিন্দুস্থানের জমিনে।

কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবার সুনীল গাঙ্গুলীদের আশা পূর্ণ হয় নাই। তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে জাত যাওয়ার আশাংকায় ব্রহ্মণেরা পশ্চিম বাংলায় হিজরত করেছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাদের জাত রক্ষা হয়তো বা হয়েছে,তবে উচ্চত বাড়াতে পারে নাই।; ক্ষেত্র বিশেষে আব্রুও রক্ষা হয় নাই।

আমি টালিগঞ্জে খগেন দাসের বাড়ী থেকে বারাকপুরে সুনীল গাঙ্গুলীদের বাড়ির ঠিকানায় রওনা হচ্ছি। আমাকে খগেন দা, বললো, রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে টাকা পয়সা বেশী রাখবি না।। নিহায়েত যা না হলেই নয় তাই নিয়ে যাবি। খগেনের কথা মতো বারাকপুর যাতায়াতের পথ খরচা বাদে বাকী টাকা আমি বৌদির কাছে রেখে গিয়েছিলাম।

কিন্তু বারাকপুর সুনীল গাঙ্গুলীদের বাড়ীতে গিয়ে আমি এমন বেকায়দায় পড়বো সেটা ভাবতেও পারি নাই। সুনীল গাঙ্গুলীরা পুরুষ মানুষ কেউই বাড়িতে ছিল না। ছিল কেবল সুনীলের দুই বোন। তারা উভয়েই সুনীলের বড় বলে আমরা দিদি বলে ডাকতাম। দিদিরা আমাকে চিনতে পারলেন ঠিকই। যে রায়দৌলতপুরে তাদের জন্ম সেই গ্রামের মুসলমান ছেলে আমি, আমাকে এত তাড়াতাড়ি তারা ভুলতে পারে নাই।

সুনীলের দুই দিদি আমাকে উঠোনে টুলের উপর বসতে দিয়ে বললো–

–রহিম দাদা! তোমার কাছে কি কিছু টাকা হবে? আমরা গত দুদিন স্রেফ জল খেয়েআছি।

www.pathagar.com

আমি বললাম, কেন সুনীল ও তোমাদের বাবা বাড়িতে থাকে না? তারা সংসার চালায় না? তারা জবাব দিল'–তারা কোলকাতায় থাকে। মাঝে মাঝে এসে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে যায়। কিন্তু আজ কদিন হলো আমাদের হাতে কিছুই নাই।

বড়দিদি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলো। কতোদিন তোমাকে দেখিনাই রহিম দাদা। তুমি আমাদের এখানেই দুইচারটা দিন থাকো।

তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল কোনো পরিবারিক জীব এরা নয়। যদিও এলাকাটা একটা গ্রাম্য পাড়া এবং সেপাড়ায় থোকা থোকা কাঁচা বাড়ি। কিন্তু তবুও আমার ধান্দা লেগে গেল।

আমি গা ঝাঁড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি সুনীলের কাছে এসেছিলাম; সেইসুত্রে আপনাদের ও দেখে গেলাম। আমার পকেটে শুধু ফিরতি ভাড়াটা আছে; এক কাপ চা খাওয়ারও বাড়তি পয়সা নাই। বলেই আমি বাড়ির উঠোন থেকে বেরিয়ে এলাম। বিশ গজ রাস্তা ছাড়িয়ে গিয়ে পিছন ফিরে দেখতে পেলাম, বিষন্নমুখে সুনীলের দুই দিদি আমার চলার পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

১৯৪৭ সনে দেশবিভাগের ফলে অনেকেই আংগুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে; সুনীল গাঙ্গুলীরদা ও হয়ত কলিকাতা শহর জীবনে যা চেয়েছিল তার বেশীই পেয়েছে; কিন্তু সুনীলের দিদিদের মতো অনেক নিরীহ অবলাদের জীবনে যে কতোখানি অভিশাপ নেমে এসেছে, সেটা একনজর দেখার নছিব আমার হয়েছিল বলেই আজো আমি উগ্র ধর্মবোধ বরদাশ্ত করতে পারিনা।

আমি দ্বিজাতিতত্ত্বের একজন আপোষহীন সৈনিক; কিন্তু আমার প্রিয় নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন (ছঃ) এর আদর্শের উল্টো কোনো ধ্যান ধারণা আমার কাছে দুর্বোধ্য। দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ যিনি, তারই আদর্শ কি এমন হতে পারে যে, ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে একজন মুসলমান ছাড়া হিন্দু বৌদ্ধ জৈন, খৃষ্টান শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না। ? আমার মনে হয়, ইসলামকে মুসলমানরাও ভালমতো রপ্ত করতে পারে নাই। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন খৃষ্টানরাও ইসলামের সুন্দর দিকের কোন খোঁজই পায় নাই। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম ম্যাজোরিটি রাষ্ট্র কায়েম হতে দেখে আমাদের গ্রামে হিন্দুদের মতো বহু গ্রামের হিন্দরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াবার ঝুঁকি নিয়েছে।

১৯৪৭ সনে আমার অনেক প্রিয় বন্ধু আমাদের ছেড়ে চলে গেলে আমরা মনে ব্যথা পেয়েছিলাম খুবই, কিন্তুআমরা ছিলাম নাচার। বড়রা যা ভাল মনে করেন; তারা তাই করেছেন সেখানে আমাদের মাথা গলাবার কিছু ছিল না। আমরা নতুন পারিস্থিতিকে মেনে নিয়ে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলাম।

www.pathagar.com

ক্লাশ সেভেন থেকেই আদাচাকি গ্রামের নুরু (নুরুলইসলাম) জোকনালা গ্রামের খন্দকার শামসুল আরেফিন এবং চৌবাড়ী গ্রামের আমির হোসেন চৌধুরী ওরফে মজনু এই তিনজন ছিল আমার পরম প্রিয় দোস্ত।এই তিনজন দোস্তের বাড়ি আমি বহু দিন থেকেছি। ওদের কাছে আমি প্রিয় ছিলাম আমার সুরেলা কন্ঠের জন্য। ওরা তিনজনই আমার গান শোনার জন্য স্কুল থেকে আমাকে নিয়ে যেতো ওদের বাড়িতে। আদাচাকি গ্রামের নূরু ছিল গান পাগল। ওদের বাড়িতে গেলে ওদের বড়ভাই সাদেক আলী ও অন্যান্যরাও আমার গান শোনার জন্য খুবই উৎসুক হয়ে উঠতেন। আমির হোসেন চৌধূরী ওরফে মজনু চৌবাড়ীগ্রামের ওসমান গনি সাহেবের ছেলে। বাজেই তার বই পুস্তক খাতা পত্র কেনার অভাব ছিল না। আদাচাকি গ্রামের নুরুর অবস্থা একেবারে খারাপ ছিল না। তার বড় ভাই সাদেক আলী চাকুরী করতেন সিরাজগঞ্জ শহরে । বাড়িতে আবাদবসতও মন্দ ছিল না। কাজেই বই পুস্তক খাতাপত্র কেনার ব্যাপারে তারও কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু জোকনালা গ্রামের খন্দকার সামসুল আরেফিনের অবস্থা ছিল ভয়ানক করুন। শামসুল আরেফিনের আব্বা বেঁচেছিলেন না। তার বিধবা আম্মা দুটি ছেলেকে নিয়ে জোকনালা গ্রামের বাড়ীতে পড়ে ছিলেন। সামসুল আরেফিনের বড় ভাই বিয়ে করে সংসার পেতিছিলেন। তিনি সকালে উঠে একটা চটের ব্যাগ হাতে নিয়ে মুরীদ বাড়িতে যেতেন। সারা দিন বাদে মুরীদানেরা যা কিছু নজর নিয়াজ দিতো, তাই দিয়ে সংসার চালাতেন। তার মধ্যে শামসুল আরেফিনের পড়ার খরচ জোটানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার কিন্তু খন্দকার শামসুল আরেফিন ছাত্র ভাল ছিল। কাজেই সে স্কুলে ফুল ফ্রি পড়তো। আমারা চারজন ছাত্র–আমি, মজনু, নুরু, আরেফিন ক্লাসের টপ ছাত্র ছিলাম। ক্লাশ সেভেন থেকে ক্লাশ টেন পর্যন্ত আমাদের চার জনের মধ্যে ফার্স্ট সেকেণ্ড থার্ড ফোর্থ স্থান ঘুরপাক খেতো। আমি বাড়িতে প্রাইভেট টিউশানী করে এবং মুদিখানা দোকান চালিয়ে আমার আব্বা আম্মার সংসার চালাতে সাহায্য করতাম। কাজেই আরেফিনের চেয়ে আমাদের অবস্থা খারাপ ছিল না। আরেফিনের বাড়ীতে আমি সময় সময় গিয়েছি। ওদের গরীবানা দেখে আমার খুব কষ্ট হতো। কিন্তু বেচারা আরেফিনকে আমার বাড়িতে কত টানাটানি করেও আনতে পারি নাই। খন্দকার বংশের ছেলে আরেফিন আত্ম মর্যাদায় বেশ টন টনাই ছিল।

আমার আরো কয়েকজন খেলাধূলার ইয়ার দোস্ত ছিল।। আমার শুধু গান গাওয়াই অভ্যাস ছিল তাই নয়। আমার ফুটবল খেলারও ঝোঁক ছিল। ফুটবল খোলার ঝোঁকটা ছিল আমার বংশগত তাছিরের ফল। আমার ভাই খোন্দকার খোদা বক্স তো তার জীবনের প্রায় অর্ধেকটা ফুটবল খেলেই কাটিয়েদিল। তারকথা ইতিপূর্বে বয়ান করেছি। আমি স্কুলজীবনেই ফুটবল খেলা শেষ করেছি। আমার ফুটবলের সবচেয়ে প্রিয় সাথী ছিল আমার গ্রামের শাহজাহান ওরফে টুলু। আর ছিল হালুয়াকান্দি গ্রামের মফিজ। আমি মফিজ ও টুলু

www.pathagar.com

প্রায়ই হায়ারে খেলতে যেতাম।আমরা তিনজনই একটা ফুটবল মাঠ কন্ট্রোল করেছি। ব্যাক বা হাফ ব্যাকে খেলতো টুলু, সেন্টার ফরোয়াডে খেলতো মফিজ, আমি খেল তাম লেফটে। টুলু বল দিতো মফিজকে। মফিজ বল দিতো লেফটে আমার কাছে। আমি সেই বলটি সরাসরি গোল পোষ্টে না মেরে পাস করে দিতাম মফিজকে। মফিজ সেটা গোলে ঢুকিয়ে দেওয়ার কোশেশ করতো। আমাদের তিনজনের এই সমঝোতাপূর্ণ খেলার দরুনই আমরা ত্রয়ী মিলে ফুটবল মাঠের বিশেষ আকর্ষণ ছিলাম।

একথাও উল্লেখ করতে হয়, আমি মফিজও টুলু –এইতিনের মধ্যে ফুটবলের মাঠে যে সমঝোতা ছিল, সেটা আমাদের সাংসারিক জীবনে আদৌ রেখাপাত করে নাই। আমি অধ্যাপনা করে সারা জীবন পুটি টেংড়া মলা, চাপলা, চিংড়ি, ছাইতান মাছের বড় কোনো মাছ কিনে ছেলে মেয়েদের মুখে দিতে পারি নাই। টুলু অর্থাৎ শাহজাহান ম্যাটিকের চৌকাট পার হতে না পেরে কোনো চাকুরীর যোগ্য হয় নাই বলে ঠিকাদারী থেকে দোকানদারী করে কোনো রকমে জিন্দেগী টেনে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু মফিজ হয়েছে নব্য কোটিপতি। মফিজের হয়ত জীবনে বহু চটকদার কেচ্ছা আছে। তার সব কিছু আমাদের জানার কথা নয়। বিভিন্ন দোস্তদের কাছে তার সম্বন্ধে যে টুকু ওয়াকিফ হয়েছি, সেটাও এখানে বয়ানের সুযোগ নাই। যদি আল্লাহর মর্জি থাকে, তাহলে পরে তার কিছু বয়ান এই আত্মকথায় রেকর্ড করার কোশেশ করবো।

আমি চৌবাড়ি ইসলামিয়া হাইস্কুলের ক্লাশ নাইন ছাড়াবার আগেই পাকিস্তান এসে গেল। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান পয়দা হলে আমরা স্কুলের ছাত্ররা পাকিস্তানের পতাকা হাতে মিছিল –গ্লোগান দিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে লাগলাম।

১৯৪৮ সনের মধ্যেই নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের নতুন সরকারের কিছু আলামত শুরু হয়ে গেল। গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত যুবক লড়কে লেংগে পাকিস্তান শ্লোগান দিয়ে মুসলিম লীগের বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল, সেই সব যুব করা যাতে বখাটে খারাপ হয়ে না যায়, সেজন্য গ্রামে গ্রামে সংঘ সমিতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছিল।

আমরা জানতে পারলাম, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী "জিন্নাহ ফাণ্ড" নামে একটি ফাণ্ড খোলা হয়েছে। সেই ফাণ্ড থেকে গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী ও বালিকা শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাইমারী স্কুল কায়েমের জন্য আর্থিক মঞ্জুরী দান করা হচ্ছে। আমি ও শাহজাহান সেই সুযোগ পুরা মাত্রায় গ্রহণ করলাম। আমরা শাহজাহানদের কাছারী ঘরে একটা লাইব্রেরী কায়েম করলাম। শাহজাহান সভাপতি আমি সেক্রেটারী হিসাবে সেই লাইব্রেরী খাতে পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকেএকটা বরাদ্দ লাভ করেছিলাম। লাইব্রেরীটা আমরা এতোটাই সমৃদ্ধ করেছিলাম যে, সেই ১৯৪৮ সনের আমলে যত বাংলা উপন্যাস রচিত হয়েছিল, তার সবই আমরা জোগাড় করেছিলাম। লাইব্রেরীটা পূর্ণাংগ হওয়ার পর আমরা গ্রামের বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটা প্রাইমারী স্কুল

www.pathagar.com

কায়েম করেছিলাম। সেই বালিকা প্রাইমারী স্কুলটাও স্থাপন করেছিলাম শাহজাহানদের বাড়ির কাছে আধিকারী বাবুদের খালি জায়গায়।

আমি সেক্রেটারী হিসাবে প্রতিদিন রবিবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টি তুলতাম। যারা মুষ্টি রাখতো না, তাদের কে অনুরোধ করে মুষ্টির ব্যবস্থা করতাম। সেই মুষ্টির চাউল বিক্রী করে বালিকা প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার জ্ঞানেন দার বেতন দিতাম।

লাইব্রেরী ও স্কুল প্রতিষ্ঠায় আমার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিল ঘড়ি, টুলু তোতা এই তিন ভাই। সেই সাথে গ্রামের আরো কয়েকজন উৎসাহী যুবক । তাদের মধ্যে গোলাপ সরকার, ঘোতা সরকার, মঈনুল হক, গোলজার ভূঞা, দিলু, হবি, আবুল প্রমুখ ছিল প্রধান।

ঘড়ি সরকারের আব্বাকে আমি দেখেছি কিনা আমার ইয়াদ নাই। তবে ঘড়ি সরকারের আম্মার মুখটা আমি কোনো দিনও ভূলতে পারি নাই। তার তিন ছেলে ঘড়ি, টুলু, তোতা ও দুটো মেয়ে। বড় মেয়েটির বিয়ে হয়েছে বংকিরাট গ্রামে আর ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছে চৌবাড়ি গ্রামে। পাঁচটি ছেলে মেয়ের মাঝে আমি যোগ হয়ে ছয়টি পরিণত হয়েছিলাম। শাহজাহানের দুলাভাই, আমারও দুলাভাই। বংকিরাট গ্রামের দুলাভাইয়ের বাড়িতে গেলে শাহজানকে যে চোখে দেখা হতো, আমাকেও সেই চোখেই দেখা হতো। চৌবাড়ি গ্রামের দুলা ভাইয়ের বাড়িতে গেলেও শাহজাহানকে যে চোখে দেখা হতো আমাকেও সেই চোখেই দেখা হতো। আমি কখনো বুঝতে পারি নাই যে, শাহজাহানের মায়ের পেটের বোনেরা আমার বোন নয়। শাহজাহানের মায়ের চোখে আমি ছিলাম তার ছয় নম্বরের সন্তান। এমন মাত্রস্নেহ বিরল আরো বিরল আমার সেই মাত্রস্নেহ লাভের নছিবটা।

১৯৪৮ সনে আমি ক্লাশ টেনে নিজের পড়ার পাশাপাশি সংসারের খরচ চালাবার তাগিদে প্রাইভেট টিউশনী এবং দোকানদারী ছাড়ি নাই। আবার তারই মধ্যে সেক্রেটারী হিসাবে গ্রামের বালিকা বিদ্যালয় ও লাইব্রেরী পরিচালনায় কিছু মাত্র গাফিলতি ছিল নাআমার।

১৯৪৮ সনের শেষ দিকের কথা। আমরা স্কুলের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলের আনজাম করেছিলাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে হুজুগে ছিল মফিজ ও আবুল, চৌবাড়ি গ্রামের চৌধুরী পরিবারের আফজাল, কাদু, কিবরিয়া, শুকুর, দবির প্রমুখ বলরামপুরের মোক্তার, আমজাদ, প্রভৃতি ছাত্রবৃন্দ। উদ্যোগী ছাত্র স্কুলের বার্ষিক মিলাদ যাতে খুব জাকজমকের সাথে সমপন্ন হয় সেজন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তারা প্রথমে মওলানা ভাসানী সাহেবকে মিলাদের প্রধান অতিথি হিসাবে দাওয়াত দিতে গিয়েছিল সিরাজগঞ্জ শহরের সয়া ধানগড়া গ্রামে। কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন জানতে পেরেছিল, মওলানা ভাসানী সাহেব নৌকা যোগে ভাটি অঞ্চলে সফরে আছেন, তখন তারা সিরাজগঞ্জ শহর থেকে আট মাইল পশ্চিমে হাটি কুমরুলগ্রামে গিয়ে দাওয়াত দিয়ে এসেছিল মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ সাহেবকে।

www.pathagar.com

আমাদের স্কুলের মিলাদে আমরা তর্কবাগীশ সাহেবকে দেখে বেজায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। তর্কবাগীশ সাহেবের গায়ের রং পাকা হলুদের মতো। তার চাপ দাড়ি কালো মিচ্‌মিচে। তার গায়ে কালো জোব্বা। তিনি যখন মিলাদ মাহফিলের ওয়াজ শুরু দিলেন,তখন মনে হচ্ছিল যেন,বিশাল এক কলসির মধ্য থেকেশুরু গম্ভীর আওয়াজ বের হয়ে আসছে।

সকলে খুব তারীফ করলো তর্কবাগীশ সাহেবের। সেই সূত্রেই অনেকে বলা বলি করলো মওলানা ভাসানী সাহেবের ওয়াজ শূনলে মানুষ আরো তাজ্জব হতো। স্কুলের সেই মিলাদ উপলক্ষেই অর্থাৎ ১৯৪৮ ইছায়ী সন থেকেই আমরা মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ সাহেবকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেলাম, যিনি পরবর্তী কালে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট এবং গনআজাদী লীগের প্রেসিডেন্ট হিসাবে রাজনীতির আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে কামিয়াবী হাসিল করেছিলেন। সেই সাথে আরো পেলাম মওলানা ভাসানী সাহেবের নাম যশের সাথে পরিচয়ের সুযোগ, যিনি মশহুর হয়েছিলেন আফ্রো-এশিয়া লাতিন আমেরিকার মজলুম জননেতা হিসাবে এবং আমি যার জীবনী রচনা করতে বসে আড়াইহাজার পৃষ্ঠার মধ্যে কোনো রকমে খতম করতে পেরেছিলাম।

আমার যতদূর মনে পড়ে, এই সময় চৌবাড়ী ইসলামিয়া হাই স্কুলের স্বনামধন্য সেক্রেটারী আব্দুল ওয়াহেদ চৌধূরীর এন্তেকালের পর তার সুযোগ্য ছেলে অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি মেজিস্ট্রেট জনাব আবদুল সাত্তার চৌধূরী উক্ত হাই স্কুলের সেক্রেটারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফরম পূরনের যাবতীয় খরচ স্কুল থেকেই মনজুর করা হয়েছিল। বলরামপুর গ্রামের আবদুল হামিদ সাহেব স্কুলের হেডমাষ্টার হিসাবে আমাদের অঞ্চলে মশহুর ব্যক্তি ছিলেন। আমরা ছিলাম তার অত্যন্ত স্নেহের ছাত্র। তার মেহেরবানীতেই আমরা স্কুল জীবরটা স্বচ্ছন্দে পাড়ি দিয়েছি। সে সময় চৌবাড়ি হাইস্কুলের আরো কয়েকজন স্বনামধন্য শিক্ষকের স্নেহমমতা আমরা হাসিল করেছিলাম। তারা হচ্ছেন তামাই গ্রামের হামিদ মাষ্টার আদাচাকি গ্রামের রজবমাষ্টার , আমাদের গ্রামের মছির মৌলভীও কিশোরী মাষ্টার অংকের শিক্ষক মোঃ জয়নাল আবেদীনপ্রমুখ

প্রতিবছরের মতো ১৯৪৮ সনের শেষ দিকে এক্স ষ্টুডেন্টদের বিদায় সম্ভাষনের ব্যবস্থা জাকজমকের সাথেই করা হয়েছিল। আমরাই সে বছর এক্স ষ্টুডেন্ট। আমাদের সেই বিদায় সম্ভাষনকে চিরস্মরনীয় করার তাগিদে আমি একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করে আমার ইয়ার দোস্তদের সাহায্যে ছাপিয়ে প্রীতি উপহারের মতো ছাত্রদের মধ্যে বিলি করেছিলাম এবং এককপি স্কুলের আফিসে বাধাই করে দিয়েছিলাম। আমার সেই কবিতা পড়ে আমাদের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে প্রায় সকলেই সেই কবিতার তারীফ করেছিলেন। বিশেষ করে আমার ক্লাশ শিক্ষক রজব আলী সাহেবের তারীফ ও দোয়ার কথা আমি জীবনে ভুলি নাই।

www.pathagar.com

সেই শস্যের অর্ধেক মহাজনের আড়তে গিয়ে উঠতো। একে বলে বন্ধকী প্রথা। এই বন্ধকী প্রথার দৌলতে গ্রাম গঞ্জের কৃষকেরা নতুন অকেটাপাশের খপ্পড়ে পড়লো। মুক্তির আর কোনো উপায়ই রইলো না।

মহাজনের কাছ থেকে যে-টাকা নিয়ে জমি বন্ধকী রাখা হতো, সে টাকার কোনো সুদ ছিল না সত্য; তবে মহাজনের টাকা খরচ করার পড়ে জমির শস্য বেচে, সে টাকা ফেরৎ দেওয়ার আর কোনো উপায়ও থাকতো না। কেননা, শস্যের অর্ধেক মহাজনকে দেওয়ার পরে বাকী অর্ধেক শস্যে সংসারই চলতো না। খাজনা দেওয়ার জন্য আবার নগদ টাকা হাওলাত করতে হতো। হাওলাত করতে যাওয়া মানেই আবারও জমি বন্ধকী থোয়া। অথ্যাৎ জমি বন্ধকী থোয়া একবার শুরু হয়ে গেলে জমি যতদিন শেষ না হয়, ততদিন বন্ধকী থোয়াও থামেনা।

এভাবে আবারও বাংলার কৃষককুল ভিটে মাটি থেকে উচ্ছন্নে যাওয়ার যোগাড় হলো।

দাদা বেঁচে থাকতে আমাদের সংসারটা ভেংগে পড়ে নাই। কিন্তু দাদার এন্তেকালের পরে সংসারটা আস্তে আস্তে ভেংগে পড়তে শুরু করলো। আমার বড় ভাই খোদাবক্স খোন্দকার যদি খেলাধুলায় মেতে না থেকে হালআবাদে আব্বাজানকে সাহায্য করতেন, তাহলে আমাদের সংসার বোধহয় ভেংগে পড়তো না। কেননা, একই সমান জমি চষে আমার ছোট চাচা আবুল হোসেন খোন্দকার স্বচ্ছল সংসার পরিচালনা করছিলেন।

আমাদের সংসারে আমরা তিনভাই বোন এবং ভাবীর কোলে দুটি কন্যা সন্তান। এই সংসারে আমার আব্বার সাথে আমার বড় ভাই যদি হুশিয়ার হয়ে আবাদ বসত করতেন, তাহলে সংসারে খুব অভাব হওয়ার কথা ছিলনা। কিন্তু আমি গয়হাটা থেকে বাড়িতে এসে দেখলাম, আমার পড়া চালানো তো দূরের কথা, আমাকে দুই বেলা ভালমতো খেতে দেওয়াও আমার আব্বা-আম্মার পক্ষে বেজায় জুলুম।

কাজেই আমি চৌবাড়ী ইসলামিয়া হাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য গিয়ে হেড মাষ্টার সাহেবের কাছে পুওর ফান্ডের টাকায় স্কুলে ভর্তি হওয়ার আবেদন দাখিল করলাম। হেড মাষ্টার সাহেব ছিলেন বলরামপুর গ্রামের আব্দুল হামিদ মিয়া। তিনি আমাদের বংশের প্রায় সকলকেই চিনতেন। আমাদের সংসারিক অবস্থার কথাও তার অজানা ছিল না। তিনি আমার দরখাস্ত খানা হাতে নিয়ে তাতে সুপারিশ লিখলেন এবং দরখাস্ত খানা নিয়ে সেক্রেটারী আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী সাহেবের কাছে যাওয়ার জন্য তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন।

আমি ক্লাশ ফোরের ছাত্র অবস্থাতেই বাপ-মায়ের কোল ছাড়া হয়ে অনেকখানি স্বাবলম্বী জিন্দেগীতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি; কাজেই সেক্রেটারী সাহেবের কাছে দরখাস্তখানা নিয়ে যেতে আমার কোনো সংকোচ পয়দা হয় নাই।

www.pathagar.com

আমি সেক্রেটারী আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে গিয়ে তাকে ছালাম দিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি পুরু লেন্সের চশমার মধ্য দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি চাও খোকা ?

আমি হাতের দরখাস্তখানা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। তিনি দরখাস্তখানা হাতে নিয়ে অনেকক্ষন পর্যন্ত খুটিয়ে পড়লেন। তারপর চোখ তুলে আমাকে প্রশ্ন করলেনঃ দরখাস্ত খানা তুমি নিজ হাতেই লিখেছ?

আমি জবাব দিলাম, জি।

আচ্ছা! তুমি পড়ালেখা ছাড়াও আর কি কি জানো? খেলাধুলা জানো?

আমি জবাব দিলাম, জি।

তুমি গজল গাইতে পার?

আমি জবাব দিলাম, জি।

তুমি একটা গজল গাও তো শুনি ?

অতোবড় ডাক সাইটে মানুষের কাছে আমি দাঁড়িয়ে থাকতেই শরম পাচ্ছিলাম। তদুপরি তারই সামনে গলা ছেড়ে গজল গাইতে আমার গলা প্রায় শুকিয়ে আসছিল।

সেক্রেটারী সাহেব এলেমদার লোক। আমার অবস্থাটা তিনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি আমাকে তার কাছে ডেকে নিয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন। আমার কাছে ভয়ের কিছু নাই। তুমি যে কোনো একটা গজল গাও।

আমি তখন" বাদশা তুমি দিন ও দুনিয়ার, হে পরোয়ার দিগার"– এই গজলটা অত্যন্ত দরদের সংগে গাইলাম। আমার গজল গাওয়া শেষ হয়ে গেলে দেখলাম, সেক্রেটারী সাহেব তখনো তন্ময় হয়ে আছেন।

খানিকক্ষন পরে তিনি মুখ তুলে বললেন, তুমি মওলা বকস খোন্দকারের নাতি। মওলা বক্স আমার দোস্ত লোক। তোমাকে আমি স্কুলে ফ্রি করে দিলাম। তাছাড়াও তোমাকে আমার ভাইজতা মোজাম্মেল চৌধুরীর বাড়িতে জায়গীর করে দিচ্ছি। কিন্তু একটি শর্ত আছে। তুমি আমার ভাইজতার বাড়িতে জায়গীর থাকবে। কিন্তু বিকেলে এসে আমাকে গজল শুনাবে।

আমি মাথা নেড়ে স্বীকার করলাম। আমার জায়গীর হলো মোজাম্মেল চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে। সেক্রেটারী সাহেবের বাড়ির পাশেই মোজাম্মেল চৌধুরী সাহেবের বাড়ি। তার বিরাট কাছারী ঘর। টিনের ঘর টিনের বেড়া। তার এক ছোট ছেলেকে আমি পড়াতাম। আমার সাথে চৌধুরী বাড়ির আরো কয়েকজন স্কুলে পড়তো। আফজাল, আবুল, মনিরুল (কাদু), কিবরিয়া, খসরু (মরতুজ কেরানীর ছেলে) ছালাম, ছাত্তার, ইব্রাহিম, শুকুর (ওয়াহেদ চৌধুরীর ছেলে) ফজল, দবির প্রমুখ। অর্থাৎ আনন্দ ফূর্তিতেই আমার হাই স্কুলের জীবন শুরু হয়েছিল।

কিন্তু বেশীদিন সেক্রেটারী জনাব আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরীকে আমার গজল গেয়ে শোনাবার নছিব হয় নাই। তিনি বার্ধক্য জনিত অসুখে তার বাড়ি থেকে হাসপাতালে

www.pathagar.com

১৯৪৯ সনে আমি সেকেণ্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে সিরাজগঞ্জ কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য গিয়েছিলাম। আমার দোস্তদের মধ্যে মজনু, আরেফিন ও নুরু এরাও সেকেণ্ড ডিভিশনেই ম্যাট্রিক পাশ করেছে। তারাও কলেজে ভর্তি হয়েছে। আরেফিন সবচেয়ে গরীব। সেও পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হয়ে আল মাজী মোক্তার সাহেবের বাসায় জায়গীর লাভ করেছে। প্রসংগত বলে রাখা ভাল যে,কলেজের পড়ার খরচ বহনের কোনো উপায় না দেখে শামসুল আরেফিনের বড় ভাই তাকে সলপ গ্রামের এক ধনী গেরস্ত ঘরে বিয়ে দিয়েছিল। আমি নিজে সেই বিয়েতে হাজির ছিলাম। আমি আরেফিনের স্ত্রী আমার দোস্তানীর সাথে হাসি মস্তারা করেও দেখেছি, সে নিতান্ত অবলা ছিল না। আরেফিন যখন পাবনা কলেজে আলমাজী মোক্তার সাহেবের বাসায় জায়গীর থেকে পড়ছিল, তখন সে একটি কন্যা সন্তানের পিতা। সেই আরেফিন বি-এ পাশ করে তার প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আলমাজী সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। সেজন্য আরেফিনের সাথে আমি ভীষন রাগারাগি করেছিলাম। সেই থেকেই আমাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল।

আমার স্কুল জীবনের অন্য দুই দোস্ত নুরু ও মজনুর সাথে আমার মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। কিন্তু আরেফিনের সাথে বিগত তিরিশ বছরের মধ্যে বোধ হয় একবার কিংবা দুবার দেখা হয়েছিল। শুনেছি, সে ঈশ্বরদিতে জায়গা জমি কিনে বাসাবাড়ী করে তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়েই আছে। তার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা সন্তানের কি হালত হয়েছে, সেটা আমার জানা নাই।

আমার তিন দোস্ত নুরু মজনু আরেফিন এরা কলেজে ভর্তি হয়েছে- এ খবর জানার পরে আমি বেজায় উতালা হয়ে উঠেছিলাম। যে করেই হোক আমাকে কলেজে ভর্তি হতেই হবে।আমি আমার চাচা আমার ছোট ফুফু এবং মোহনপুর গ্রামের দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে আমার চাচি আম্মার কাছে গিয়ে সামান্য কিছু টাকা চেয়ে আনলাম।

সেই সামান্য পুঁজি নিয়ে আমি গেলাম সিরাজগঞ্জ শহরে। আমাদের বাড়ির পাশের বাড়ির খাজা মতিয়ার রহমান সিদ্দিকী সাহেবের বাসায়। তিনি আমাদের আত্মীয়ও বটে। তার বাসাটা ছিল সিরাজগঞ্জ শহরে বর্তমান সালেহা গার্লস হাই স্কুলের কাছে। তিনি সিরাজগঞ্জ পৌরসভার সিনেটারী ইনস্পেক্টর ছিলেন। রায় দৌলতপুরের উচ্চ বংশের লোক হিসাবে মতি সিদ্দিকীর বিশেষ নাম ডাক ছিল। সারা সিরাজগঞ্জ শহরে তিনি সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। সে আমলের পলিশের দারোগাদের পোযাক ছিল খাকী কাপড়ের হাফ প্যান্ট। সেই খাকী কাপড়ের হাফ প্যান্ট, এবং শোলার টুপি পরার গৌরব হাসিল করেছিলেন সিরাজগঞ্জ পৌর সভার সেনিটারী ইনস্পেকটর মতি সিদ্দিকী।

www.pathagar.com

মতি সিদ্দিকী আত্মীয়তাসূত্রে আমার ভাই হন। আমার দাদার একমাত্র বোন কে শাদী করেছিলেন মতি সিদ্দিকীর দাদা মোঃ আব্দুল আলী সিদ্দিকী। আমার দাদির সতীনের তরফের নাতি গোলজার সিদ্দিকী, বিজরিস কাদের সিদ্দিকী ও মতি সিদ্দিকী।

আমাদের খোন্দকার বাড়ি ও সিদ্দিকী বাড়ির মধ্যে তিনহাত প্রশস্ত একটি হালটের ব্যবধান মাত্র। তাছাড়া খোন্দকার বাড়ি পূর্বদিকে খোলা, পশ্চিমে বন্ধ। সিদ্দিকী বাড়ী দক্ষিন দিকে খোলা, উত্তরে বন্ধ। দুটি বাড়ীর যেমন হালটের ব্যবধান, আত্মীয়তার মধ্যেও ঠিক তেমনি ব্যবধান।

মতি সিদ্দিকী আমার কলেজে পড়ার আগ্রহের কথা মন দিয়ে শুনলেন! তারপর বললেন, রহিম! তুই যে কলেজে পড়তে চাস, তোর বাপ তো এক পয়সাও খরচ চালাতে পারবেনা।

আমি মিন মিন করে বললাম, খরচের ব্যবস্থা একটা হবেই। আপনি আমাকে একটা জায়গীর করে দ্যান।

মতি সিদ্দিকী বললেন, আমি এখানে জায়গীর কোথায় পাব? তুই কলেজে পড়ার আশা ছেড়ে দে! একটা চাকুরী বাকরী খুঁজে পাস কিনা, সেইটা দ্যাখ।

আমি সিরাজগঞ্জ কলেজে পড়ার আশা ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে এলাম।

মতি সিদ্দিকী বার কয়েক ম্যাট্রিক ফেল করেছেন। তারপর কলিকাতা গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে কোনো মতে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। মতি সিদ্দিকীর বড় ভাই গোলজার সিদ্দিকী কলিকাতা করপোরেশনে চাকুরী করতেন। সেই সুবাদে মতি সিদ্দিকী কলিকাতা গিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি ম্যাট্রিক পাশ করার পর সিরাজগঞ্জ পৌর সভার সেনেটারী ইন্‌সপেক্টরের চাকরীটাও গোলজার সিদ্দিকীর তদবিরেই পেয়েছিলেন।

আমার পূর্ব পুরুষ তকি মাহমুদ খোন্দকার যেমন করটিয়ার পান্না জমিদারদের কাছ থেকে নামমাত্র খাজনায় পীরালী সম্পত্তি লাভ করে তাদের সাবেক গ্রাম আজোগাড়া থেকে দৌলতপুরে গিয়ে বাসস্থান নির্দেশ করেছিলেন; মতি সিদ্দিকীর দাদা মৌঃ আব্দুল আলী সিদ্দিকীও ঢাকার নবাব বাহাদুরের কাছ থেকে নামমাত্র খাজনায় পীরালা সম্পত্তি লাভ করেছিলেন এবং রায় দৌলতপুর মৌজায় সেই সম্পত্তিতে তিনি প্রজা পত্তন করেছিলেন।

পরবর্তীকালে সেই প্রজারা সম্পত্তি বেহাত করে ফেলে। খাজনা পত্র না দিয়ে জবরদখল করে খেতে থাকে। গোলজার হোসেন সিদ্দিকী কলিকাতা করপোরেশনে চাকুরী করা কালেই পৈতৃক সম্পত্তি দখল করার জন্য স্বত্বের মোদ্দমা দায়ের করেছিলেন। সেই মোকদ্দমায় জয়লাভ করে গোলজার হোসেন সিদ্দিকী বাঁশগাড়ীর মাধ্যমে সম্পত্তি দখল করেছিলেন। কিশোর বয়সে আমরা সেই বাঁশগাড়ি করা দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে হৈ চৈ করেছি।

www.pathagar.com

বাঁশগাড়ি হচ্ছে, আদালত থেকে আমিন পেয়াদা ও ঢোল-শহরত নিয়ে এসে যে জমিতে দখলি কায়েম করার কথা সেই জমির উপর দিয়ে আমিন শিকলেন মাপ দিয়ে জমির চার কোনায় চারটি খুঁটি গেড়ে দিতো। এভাবে গ্রামের বহু জমির উপর সরকারী আমিন শিকলের মাফ দিয়ে চার কোনায় খুঁটি গেরে চিহ্নিত করে গেলেন । আমরা শুনতে পেলাম, প্রায় দুই খাদা জমি অর্থাৎ যোল বিঘার এক খাদার দুই খাদা জমি গোলজার সিদ্দিকী সাহেবরা দখলে পেলেন । একটা তালুকদারীর মালিক হলেন তারা; সেজন্য তারা জমিতে কখনো যেতেন না । চাকুরী বাকরীতে থাকতে দোষ নাই ; তাই চাকুরী করতেন।

তাদের পাশের বাড়ি খন্দকার বংশ দিন দিন হীন অবস্থার শিকার হয়ে গরীব পড়শিতে পরিনত হয়েছে । কাজেই গরীব পড়শির সাথে পুরাতন আত্মীয়তার রেশ ধরে টানাটানি করতে তারা আদৌ রাজী ছিলেন না । তার মধ্যে আমার সখ চেপেছে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে অত্র অঞ্চলে যা নাই তেমন একটা নজির পয়দা করা। আমার মাথা খুব তাল এটা মতি সিদ্দিকী আগে থেকেই জানতেন। উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেলে যে আমি তর তর করে উঠে যাবো, এ ধারণা তার মজবুতই ছিল। সেইজন্যে তিনি চাইলেন যে, আর পড়াশোনা না করে চাকুরী বাকুরীর ঘানিতে আমি বাধা পড়ি।

কিন্তু আমি নীরবে সিরাজ গঞ্জ থেকে চলে এলাম। বাড়িতে এসে ম্যাট্রিক পরাক্ষার্থী আলতাফ ও তোতাকে পড়াই। গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মুষ্টি তুলি এবং লাইব্রেরীর বই পুস্তক পাঠকদের মধ্যে ধার দেই এবং ফেরৎ আদায় করি। সেই সাথে সংসারের অভাব মোচনের জন্য হাটে হাটে মুদিখানা দোকানও চালাই।

এ সময় আমার ভাই খোদাবকসের মতি গতির কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। সে এখন ঘরমুখী হয়েছে। তার দুটি মেয়ে ঘরে। লায়লী ও শিরি। মেয়ে দুটির নাম আমিই রেখেছিলাম। সেই মেয়ে দুটির আবদার রক্ষা করার জন্য আমার ভাই ঘরমুখী হলেন। ঘরমুখী হলেও আয় রোজগারের ভিন্ন কোনো উৎস ছিলনা। সামান্য কিছু জমি আছে । কিন্তু হালের গরু নাই । আব্বাজান একটা গরু ধার এনে আমাদের নিজস্ব একটা গরুর সাথে জুড়ে ক্ষেতে হাল বায় । ভাই সংসারে মন লাগালেও হালের গরু না থাকায় বর্গা চাষের মাধ্যমে আবাদ বড় করা সম্ভব ছিল না ।

আমি তখন আমার টিউশনীর টাকা ও আমার মুদি খানা দোকানের তহবিল থেকে ভাইকে তিনশত টাকা দিয়ে কাপড়ের দোকান খুলে দিলাম । আমাদের গ্রামের হাট ছাড়াও সলপের হাটও বলরামপুরের হাট সপ্তাহে দু'দিন করে বসে । এই তিনটি হাটেই এক সপ্তাহ কেটে যায় । সপ্তাহে ছয়দিন হাটে দোকান দিয়ে গ্রামের অনেকেই স্বচ্ছল ভাবেই সংসার চালায় ।

সেই ১৯৪৯ সনের কথা । তখনকার তিনশত টাকা এখনকার ত্রিশ হাজার টাকার সমান । তখনো বাজারে ৩ টাকা মন চাউল চার পাঁচ আনা সের কেরোসিন ও বার আনা সের সরিষার তৈল । পাঁচ সিকা দেড় টাকা একখানা তহবল । দুই টাকা আড়াই টাকায় একখানা মোটা শাড়ি ।

www.pathagar.com

আমার তিনশত টাকা নিয়ে ভাই চুটিয়ে কাপড়ের দোকানদারী করতে শুরু দিলো। গোলাপ সরকার, মঈনাল, ঘড়ি সরকার, শাহজাহান এরাও কাপড়ের দোকান খুলে বসলো । পাকিস্তানে মুসলমানরা যেন উঠে পড়ে লেগে গেল তকদির ফিরাবার তদবিরে।

আমি কলেজে পড়ার আশা ত্যাগ করে প্রাইভেট টিউশনী ও দোকানদারী , লাইব্রেরী পরিচালনা ও মুষ্টি তোলার কাজ নিয়ে পড়ে রইলাম । কিছুদিনের মধ্যেই ভাই দোকানদারীতে ঢিলে দিয়ে বসলেন।

আমি ভাইকে যতই বলি, ভাই বল্‌রামপুর হাটে যাইবা না ?

নারে, আজ আর যামুনা !

ব্যাপার কি বুঝতে পারি না । এদিকে কাপড়ের গাঁটুরীটাও দেখি খুব ছোট । ভাবীকে জিগগেস করলে ভাবী না জানার ভান করে চুপ করে থাকে ।

আরো কিছুদিন পরে সবই জানতে পারলাম । আমার দেওয়া চালানপাতি সব বাকীতেই ফাঁকি হয়ে গেছে।

ব্যবসায় সাইন করতে হলে প্রথম থেকেই খুব হিসেবী হতে হয় । আমার ভাইয়ের ইয়ার দোস্তের অভাব নাই । ইয়ার দোস্তরা হামেশা দোকানে বসে গল্প গুজব করতো । তারা কাপড় চাইলেই ভাই তাদেরকে কেনা দামে দিয়ে দিতো । আবার বাকী রাখলেও কিছু বলতো না । খোদাবক্‌স ! আগামী হাটেই টাকা দিয়া দিমুনী ; কাপড় খানা দে ।

আচ্ছা নিয়া যাও ! বলেই খোদাবক্‌স ইয়ার দোস্তদের সাথে আলাপে মশগুল থাকতো । হয়ত ঠিকমতো মনেও রাখতে পারতো না, কে কোন দিন কতো দামের কাপড় বাকী নিয়েছে । এই ভাবে কিছুদিনের মধ্যেই দোকানের চালান গায়েব হয়ে গেছে । খোদাবক্‌স যখন পকেট গুনে দেখেছে , তার পকেটে তো আসলও নাই, লাভও নাই, তখন তাঁর দোকানদারীর আগ্রহে পড়েছে ভাটা ।

আমার কষ্টের চালান পাতি নষ্ট হওয়ার দুঃখে আমি ভাইয়ের উপর খুবই চটাচটি করলাম । কিন্তু ভাই কিছু না বলে চুপ মেরে সব সয়ে গেল ; দুঃখে অভিমানে দশদিক অন্ধকার দেখে আমার দোকান বাড়িতে ফেলে রেখে খালি হাতেই আমি বলরামপুর হাটে চলে গেলাম। অন্যদিন বলরামপুর হাটে গিয়ে বটগাছের নীচে আমার মনোহারী দোকান সাজিয়ে বসতাম । বেচাকেনা করে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে আসতাম । কিন্তু সেদিন আমি খালি হাতে হাটে গিয়ে দিশাহীনভাবে ঘুরতে লাগলাম । বলরামপুর মেছো হাটায় গিয়ে উদাসভাবে কতক্ষন দাঁড়িয়ে আছি । এমন সময়, এই যে রহিম এখানে, এই ধরনের একটা আওয়াজ আমার কানে এলো । আমি সামনে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, আমার ক্লাশ মেট হামিদ আমার দিকে তাকিয়ে আছে । হামিদের পাশে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক আমাকে পর্যবেক্ষন করছেন । আমি তাদের দিকে তাকাতেই সেই ভদ্রলোক আমাকে শুধালেন । আপনি কি কলেজে পড়তে চান ?

www.pathagar.com

জি ! আমি মাথা নেড়ে জবাব দিলাম

–ঠিক আছে আপনার নাম ঠিকানা বলুন ?

আমি আমার নাম ঠিকানা বললাম ।

তিনি তার ডায়রীতে লিখে নিলেন । আমাকে তার ঠিকানাটাও দিলেন ।

এতক্ষনে আমাদের ঘিরে বহু লোক ভীড় করে দাঁড়িয়েছে । একেতো বলরামপুরের মেছো হাট । এমনতেই লোকে গিজ গিজ করে । তারই উপর তারা দেখতে পাচ্ছে দুজন অসম লোকের কথপোকথন । আমি সবে মাত্র ম্যাট্রিক পাশ করা যুবক । আমার সামনে আমার প্রায় দ্বিগুন উঁচু একজন দিশাসই ভদ্রলোক । জিন্নাহ টুপি মাথায় । মুখে স্মিত হাসি ।

আমি মুখ আকাশের দিকে উঁচু করে কথা বলছি । আর উনি মাটির দিকে মুখ নীচু করে আমার কথা শুনছেন । হাটের লোকেরা তাজ্জব হয়ে দেখছেন এই কান্ড কারখানা।

ঠিকানাটা হাতে নিয়ে খানিক্ষন স্তম্ভিত হয়ে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই মেছো হাটায় । যখন দেখলাম আমার ক্লাশমেট হামিদ ও সেই ভদ্রলোক হাটের কাজ সেরে চলে গেছেন, তখন আমিও বাড়ির পথে হাটা দিলাম । খাওয়া দাওয়ার পড়ে আমার পড়ার টেবিলে বসে আমার প্রথমেই যে কথাটি মনে হলো, সেটা হচ্ছে, এ যেন আল্লাহ্‌র কুদরতি খেলা। একজন ফেরেস্তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে অন্ধকার থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা হলো।

আমি খস্ খস্ করে ইংরাজিতে একখানা চিঠি লিখে ফেললাম । আমার জীবনে প্রথম বারের মতো আবেগের প্রকাশ ঘটেছিল চৌবাড়ী হাই স্কুল থেকে আমাদের বিদায় সম্ভাষন উপলক্ষে আমার কবিতা রচনার ভিতর দিয়ে । দ্বিতীয় বারের মতো আমার আবেগের প্রকাশ ঘটলো ইংরেজিতে একখানা চিঠি লেখার ভিতর দিয়ে ।

আমার যতদুর মনে পড়ে, তাতে বলরামপুর হাটের মধ্যে যিনি আমাকে কলেজে পড়ার সুযোগ দেওয়ার ভরসা দিয়েছিলেন, তাকে আমি আল্লাহর প্রেরিত ফেরেস্তা বলে তারীফ করেছিলাম এবং চরম হতাশার ভিতর থেকে আমাকে টেনে তোলার ভরসা দেওয়ায় তাঁর প্রতি আমার হৃদয় উজাড় করা শুকরিয়া জাহির করেছিলাম ।

সেই ভদ্রলোক এ· জেড়, এম· জহুরুল ইসলাম । তার গ্রামের বাড়ি গাবের পাড়া। আমার নানার গ্রাম সেটা । তিনি ছিলেন আমার মামা ফরমান সরকারের বাল্যসাথী । তিনি শাদী করেছিলেন আমাদের রায়দৌলতপুর ইউনিয়ন অফিস যে গ্রামে অবস্থিত সেই ধলেশ্বর গ্রামে । তিনি বিভিন্ন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন । ১৯৪৮ সনে কুষ্টিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করেন । ১৯৪৯ সনে তিনি নিজ এলাকায় আসেন ছাত্র সংগ্রহ করতে । চৌবাড়ী স্কুলেই তার শ্যালক আব্দুল হামিদ আমার সাথে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। তার কাছে আমার তারীফ শুনে তিনি আমাকে উচ্চ শিক্ষার সিড়িতে উঠার মওকা করে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আমার চিঠি প্রিন্সিপাল সাহবের হাতে পৌছামাত্র তিনি আমাকে জরুরীভাবে কুষ্টিয়া যেতে লিখে পাঠান। আমি তাঁর দেওয়া গাইড লাইন অনুসরন করে কুষ্টিয়া কলেজে হাজির হই। ১৯৪৯ সনের সেপ্টেম্বর মাস। এখনো আমন মৌশুম শুরু হয় নাই। ধানক্ষেতের মধ্যে কুষ্টিয়া কলেজের একতলা ইমারত। প্রথম বর্ষ আর্ট্সের ক্লাশে সোয়াশ'র মতো ছাত্র ছাত্রী। আমি প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথে দেখা করলে তিনি আমাকে তার এক পিওনের সাথে আমাকে তার বাসায় পাঠিয়ে দিলেন। আমাকে বললেন, রহিম! তুমি আমার বাসাতেই আপাতত থাকো। তোমার জায়গীর ঠিক করার পরে তোমার জায়গীর বাড়ি যেয়ো।

আমার পক্ষ থেকে কোনোরূপ ওজর আপত্তির প্রশ্ন থাকতে পারেনা। প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়ি এবং জায়গীর বাড়ি কোনোটাই আমার নিজের বাড়ি নয়। ইতিপূর্বেও আমি জায়গীর বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছি। কাজেই প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়িতেই নিজেকে খাপ খাওয়াবার জন্য আমি তৈরী হয়েই রইলাম।

প্রিন্সিপাল সাহেবের একটা ছেলে ক্লাশ টেনে পড়ে। একটি মেয়ে ক্লাশ থ্রিতে পড়ে। ক্লাশ থ্রির মেয়েটিকে আমি পড়াই। প্রিন্সিপাল সাহেব এ সময় আই· এ· পরীক্ষার ইংরাজী খাতা দেখছিলেন। তিনি আমাকে আই· এ· ক্লাশের ইংরাজী বই ও নোট বই দাগিয়ে দিলেন। যে গুলি দাগিয়ে দিলেন, সেগুলি ভাল করে পড়লেই ইংরাজী খাতা দেখতে আর অসুবিধা হবে না। আমি দাগানো বিষয়গুলি পড়ে শেষ করা মাত্র প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে আই· এ· পরীক্ষার ইংরাজী খাতা দেখার জন্য আমার কাছে প্রথম দফায় ১০ খানা খাতা দিলেন। সেই খাতাগুলি আমি দেখে দেওয়ার পর তিনি বেজায় খুশী হলেন। আমি যে ইংরাজী খাতায় এতোটা সঠিকভাবে নম্বর দিতে পারবো। সে সম্বন্ধে তার কিছু সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমার দেওয়া নম্বর গুলি দেখে তিনি খুবই আশ্বস্ত হলেন। অতঃপর আমাকে দৈনিক দশ বার খানা করে খাতা দেখার জন্য দিতে লাগলেন।

এ সময় আমি কুষ্টিয়া কলেজের অধ্যাপকদের মেসে একদিন বেড়াতে গেলাম। সেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক জনাব আবদুল সাত্তার এবং আরবীর অধ্যাপক জনাব ইয়াকুব আলী প্রমুখের সাথে আমার পরিচয় হলো।

সাত্তার সাহেবের জবানীতে জানতে পারলাম, আমার ইংরাজী চিঠিখানা কলেজের বহু লোকের হাতে হাতে ঘুরেছে। প্রিন্সিপাল সাহেব সবাইকে ডেকে বলেছেন, দেখো, দেখো, ম্যাট্রিক পাশ করা একটা ছাত্র ; কতো সুন্দর ইংরাজী চিঠি লিখেছে। যারাই সে চিঠিখানা পড়েছে তারাই তারীফ করেছে।

সাত্তার সাহেবের কাছে আমার তারীফ শুনে আমি লজ্জায় মাথা হেট করে ছিলাম। কিন্তু দিনের পর দিন সাত্তার সাহেবের স্নেহেরও অনেকটা আমার নছিবে জুটেছিল। তিনি কলেজ ছুটির মধ্যে তার শশুর বাড়ী ভাংগুড়া গ্রামে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে আমি যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন পেয়েছি।

আমার প্রতি প্রিন্সিপাল জহুরুল ইসলাম সাহেবের অবদানের তুলনা নাই। তিনি আমাকে 'কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ফান্ড' থেকে ১৫০ টাকার একটি অনুদান জুগিয়ে দিয়েছিলেন। সে ই১৯৪৯-৫০ সনের আমলে ১৫০/- টাকার

www.pathagar.com

অনুদানের মূল্য বর্তমান মুদ্রামানে ১৫ হাজার টাকার কম নয়। আমার সেই টাকার খুব একটা দরকার হতো না। প্রিন্সিপাল সাহেব টাকাটা ব্যাংকের পাশ বুকে জমা রেখেছিলেন।

ইতিমধ্যে প্রিন্সিপাল সাহেব আমার জায়গীর ঠিক করে ফেলেছিলেন। কুষ্টিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অবিভক্ত বাংলায় শেরে বাংলা ফজলুল হক সাহেবের কেবিনেটের উজীর জনাব শামসুদ্দীন আহমদ। প্রতিষ্ঠাতার সহযোগী ছিলেন তার ভাই ডাঃ সদর উদ্দীন এম· এল·এ· এবং জনাব কাজী কফিল উদ্দীন আহম্মদ মোক্তার। প্রিন্সিপাল সাহেব যখন মোক্তার সাহেবকে বলেছিলেন,আপনার বাড়িতে আমি একটি ভালো ছেলে জায়গীর দিতে চাই, তখন মোক্তার সাহেব বলেছিলেন, "বেশ তো ভাল কথা। আপনি যদি একটি ভাল ছেলে দেন তো; আমার তরফে কোনো আপত্তি থাকতে পারেনা।"

অতঃপর আমি প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসা ছেড়ে কাজী কফিল উদ্দীন আহমদ মোক্তার সাহেবের বাড়িতে জায়গীর এলাম। মোক্তার সাহেবের বাড়ীটি কুষ্টিয়ার থানাপাড়ায় গোড়াই নদীর কিনারে। মোক্তার সাহেবের কাছারী ঘর অর্থাৎ বৈঠকখানার সান বাধানো মেঝে গড়াই নদীর ঢেউ লেগে খানিকটা ধ্বসে গেছে।১৯৫০ সনের প্রথম দিক থেকে আমি মোক্তার সাহেবের বাড়িতে জায়গীর ছিলাম। ঐ বছরই গোড়াই নদীর স্রোত বৈঠকখানা ঘরের মেঝের বেশ খানিকটা ধ্বসিয়ে নিয়েছিল। প্রতি বছর বর্ষার মৌশুমে একই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী বছরেই এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে এমন আশংকা আমাদের সকলের মধ্যেই ছিল। কিন্তু ১৯৫১ সনেই গোড়াই নদীতে এমন বালুর স্তর পড়ে গেল যে, নদী শুকিয়ে গরুর গাড়ী চলাচলের উপযোগী হয়ে পড়েছিল। আমি ১৯৫২ সন পর্যন্ত মোক্তার সাহেবের বাড়িতে ছিলাম। আমি দেখে এসেছি, গোড়াই নদীর দুর্বার স্রোত পুরাতন স্মৃতির পাতায় ঠাঁই নিয়েছে।

কাজেই কাজী কফিল উদ্দীন মোক্তার সাহেবের বাড়ী গোড়াই নদীর খপ্পড় থেকে উদ্ধার করার প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। বরং মজা নদীর তীর ঘেষে জংগল পয়দা হয়ে সে বাড়িটার আব্রু ঢেকে রেখেছে।

কাজী কফিল উদ্দীন মোক্তার সাহেবের বাড়ির দিন গুলির কথা আমার ভোলার শক্তি নাই। তখন সবে আমার কলেজ জীবনের শুরু। বাহির জগতের সাথে আমার জীবনের বহুমুখী মোলাকাত ঘটা শুরু হচ্ছিল। আমি তাই সব কিছুকেই তীব্র আবেগে গ্রহণ করতে শুরু দিয়েছিলাম।

আমি আমাদের বাড়িতে মুদিখানা দোকান চালাতে গিয়ে উট মার্কা বিড়ি, টেক্কা বিড়ি ইত্যাদি খাওয়া ধরেছিলাম। কফিল উদ্দীন মোক্তার সাহেবের বাড়ীতে জায়গীর থাকতে গিয়ে একটা মজার ব্যাপার হলো। মোক্তার সাহেবের দুই ছেলে কাজী রেজাউল হক ও কাজী রেফাউল হক এবং সকলের ছোট একটি মেয়ে। কাজী রেফাউল ক্লাশ ফাইভের ছাত্র। ওকেই আমি পড়াই। কাজী রেজাউল হক আমার ক্লাশমেট। ওর সাথে আমি কুষ্টিয়া কলেজে পড়ি। রেজাউলের সিগারেট খাওয়ার দারুন অভ্যাস। সে লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খায়। কিন্তু সিগারেট রাখবার জায়গা নাই তার। আমাকে পেয়ে রেজাউলের একটা সুবিধা হল। আমার কাছে ক্যাপস্টান সিগারেটের

www.pathagar.com

প্যাকেট রেখে দিতো। যখন খুশী আমার কাছে এসে সিগারেট খিয়ে যেতো। তাতে রেজাউল যে সিগারেট খায়, সেটা সন্দেহ করা সহজ হতো না। আমি জায়গীর থাকি · আমি সিগারেট খেলে আমার উপর খবরদারী করা সাজে না। এইটা ছিল মজা। আমি বিড়ি খাই-সিগারেট কেনার পয়সা আমার জোটেনা। বাড়িতে যখন ছিলাম, তখন মাঝে মধ্যে পাসিংসো সিগারেটে দু একটা সুখ টান দেওয়ার বরাত হতো। কিন্তু কলেজ জীবনে শুধু বৃত্তির টাকার উপর ভরসা করে সিগারেট খাওয়ার মতো বাবুয়ানা আমার পোষাতো না।

কিন্তু কাজী রেজাউল হক আমাকে সিগারেট খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে শুরু দিল। আমি তাকে বললাম, আমি যে সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস করবো, আমি সিগারেট কেনার পয়সা পাবো কোথায়! তখন রেজাউল বললো, সিগারেট যদি আমি খাই, তাহলে তার ব্যবস্থা বরাবর সেই করবে। আমার কাছেই সে সিগারেট কেনার টাকা রাখবে। কাজেই দুজনের সিগারেট খাওয়ার কোনো অসুবিধাই হবে না।

যতদিন কাজী রেজাউল হকদের বাড়ীতে আমি ছিলাম, ততদিন সিগারেট কেনার ব্যাপারে আমার কোনো খরচ ছিল না।

কুষ্টিয়াতে অত্যন্ত আনন্দের জিন্দেগী কেটেছে আমার। অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসা ছিল ফ্রি। কলেজ প্রতিষ্ঠাতার ভাই ডাঃ সদর উদ্দীন আহমদ সাহেবের কাছে গিয়ে অসুখের কথা বললেই তার ডিস্পেনসারী থেকে ঔষধ পাওয়া যেতো। ডাঃ সদর উদ্দীন সাহেব এ্যালোপাথীতে এম· বি· পাশ ছিলেন; কিন্তু তিনি প্র্যাকটিস করতেন হোমিওপ্যাথি। কেন? তার নাকি এক দুরারোগ্য অসুখ হোমিও প্যাথীতেই আরাম হয়েছিল। তারপর থেকেই হোমিও প্যাথির উপর তার প্রবল আস্থা পয়দা হয়েছিল। হোমিও প্যাথি চিকিৎসায় ডাঃ সদর উদ্দীন সাহেবের বিরাট পসার ছিল। কিন্তু তার কোনো অর্থ লিপসা ছিলনা। তিনি কুষ্টিয়া কলেজের ছাত্র ছাত্রীদেরকে ফ্রি চিকিৎসা করতেন। সমাজ সেবায় এমন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি খুব বিরল। আজ অর্ধ শতাব্দী পরও সেই বিরল ব্যাক্তির নাম ইয়াদ করা বুলন্দ নছিবের ব্যাপার সন্দেহ নাই।

রেজাউল হকদের বাড়ীতে থাকা অবস্থায় আমার জীবনে আরো দুটো স্মরনীয় ঘটনা ঘটেছিল। একটা হচ্ছে, একদিন রেজাউল আমাকে বললো, চলো রহিম! শাহ আজিজুর রহমান এসেছেন, তার মুখে দেশের হাল হকিকত শুনে আসি। আমি বললাম, কোথায় যেতে হবে। রেজাউল জবাবে বললো, আমাদের থানা পাড়াতেই তার বাড়ি। কলেজে যাওয়ার রাস্তার পাশেই। ১৯৫১ সনে আমরা শাহ আজিজুর রহমান কে প্রথম দেখা এবং তার অনলবর্ষী বক্তৃতা শোনার নছিব পেলাম। তাকে দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম, এমন ডাক সাইটে ছাত্রনেতা কতো বড় বা তাগড়া জোয়ান মর্দ হবেন।

কিন্তু তার বাড়ির উঠোনে ঢুকে বহু সংখ্যক ছাত্রদের মধ্যে হাত নেড়ে নেড়ে যখন তাকে বক্তৃতা দিতে দেখলাম, তখন তাজ্জব হলাম এই ভেবে যে, তিনি আমাদেরই মতো একজন যুবক মানুষ। তবে আমার গায়ের রং কালো। শাহ আজিজুর রহমানের গায়ের রং ছিল উজ্জল গৌর বর্ন। কুষ্টিয়ার কৃতি সন্তান হিসাবে সেই ১৯৫১ সনেই শাহ আজিজুর রহমান মশহুর ছিলেন।

www.pathagar.com

কুষ্টিয়া থাকা অবস্থায় জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার কাছে বাড়ি থেকে এক দুঃসংবাদ এলো। আমার বড় ভাই আমগাছে আম পাড়তে উঠে হঠাৎ ডাল ভেংগে পড়ে গেলে, তার মাথা ফেটে যায়। তার ভালমতো চিকিৎসার জন্য বহু টাকা দরকার। কিন্তু আমার আব্বার কাছে টাকা পয়সা তেমন কিছু নাই। গ্রামের রাধিকা ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ এনে খাওয়ানো হচ্ছে। কিন্তু মাথার ঘায়ের ব্যাথায় আমার ভাইয়ের ভীষন জ্বর।

চিঠিতে খবরটা পেয়ে আমার মনে বেজায় দুঃখ পয়দা হল। আমি বিকেলে প্রিন্সিপাল জহুরুল ইসলাম সাহেবের কাছে গিয়ে ভাইয়ের ব্যাপারটা বলে আমার বৃত্তির টাকা থেকে একশটা টাকা চাইলাম। প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে বললেন, তোদের নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা! তোর নিজেরই খরচের টাকা নাই। তার উপর তোর ভাই নিয়েছে মাথা ফাটিয়ে, এখন তারও চিকিৎসার টাকা জোটাও। প্রিন্সিপাল সাহেবের কথা শোনার পর আমি মুখ খুলে কিছু জাহির করতে পারলাম না। ফোৎ ফোৎ করে কেঁদে ফেলে দিলাম। প্রিন্সিপাল সাহেব আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত রাখলেন। আদর করে বলতে লাগলেন, রহিম! আমি সবই বুঝিরে! গরীবের দুঃখ আমি সবই বুঝি! কথা শেষ করেই তিনি আলমারী খুলে সত্তরটি টাকা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন। আগামীকালই বাড়িতে চলে যা? তোর ভাইয়ের ভালো মতো চিকিৎসা করে তবে ফিরে আসবি। কেমন?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে এলাম। পরের দিন সকালে বাড়ির পথে রওনা হওয়ার আগে কাজী কফিল উদ্দীন মোক্তার সাহেবের কাছে ভাইয়ের মাথা ফেটে যাওয়ার ব্যাপারটা বয়ান করলাম। তিনিও শুনে খুব আফসোস করলেন এবং দোয়া করে আমাকে বিদায় জানালেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশী কাতর হলো রেজাউল হক। সে আমার বড় ভাইকে দেখে নাই। অথচ মনে হলো তারই যেন বড় ভাইয়ের মাথা ফেটে গেছে।

কাজী রেজাউল হক আমাকে কান্না জড়িত কন্ঠে বললো, আমিও যাই তোমার সাথে রহিম? আমি থতমত খেয়ে গেলাম। শহরের ধনীলোকের ছেলে, গরীবের বাড়িতে যেতে চাচ্ছে, কী জবাব দেবো আমি?

কিন্তু মোক্তার সাহেব বললেন, রাজু! তোমার এখন রহিমদের বাড়ি গিয়ে দরকার নাই। ওর ভাইয়ের চিকিৎসা হোক, সে ভাল হয়ে উঠুক। তারপর একসময় তুমি ওদেরকে দেখতে যেয়ো। রাজু চোখ ছলছল করে আমাকে বিদায় দিল।

বাংলাদেশের এক সময়ের নাম ডাকের সিনেমা তারকা রাজু আহমেদ আর ইহ জগতে নাই। সে যদি বেঁচে থাকতো, তাহলে আমার এই আত্মকথা পড়ে মারহাবা বলে চেঁচিয়ে উঠে বলতো, সাবাস রহিম ভাই! এতো কথাও তুমি মনে রেখেছো! কিন্তু কি আর করবো। সে রাজু আহমেদ অর্থাৎ কুষ্টিয়ার রেজাউল হক এখন জিন্দা নাই, কে আমার এই সব কথার সাক্ষী দেবে।

১৯৫১ সনে কুষ্টিয়া কলেজে পড়ার সময় আমি বা রেজাউল হক কেউ কখনো টের পাই নাই, আমরা কে কোন্ পথে সাইন করবো। শীতের দিনে আমরা দুজনে এক

www.pathagar.com

লেপের তলে গলাগলি ধরে শুয়ে আবোল তাবোল বহু স্বপ্ন কথা বলেছি, কিন্তু কে কি হতে চাই তা কখনো ভাবিও নাই। বলিও নাই।

১৯৫১ সনে আমি আই এ পরীক্ষা দিয়েছি কলেজের ফান্ড থেকে ফরম পূরনের যাবতীয় ফিস দিয়ে। আমার বেলায় কুষ্টিয়া কলেজ নতুন অবদান রেখেছে। সেটা শুধু আমি গরীব বলে নয়। টেস্ট পরীক্ষায় শীর্ষস্থান দখলের কারনেই আমার জন্য কলেজের অবদান অবারিত ছিল। কিন্তু আই-এ-পরীক্ষা যখন আমি ফেল করলাম, তখন আমিও হত বিহবল হয়ে গেলাম। আমার ফেল করা কিভাবে সম্ভব, সেটা কিছুতেই ঠাহর করতে পারলাম না।

আমি রেজাউলদের বাড়িতেই থেকে গেলাম। কাজী কফিল উদ্দীন আহমদ সাহেব আমার প্রতি অনেকখানি স্নেহ প্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। তার ছেলে রেফাউলকে আমি যেভাবে পড়াই, সেটা তিনিও হামেশা লক্ষ্য করেন। আমার জ্ঞানগম্যি তার নখ দর্পনে। কাজেই আমার আই এ ফেলটাকে তিনি একটা এক্সিডেন্ট হিসাবে গ্রহণ করলেন।

এবারে আমি রেজাউলের ছোট বোনটাকেও পড়াতে লাগলাম। ছোট, মেয়ে। দ্বিতীয় শ্রেনীর বই পড়ে। তাকে আধা ঘন্টা পড়ালেই সে হাঁফিয়ে ওঠে। আম্মার কাছে যাই বলে, সেই যে সে বাড়ির ভিতরে চলে যায়, আর সারাদিন তার দেখা যায় না।

১৯৫২ সনে কুষ্টিয়া কলেজ থেকে আই, এ, পরীক্ষা দিয়ে সেকেন্ড ডিভিষনে পাশ করলাম। আমার পরম শুভাকাঙ্খী প্রিন্সিপাল জহুরুল ইসলাম সাহেবের কাছ থেকে আই, এ, পাশের টেসটিমোনিয়াল বা প্রত্যায়ন পত্র নিয়ে যেদিন পাবনার পথে হাটা দিলাম, সেদিন মনটা বেজায় ভারী হয়ে উঠেছিল।

কুষ্টিয়া থেকে পাবনা। মাঝখানে গড়াই ও পদ্মা নদী। গোড়াই নদীর কিনারেই কুষ্টিয়া শহর। ১৯৫২ সনে খরস্রোতা গোড়াই নদী দিয়ে গরুর গাড়ি পারাপার করে। নদীর তলদেশে হাটু পানি। গোড়াই নদী হেটে পার হয়ে ওপারে গেলেই মাইল বিস্তৃত বালুচর ও কাশবন। সেই কাশবনের মধ্যে দূর দূরান্তে দু'চার ঘর বসতি। যেখানে বসতি, সেখানে কলার গাছ ও ভেন্নার গাছ নিবিড় বন পয়দা করে রেখেছে।

আমি প্রায় দশটার সময় রেজাউলদের বাড়ি থেকে পাবনার পথে রওনা হয়েছি। তার আগে রেজাউলের আম্মা আমাকে গরম ভাত ও গরম তরকারী খেতে দিয়েছেন। বিগত দুটি বছর রেজাউলের আম্মাকে আমি এক নজরও দেখিনাই। এমন পর্দানশিন মহিলা ভাবাও যায় না। কিন্তু আমার বিদায়ের দিন তিনি নিজে তরকারীর বাটি আমার কাছে এগিয়ে দিয়ে গেছেন।

রেজাউলদের বাড়িতে দুটি বছর এক নাগারে শুধু ইলিশ মাছের তরকারী খেয়েছি। কোনো দিনও তার ব্যতিক্রম ছিল না। গোড়াই নদীতে তরতাজা ইলিশ মাছ মারার সংগে সংগে জেলেরা মোক্তার সাহেবকে একটা করে বড় ও তাজা ইলিশ নজর নেয়াজ দিয়ে যেতো। কাজেই কোনো দিনও বাজার থেকে মাছ কেনার দরকার হতো না।

www.pathagar.com

গোড়াই নদী থেকে পদ্মা নদী। মাঝখানে দশ বার মাইল চর পথ পাড়ি দিয়ে শিলাইদহ ঘাটে এসে খেয়া নৌকার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। পদ্মা তীর থেকে চারপাঁচ গজ দুরে রবি ঠাকুরের কুঠিবাড়ী। অত্যধিক পথশ্রান্ত ছিলাম বলে কুঠিবাড়ীটা দূর থেকেই জরীপ করে নিলাম। ১৯৫২ সনের জুলাই মাসের ব্যাপার। ১৯৫২ সনের ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার বুকে ভাষা আন্দোলনে ছালাম বরকত রফিক প্রমুখ তরুনেরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে ভাষা আন্দোলন কায়েম করে গেছে। কিন্তু তখনো রবি ঠাকুরের কুঠিবাড়ীতে সরকারী কিংবা বেসরকারী কোনো তরফেরই কোনো তদারকী শুরু হয় নাই। বোধহয় তখনো কুঠি বাড়ীতে ঠাকুর জমিদারের পাইক গোমস্তাদেরই খবরদারীচলছে।

শিলাইদহের ঘাটে পদ্মানদীর খেয়াপাড় হয়ে আমি বিকাল নাগাদ চারটার সময় পাবনা শহরে হাজির হলাম। যদিও কোথায় গিয়ে উঠবো, সে সম্বন্ধে পূর্ব থেকে কোনো ঠিকানা যোগাড় করা ছিলনা, কিন্তু আমি মামাকেখুঁজে পেলাম। আরো বরাতের জোর যে, আমি যখন তার জায়গীর বাড়িতে হাজির হলাম, তখন তিনি জায়গীর বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ জারি করেছেন। আমাকে দেখেই তিনি বেজায় খুশী হলেন।

বজলু মামা বললেন, রহিম! তুমি সময় মতোই এসেছো। আমি আজ সন্ধ্যার আগেই জায়গীর ছেড়ে দিয়ে রায় দৌলতপুর রওনা হচ্ছি। রাত্রি আটটায় ঈশ্বরদি গিয়ে রেলগাড়িতে উঠবো।রাত্রি এগারটায় সলপ ষ্টেশনে নামবো। বাস্। তারপরেই রায় দৌলতপুর হাজির হবো রাত্রি সাড়ে এগারটার মধ্যে। আমি আমার জায়গীর ওয়ালাকে বলে যাচ্ছি, আমার স্থলে এখন থেকে এ বাড়ীতে তুমি জায়গীর থাকবে।

আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। যেন আল্লাহতায়ালা সব কিছু গায়েবে থেকে কন্ট্রোল করে যাচ্ছেন। আমি নিমিত্ত মাত্র। ঠিক সময়ে আমি কুষ্টিয়া থেকে রওনা হয়েছি। ঠিক সময়ে পাবনা হাজির হয়েছি। ঠিক সময়ে আমি বজলু মামার জায়গীর বাড়ীর খোঁজ পেয়েছি। ঘড়ির কাঁটা একদিন এদিক সেদিক হলেই পাবনার জায়গীর হাত ছাড়া হয়ে যেতো। প্রথম জীবনে যেমন সিরাজগঞ্জ শহরে জায়গীর না পেয়ে কলেজে পড়ার আশা ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে মুখ গুঁজে ছিলাম, তেমনি পাবনায় জায়গীর না পেয়ে হয়তো আবারও বাড়ীতেই মুখ গুঁজে থাকতাম। পাবনা কলেজে বি-এ-পড়ার নছিব আমার হতো কিনা আলেমুল গায়েব জানে।

কিন্তু আমার পিছনে আলেমুল গায়েবের নেক নজর হামেশা ছিল বলেই পাবনার জায়গীরটা আগে থেকেই পেয়ে গেলাম। বজলু মামা তার জায়গীরওয়ালার কাছে গিয়ে বললো, চাচা জান! আমি তো আজই বাড়ী চলে যাচ্ছি। আমার পরিবর্তে আপনার বাড়ীতে রহিম সাহেবকে রেখে গেলাম। উনি খুব ভাল ছাত্র।

আমার জায়গীরওয়ালা সেদিন বজলু মামার কথার জবাবে যে কথা বলেছিলেন, আজো সেকথা আমি ভুলি নাই। তিনি বলেছিলেন, ঠিক আছে। উনি থাকুন। ভাত দেনেওয়ালা আল্লাহতায়ালা, আমরা তার নাদানবান্দা নিমিত্ত মাত্র। উনার নছিবে যতদিন আমার বাড়ির ভাত থাকবে, ততদিন উনি এখানেই থাকবেন।

www.pathagar.com

আমার জায়গীরওয়ালার একটি ছোট ছেলে আকমল, তাকেই পড়াবার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত ছিল। ছেলেটি পড়াশোনায় মোটেই মনোযোগী ছিলনা। সে তার আব্বার রুটির দোকানেই হামেশা কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কাজেই ছাত্র পড়াবার মেহনত আমার খুব কমই ছিল।

আমি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে বি-এ ক্লাশে ভর্তি হতে গিয়ে প্রথমেই এক ধাক্কা খেলাম। বি-এ-ক্লাশে ভর্তি হওয়ার জন্য যে-পরিমান টাকা নিহায়েৎ না হলেই নয়, তা আমার ছিল না। এদিকে ভর্তির তারিখও শেষ হয়ে গেছে। লেট ফাইন দিয়ে কিছু কিছু ভর্তি হচ্ছে। এডওয়ার্ড কলেজের প্রিন্সিপাল স্বনামধন্য আজিমুদ্দিন সাহেব বেজায় কড়া মানুষ। ভাল ছেলে না হলে লেট ফাইন দিয়ে তিনি কাউকেই কলেজে ভর্তি করেন না।

আমি প্রিন্সিপাল আজিমুদ্দিন সাহেবের কাছে গিয়ে ছালাম দিয়ে দাঁড়ালাম। আমার ভর্তি হওয়ার টাকা নাই একথা বললেই তিনি বলে উঠলেন, দ্যাখো! হায়ার এডুকেশন ইজ নট্ ফর দি পুওর।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। তবুও মিন মিন করে তাকে শুনালাম। স্যার! আমাকে একটু চান্স দ্যান। আমি চেষ্টা করতে চাই যে, হায়ার এডুকেশন গরীবদের নছিবে হয় কিনা।

হু! গম্ভীর হয়ে আজিমুদ্দিন সাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর গলা উঁচু করে বললেন-শচীন! ওর কাছ থেকে একটা দরখাস্ত নিয়ে ওর কাছে যে টাকা আছে তাই দিয়ে ওকে ভর্তি করে নাও?

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, যাও! তোমার কাছে যা আছে শচীলের হাতে দাও গে। বাকী টাকা কলেজ ফান্ড থেকে দেওয়ার জন্য একটা দরখাস্ত শচীনের কাছে জমা দেওগে!

আমি ইংরাজীতে একখানা দরখাস্ত লিখে সেটা শচীনবাবুর হাতে দিলাম এবং আমার পকেটের পঁচাশিটা টাকাও তার হাতে তুলে দিলাম।

আমার দরখাস্তখানা নিয়ে শচীনবাবু একবার পড়লেন। তারপর সে খানা নিয়ে তিনি উঠে গেলেন প্রিন্সিপাল আজিমুদ্দিন সাহেবের কাছে।

বোধহয় আজিমুদ্দিন সাহেব দরখাস্ত পড়েছেন। কিছুক্ষণ পরেই প্রিন্সিপাল সাহেবের রুমে আবার আমার ডাক পড়লো। বুক দুরু দুরু করতে লাগলো আমার। এইবার বুঝি আমার ভর্তির আশাতেও ছাই পড়ে। দরখাস্ত লিখতে গিয়ে কিবা লিখে ফেলেছি। বোধহয় ভুল ভ্রান্তিতে ভরা দরখাস্ত পড়েই প্রিন্সিপাল সাহেবের মেজাজ গেছে বিগড়ে। আল্লাহ জানে! কি উপায় হবে আমার! নানা রকম আশংকা নিয়েই প্রিন্সিপাল সাহেবের রুমে ঢুকলাম।

প্রিন্সিপাল আজিমুদ্দিন সাহেব খুব মোলায়েম ভাষায় বললেন, তোমার নাম আবদুর রহিম? তুমি জায়গীর পেয়েছো তো?

www.pathagar.com

জি হ্যাঁ স্যার। দুই কথার জবার আমি একত্র দিলাম। তুমিতো দেখছি, বি-এতে এডিশনাল ইংরেজী নিয়েছো। ইংরেজী তো আমার সাবজেক্ট। ভাল করে পড়াশোনা করতে হবে কিন্তু! আমি প্রতিমাসে টিউটো রিয়াল পরীক্ষা নেই। সেই পরীক্ষায় ভাল ফল করলে তবেই তাকে আমি ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরণের সুযোগ দেই।

জি,স্যার। আমি নিয়মিত পরীক্ষা দেবো স্যার। এই কথা বলে আমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম তাঁর সামনে।

আচ্ছা যাও এখন! স্যার আমাকে বিদায় দিলেন। আমি চলে এলাম আমার ক্লাশে। আমাদের বি-এ, ক্লাশে সে বছর ২৯ জন ছাত্র ছিল। ছাত্রী একজনও ছিলনা। সে হচ্ছে ১৯৫২ সনের কথা। সেবছরই ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে প্রথম ভাষা আন্দোলনের শহীদ, ছালাম, বরকত, রফিক প্রমুখের প্রথম বর্ষ চলছিল। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি তখন তরতাজা।

বি· এ· ক্লাশে আমার ক্লাশমেটদের মধ্যে প্রায় সকলের নাম ভুলে গেছি। আমজাদ হোসেন, সাইফুল ইসলাম, শামসুল আরেফিন, আমির হোসেন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এই কয়জনের নাম ইয়াদ করতে পারছি। অন্যান্য সকলের নামও ভুলে গেছি।

১৯৫২ সনের মুদ্দতে পাবনা এর্ডওয়াড কলেজের অধ্যাপকমন্ডলীতে বাংলাদেশের মধ্যে মশহুর শিক্ষাবিদ ছিলেন। প্রিন্সিপাল আজিমুদ্দিন আহমেদ। ইংরাজীর অধ্যাপক কাজী আকরাম হোসেন ও কবি আবদুর রশিদ খান, বাংলার অধ্যাপক কবি মুফাখখারুল ইসলাম ও নির্মলেন্দু চক্রবর্তী। আরবীর অধ্যাপক কে· টি· হোসেন, অর্থনীতির অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, বিজ্ঞানের এন· আর· রায় ও বসন্ত বাবু প্রমুখ শিক্ষাবিদ কীর্তিমান ও খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন। আমি কবি মুফাখখারুল ইসলামের কাছে তার ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ মমতা হাসিল করেছিলাম। কিন্তু তিনি বেশি দিন এর্ডওয়ার্ড কলেজে ছিলেন না। তিনি সুরাইয়া বেগমকে শাদী করে পাবনায় নিয়ে আসার পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রংপুর কারমাইকেল কলেজে চাকুরী নিয়ে চলে গেলেন। বলা অনাবশ্যক যে ইছায়ী ১৯৫৩ সনের মুদ্দতে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ ও কারমাইকেল কলেজ, কোনোটাই সরকারী কলেজ হয় নাই। কারমাইকেল কলেজে বাংলার শূন্যপদে ইন্টারভিউ দিয়ে সিলেকশন লাভ করেই কবি মুফাখখারুল ইসলাম সাহেব সে কলেজে যোগদান করেছিলেন বলে আমরা শুনেছি।

আমাদের ইংরাজীর অধ্যাপক আবদুর রশিদ খানও কবি খ্যাতি হাসিল করেছিলেন। তাঁর নক্ষত্রঃ মানুষ, মন কাব্যটি তাঁকে প্রচুর কবি খ্যাতি দান করেছিল। তিনিও পাবনা কলেজে অধিক দিন ছিলেন না। সরকারী চাকুরী পেয়ে তিনি বেসরকারী কলেজের চাকুরী ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

এ সময় আমি দু'খানা কাব্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলাম। আমার প্রথম কাব্যের নাম ছিল। 'দিল করবী।' সেই কাব্য খানা নিয়ে আমি কবি বন্দে আলী

www.pathagar.com

সাহেবের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। কলেজ থেকে কবি বন্দে আলী সাহেবের বাড়ী আধা মাইলের মধ্যে। বন্দে আলী সাহেবের তখন দুই বিবি বিদ্যমান। তিনি আমার কাব্য দেখে খুশী হলেন এবং দোয়া করে আমার কাব্যে তার মন্তব্য লিখে দিলেন। আমার দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থের নাম ছিল "সাইমুম"। সে কাব্যখানা আমি মুফাখখারুল ইসলাম সাহেবকে দেখিয়েছিলাম। সে কাব্যখানা দেখে কবি মুফাখখারুল ইসলাম সাহেবও আমার তারীফ করে মন্তব্য লিখেছিলেন।

আমার প্রথম কাব্য দিল-করবী তে প্রায় শতেক খানেক ছোট বড় কবিতা ছিল। সেই সব কতিার রচনার ফাঁকে ফাঁকেই আমি একটি উপন্যাসও লিখেছিলাম। উপন্যাস খানার নাম দিয়েছিলাম 'সাথীহারা'।

সাইমুম কাব্য খানা রচনা করেছিলাম সাথীহারা ও দিলকরবী রচনা শেষ করার পর। কুষ্টিয়া কলেজে আই-এ পড়ার সময় সাইমুম কাব্যের রচনা শুরু করি। পাবনা কলেজে বি-এ ক্লাশে ভর্তি হওয়ার পর সাইমুম কাব্যখানা শেষ করে কবি মুফাখখারুল ইসলাম সাহেবকে কাব্যখানা দেখিয়েছিলাম। তিনি আমার কবি পতিভা দেখে মুগ্ধ হয়েই সেই পান্ডুলিপির মধ্যে তার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে বি-এ ক্লাশে কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল আমার ক্লাশমেট ছিলেন। জিয়া হয়দার সম্ভবতঃ সে সময় আই-এ পড়তো।

সে সময় গয়হাটার আজিজুল হক বি-এস, সি সাহেব "পাক হিতৈষী" নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পাবনা শহর থেকে নিয়মিত প্রকাশ করতেন। সেই পত্রিকায় সাব এডিটর হিসাবে চাকুরী করতেন টাংগাইলের বদিউজ্জামান সাহেব। তিনি তখন ম্যাট্রিক পাশ করে জীবিকার তালাশে টাংগাইল ছেড়ে পাবনা গিয়ে পাক হিতৈষীতে সামান্য বেতনে সাব এডিটর হিসাবে জিন্দেগী শুরু দিয়েছিলেন। সে সময় কবি ও গবেষক ফারুক মাহমুদও পাকহিতৈষীতে নামমাত্র পারিশ্রমিকে চাকুরী করতেন। ফারুক মাহমুদ পাবনায় "তমদ্দুন মজলিশ সংগঠনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ফারুক মাহমুদের সহবতে এসেই আমিও "তমদ্দুন মজলিশের" দিকে 'ঝুঁকে পড়েছিলাম। সেই ১৯৫২-৫৫ সনের মুদ্দতে তমদ্দুন মজলিশের সেক্রেটারী হিসাবে এম-এ আউয়ালের নাম আমরা জানতে পেরেছিলাম। তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাশেম এবং সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকার সম্পাদক আবদুল গফুর সাহেবদ্বয়ের নামও আমরা সেই সময় থেকেই ওয়াকিবহাল হয়েছিলাম।

আমার আব্বার কাছে শুনেছিলাম মওলানা কাফী সাহেবের নাম। মওলানা কফি সাহেব এর পুরো নাম ছিল আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়েশী, রংপুর জেলার বাসিন্দা হলেও পাবনায় আহলে 'হাদিস, জামাতের মোকতাদি সংখ্যা বেশুমার হওয়ার কারণে তিনি আহলে হাদিস জামাতের হেড অফিস পাবনা শহরেই কায়েম করেছিলেন।

www.pathagar.com

পাবনা শহরেব পূর্বে পাবনা নগরবাড়ী রোডের পাশেই সুদৃশ্য বিশাল জামে মসজিদটি ছিল আহলে হাদিস জামাতের প্রধান মসজিদ। প্রতি শুক্রবারে সেই মসজিদেই স্বয়ং কাফী সাহেব ইমামতী করতেন। তিনি ওয়াজ নসিহত করতেন অত্যন্ত বুলন্দ গলায়। আল্লাহতায়ালা তার সুললিত কণ্ঠস্বর ও বাগ্মীতা দেওয়ার সময় কিছুমাত্র কৃপণতা করে নাই।

মসজিদের পাশেই ছিল তার বাসাবাড়ী। সেই বাড়ির পাশে ছিল তর্জুমানুল হাদিস পত্রিকা অফিস।

আমার জায়গারী বাড়ী থেকে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে যাওয়ার পথেই সেই মসজিদ ও তর্জুমানুল হাদিস পত্রিকার অফিস দেখা যেতো। আমি তখন কবিতা ও গল্প লিখতাম। একদিন ঈদের উপরে একটি কবিতা নিয়ে তর্জুমানুল হাদিস পত্রিকা অফিসে প্রবেশ করলাম। ছালাম বিনিময়ের তর্জুমানুল হাদিসের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব আবদুর রহমান বি. এ. সাথে আমি পরিচয় গড়ে তুললাম।

কয়েক দিন পর দেখলাম তর্জুমানুল হাদিসে আমার ঈদের কবিতা ছাপা হয়েছে। আমার উৎসাহ বেড়ে গেলে। আমি আরো কয়েকটি কবিতা তর্জুমানুল হাদিস পত্রিকায় প্রকাশের জন্য জমা দিয়েছিলাম। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি কবিতা প্রকাশ পেয়েছিল।

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্রাবস্থায় আমি কয়েকটি বিপরিতধর্মী, গল্প লিখেছিলাম। সেই গল্পগুলি দিয়ে "দ্বিধারা" নামে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলাম। সেই দ্বিধারা গল্প গ্রন্থের একটি গল্প যে ধরনের বিষয় ও কাহিনীর উপর গড়ে উঠেছে, তার পরবর্তী গল্প ঠিক তার বিপরিত ধর্মী বিষয় ও কাহিনীর উপর গড়ে উঠেছিল। সেই 'দ্বিধারা' গল্প গ্রন্থের কাহিনী নির্মাণে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা ছিল।

এখানে প্রসংগতঃ উল্লেখ করতে হয় যে, আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ দিলকরবী। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ সাইমুম এবং প্রথম গল্প গ্রন্থ দ্বিধারা প্রভুতির পাণ্ডুলিপিগুলি খোয়া গেছে। সে গুলি খোয়া গেছে দীর্ঘ দিন পর। আমার চাকুরী জীবনের মাঝামাঝিতে আজাদ বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। সেই আজাদ বাংলাদেশের জমিনেই আমার প্রথম পাণ্ডুলিপিগুলি উঁই পোকার পেটে যায়। কেননা, সেগুলি যত্নের সংগে হেফাজত করার ফুরসুত আমার ছিল না। কেন ছিল না। সে কাহিনী যথা সময়েই বয়ান করা হবে।

এডওয়ার্ড কলেজে বি· এ পড়ার মুদ্দতে অর্থাৎ ১৯৫২-৫৫ সে· আমাদের সাংসারিক অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়ে ওঠে। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে আমার পক্ষে পড়াশোনা ত্যাগ করে যে কোনো রকমের রুজি রোজগারের পথ বাছাই করে নেওয়াই জরুরী ছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু আমি বাড়িতে গিয়ে আমার আব্বা আমার সাথে আমার পড়াশোনা নিয়ে বেজায় ঝগড়া করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার আব্বাজান পাড়ার মসজিদের ইমাম। কিন্তু তার কোনো খোরাকী ছিল না। তিনি দুই বেলা ছোট ছেলেদের ছেপাড়া পড়িয়ে সামান্য কিছু মুষ্টি পেতেন। কিন্তু তাতে আমার আব্বা আম্মা ভাই-ভাবী ও তাদের তিনমেয়ে সহ ৭টি মুখের দানা পানি জুটতো না। আমার ওয়ারিশী সূত্রে প্রাপ্ত কয়েক বিঘা জমি ছিল। হালের গরু না থাকায় আব্বা সেগুলি খাই খালাসী দিয়ে রেখেছিলেন। যে জমিটা তিনবছরের জন্য খাইখালাসী দেওয়া ছিল, পয়সার টানাটানি পড়লে সেই জমিই আরো তিনবছর বাড়িয়ে খাই খালাসী দেওয়া হতো। জমির শস্য খেয়ে টাকা শোধ, এই খাই-খালাসী পদ্ধতির বেলায় টাকার পরিমাণ হতো খুব কম। যার ফলে কিছু দিন পরেই আবারও খাই খালাসীর মেয়াদ বাড়ানো ছাড়া উপায় থাকতো নয়।

আমি পাবনা থেকে বাড়ীতে গেলে, জমি খাই খালাসী দেওয়ার আর কোনো উপায় নাই, যারা খাই খালাসী নিয়েছে তারা আর টাকা বাড়াতে রাজী নয় এমতাবস্থায় আমাদের বাঁচার আর কোনো উপায় নাই- এইভাবে বয়ান পেশ করে আমার আম্মা আমাকে যে কোনো একট চাকুরী বাকুরীর জন্য বললেন।

পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে চাকুরীর কথা বলতেই আমার মেজাজ গেল বিগড়ে। আমি আব্বা আম্মাকে খুব বকা দিতে লাগলাম। সেই দিন প্রথম আমি আব্বা-আম্মাকে বললাম, নিজেরা জানে কষ্ট দিয়ে জমি গুলি তোমরা ধরে রাখছো কার জন্য? আমি কথা দিলাম, আমার অংশের সমুদয় জমি তোমরা বেঁচে খাও। আমি পড়াশোনার কোনো খরচ পাতি চাই না, আমি নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে পড়াশোনা করবো। আমি যদি তোমাদেরকে কিছু দিতে পারি , দিব ; কিন্তু সেজন্য তোমাদের কিছু বলতে হবেনা।

আমার কথা শুনে আমার আব্বা ছলছল চোখে নীরবে আমার সম্মুখ থেকে সরে গেলেন। সে সময় আব্বার ঠোঁঠ দিয়ে যে কথা গুলি বেরোলো না, আম্মার মুখ থেকে সেই কথা গুলি আমি শুনতে পেলাম। আম্মা বললেনঃ তোদের জন্যই জমিগুলি বেঁচে না খেয়ে খাইখালাসী দিয়ে রাখা হয়। বেচে খেলে তো জমিগুলি হাত ছাড়া হয়েই যাবে।

তখন আমার আব্বা-আম্মাকে এমন কোনো সান্ত্বনা দিতে পারি নাই যে, তোমরা জমি বেচে খাও, আমি হাজার হাজার টাকা কামাই করে তোমার দশগুন জমি কিনে দেবো। কেন তেমন কোনো আভাস দিতে পারি নাই, তার কারন ছাত্রজীবনে আমাদের জিন্দেগীর সঠিক কোনো আইডিয়া থাকেনা। যদিও আমরা ম্যাট্রিক ক্লাশ থেকেই 'তোমার জীবনের লক্ষ্য কি' এর উপর রচনা লিখে থাকি, আসলে আমাদের অনুন্নত সমাজ ও পরিবেশ থেকে আমরা জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছুই ঠাহর করতে পারি না। সেই কারনে লেখাপড়া শেষ করে কি ধরনের চাকুরী করবো, কতো টাকা কামাই করবো , সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো পূর্ব ধারনা থাকেনা।

www.pathagar.com

বাড়ী থেকে পাবনায় ফিরে আমি উপরি রোজগারে জন্য প্রাইভেট টিউশনী শুরু দিলাম। পাবনা কলেজ থেকে আমার জায়গীর বাড়ি প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত। শহরে প্রাইভেট পড়িয়ে রাত্রি প্রায় নয় দশটার সময় জায়গীর বাড়ি ফিরতাম।

এ সময় পাবনা শহরে শাহজাহান একটা ষ্টেশনারী দোকান খুলেছে। দোকান ঘরটি পাবনা বনমালী ইনষ্টিটিউটের কাছে বানী সিনেমা হলের কাছাকাছি মেইনরোডে অবস্থিত। অপর দিকে পাবনা সদর হাসপাতাল। সেই হাসপাতালে মেইল নার্সের চাকুরী করতেন শাহজাহানের ছোট বোনের জামাই আব্দুল করিম তালুকদার। করিম মিয়া শাহজাহানের দুলাভাই, আমারও দুলাভাই। দুলাভাইয়ের বাড়িতে থেকে শাহজাহান ষ্টেশনারী দোকান চালায়।

সেই দোকানের নামকরন করে দিয়েছিলাম আমি নিজে। আমি ইংরাজী ডিক্‌শোনারী ঘেটে দোকানের নাম রেখেছিলেম প্যারাগন ষ্টোর। প্যারাগন ষ্টোর খুব অল্প দিনের মধ্যে শহরের অভিজাত ষ্টোরের ইজ্জত হাসিল করেছিল। সেল্‌সম্যানের কাজ করতে করতে অনেকদিন আমার জায়গীর বাড়ি যাওয়াই হোতোনা। রাত্রিটা দোকানঘরের মধ্যে শো-কেসের আড়ালে পাতা চৌকির উপর বিছানা পেতে কাটিয়ে দিতাম। কিছু দিন পর শাহজাহানের ছোট ভাই তোতাও এসে প্যারাগন ষ্টোরের দোকানদারীতে হাত মেলালো। শাহজাহান তোতা এরা দুভাই। দুভাই তাদের বোনের জামাই করিম মিয়ার বাসায় খায় এবং থাকে। দোকানে বিক্রীর কিছু পয়সা দিয়ে বাজার সওদাও করা হয়। মাঝে মাঝে আমিও করিম দুলাভাইয়ের বাসায় খাই। আমাকে শাহজাহানের বোন নিজেরই আরেকটা ভাইয়ের মতো দেখে।

প্যারাগন ষ্টোর খুব জমজাট হওয়ার ফলে আমি জায়গীর বাড়ি খুব কমই যেতাম।

এ সময় তাস খেলার দিকে আমাদের ঝোঁক বেড়ে গিয়েছিল। তোতা আমাদের ছোটভাই। সে যখন দোকান দেখাশোনা করতে শুরু দিল তখন আমাদের একটু ফুরসূত জুটেছিল। সেই ফুরসুতে আমরা শো–কেসের আড়ালে পাতা চৌকির উপর তাসের আড্ডা জমাতাম। সেই আড্ডায় দুলাভাই করিম মিয়ার সাথে সদর হাসপাতালের কম্পাউন্ডার আমিনুল হক সাহেব এসে জুটলেন।

আমিনুল হক সাহেব আমার দুরবস্থার কথা শুনে আমাকে জায়গীর ছেড়ে দিয়ে তার কোয়াটারে উঠে আসতে বললেন। আমি জায়গীরটা ছেড়ে না দিয়ে মাঝে মাঝে তার কোয়াটারে থাকতে লাগলাম। আমার পেট খরচের কোনো অসুবিধা রইলোনা। এমনকি দুএকখানা কাপড় চোপড় ও আমিনুল হক সাহেব আমাকে কিনে দিতেন।

এসময় কবিতা ও গল্প লেখার প্রতিও আমার বেজায় ঝোঁক পয়দা হয়েছিল। একদিন কবিতার ছন্দ মিলাতে মিলাতে পাবনা বাজারের দিকে যাচ্ছি। সদর হাসপাতাল থেকে বাজারে ঢোকার লেনটি বেশী প্রশস্ত নয়। গরুর গাড়ী আসছিল ঐ লেন দিয়ে। আমার সেটা আদৌ

www.pathagar.com

খেয়াল ছিল না। গাড়িটা যখন একটা বাক ঘুরতে যাচ্ছে, আমি তখন সেই বাঁকের মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। গাড়িওয়ালা আমাকে বাঁচাবার জন্য গরুকে যতই সামাল দিতে কোশেশ করছিল, গরু দুটি জোরে গাড়ি টেনে নিচ্ছিল দেখতে দেখতে গরুর গাড়ির চাকার খিল আমার ডাম উরুর উপর দিয়ে চলে গেল। কয়েক সেকেন্ড পরে আমি ব্যথায় প্রায় অজ্ঞান হওয়ার যোগাড়। আমাকে রিকসায় উঠিয়ে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কম্পাউন্ডার আমিনুল হক সাহেব আহা উহু করে দুঃখ প্রকাশ করতে করতে আমার ব্যান্ডেজ বেধে দিলেন। তিনিই তৎক্ষনাৎ আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে আমাকে সুন্দর একটা সীটে নিয়ে শুইয়ে দিলেন। পায়ের ঘা যতদিন না সেরেছিল ,ততদিন তিনি আমাকে হাসপাতাল ছাড়তে দেন নাই।

আমার সেই আত্ম ভোলা ব্যাপারটা দীর্ঘদিন তাদের রসালাপের বিষয়বস্তু ছিল। গরুর গাড়ির সাথে এক্সিডেন্ট করলে তার নাকি পাঁচ আইন মোতাবেক শাস্তি হয়। আমারও নাকি সেই শাস্তি হওয়া উচিৎ ছিল। যাহোক পাঁচ আইন মোতাবেক আমার কোনো শাস্তি না হলেও, বাস্তবে আমার অনেক বড় শাস্তিও হয়েছিল। সেই এক্সিডেন্টে আমার উরুর যে মাংশ কেটে গিয়েছিল সেই জায়গাটা এখন পর্যন্ত পূরন হয় নাই। আমরন স্মৃতি হয়েই আছে সেটা।

কম্পাউন্ডার আমিনূল হকের জন্মস্থান টাংগাইলের মধুপুরে। তিনি অতুলনীয় অধ্যবসায়ের নজির স্থাপন করেছেন। পাবনা সদর হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেই তিনি প্রাইভেট ভাবে এম·বি· বি· এস পাশ করেন। এসিষ্টেন্ট সার্জন হিসাবে প্রমোশন নিয়ে ঢাকা সেক্রেটারিয়েট ডিস্‌পেন-সারীতে যোগদান করেন। তিনি সিভিলসার্জন হিসাবে কার্যরত অবস্থায় অবসর গ্রহন করে বর্তমানে তবলীগে আত্মীনিয়োগ করেছেন। তার একটি মাত্র ছেলে গালীব। তিনি আমার বিয়ের সময় আমার উকিল হয়ে ছিলেন। সেই সুবাদে আমার স্ত্রী নূরজাহানের তিনি উকিল বাপ এবং আমার উকিল শশুর। আমার আপন শশুর মরহুম নইউদ্দিন সাহেব যখন দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হন, সে সময় আমার উকিল শশুর ডাঃ আমিনূল হক যে ধরনের সেবা সশ্রুষা করেছেন, তার কোনো তুলনা হয় না ।

আমার উকিল শাশুড়ী ডাঃ গুলনাহার বেগমও এম, বি, বি· এস ডাক্তার। তিনিও আমাদের প্রতি গভীর স্নেহের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের কাছে আমরা আপন শশুর শাশুড়ীর মতোই যত্ন পেয়ে এসেছি।

শাহজাহানের দুলাভাই করিম মিয়া অর্থাৎ আবদুল করিম তালুকদার একটি বিশেষ কারনে অমর স্মৃতির খোরাক হয়ে আছেন। তিনি তালুকদার বংশের মানুষ , কাজেই তালুকদারী স্বভাব তার যায় না। তার একটি ওভার কোর্ট ও একটি ফুলপ্যান্ট সম্বল। সেই দুটি পরেই তিনি হাসপাতালের ডিউটি করতেন। বাড়িতে এসে পরতেন আমাদের আপার পরনের শাড়ী। এ সময় কেউ ডাকতে এলে তাকে বাইরে কয়েকমিনিট সবুর করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলতেন। তাড়াতাড়ি আপার শাড়ীটা বদলিয়ে

www.pathagar.com

পুনরায় সেই প্যান্ট ও ওভারকোট পরে ফিট্‌ফাট হয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে আসতেন। সারাজীবন তালুকদার সাহেব তার ষ্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখার জন্য একটি প্যান্ট ও ওভারকোর্ট সম্বল করে কাটিয়ে গেছেন। শুধু তাই না। ঘরের মধ্যে বেগুন ভর্তা শুটকি মাছের তরকারী কিংবা পাত-া ডাউল দিয়ে ভাত খেতে বসেও পাশে বাসার লোকেরা যাতে শুনতে পারে, এমনভাবে গলা চড়িয়ে আপাকে ডাকতেন, শুনছোনা হান্নানের মাও! খাসির গোশ্‌ত এত দিচাও কেন ? মুরগির রোস্টটা বেশী করে দাও।

আমরা তো শুনে চোখ কপালে তুলতাম। দুলাভাই বলে কি? খাচ্ছে বেগুন ভর্তা। আর বলছে খাসির গোশ্‌ত এত দিচাও কেন ? মুরগির রোস্ট দাও।

জবাবে দুলাভাই মুখ টিপে টিপে হাসতেন এবং ফিসফিস করে বলতেন , ও বাড়ির লোকের মনে হিংসা জাগিয়ে দিলাম। বুঝুক , তালুকদারী করা সোজা না। প্রতিদিন মাছ মাংস, পোলাও কোরমা জোটাবার মুরোদ থাকা চাই।

এখন আমরা অনুভব করতে পারি , আমাদের করিম দুলাভাই যদিও নিদারুন অভাবের মধ্যে থেকেও তামাসা ছলে আনন্দ কুড়াতে চাইতেন, কিন্তু সেটা আসলে ছিল তার আত্মপীড়ন। হাসপাতালের মেইল নার্স হিসাবে তার মাসিক বেতন ছিল ১১৮ টাকা। শাহজাহান, তোতা এবং কখনো আমাকে দিয়ে তার পাঁচ ছেলেমেয়ের সংসার ছিল হা-ভাতের হাট। প্রতিদিনই তার নূন আনতে পান্তা ফুরাতো। তা সত্বেও কাউকেই তিনি অনাদর করতেন না। একটু ফুরসূত পাওয়া মাত্র করিম দুলাভাই আমাদেরকে নিয়ে তাস খেলতে বসতেন। হাসপাতাল থেকে জরুরী কোনো কল না আসলে তিনি চুটিয়ে তাস খেলে চলতেন। আপা খাবার জন্য ডাকাডাকি করলেও তার হুশ হতো না।

করিম দুলাভাই অকালে এন্তেকাল করেছেন। তার চারপাঁচটা ছেলে মেয়েকে মানুষ করে যাওয়ার নছিব তার হয় নাই। তিনি যতদিন জিন্দা ছিলেন, ততদিন শত অভাবের মধ্যেও যতই তিনি পুষ্পের হাসি হেসেছেন, কিন্তু ক্যানসার রোগ তাকে খাতির করে নাই। পুষ্টিকর খাবার অভাবেই করিম দুলাভাই মাঝবয়সে নিষ্ঠুর সংসারের মায়া ত্যাগ করে চির শান্তির দেশে চলে গেছেন।

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে আমার একজন ক্লাশমেট ছিল। দিনাজপুর জেলার পোর্শা গ্রামের বাসিন্দা। তার নাম ছিল মনসুর আলী। আর একজন ক্লাশমেট ছিল, স্থল চৌহালীর কাছে বসন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা। তার নাম ছিল আবু তাহের। দুজনের সাথে আমার মহব্বত ছিল গভীর।

এক রমযান মাস আমি আবু তাহেরের সাথে বসন্তপুরে কাটিয়ে ছিলাম। যদিও বসন্তপুর থেকে গাবের পাড়া আমার মামার বাড়ী মাইল চারেক দূরে; তবুও আমি গরীব মামার বাড়ি না থেকে ধনী আবু তাহেরদের বাড়িতে রোজার মাসটা কাটিয়েছিলাম।

সে সময় আমাদের সাংসারিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুন। আমার পড়াশোনার জন্য আমি সংসারে টাকা পয়সা দিতে পারতাম না বলে আমার আব্বা আম্মা খুবই

www.pathagar.com

পেরেশানীতে দিন কাটাতেন। আবু তাহের তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল তার এক ধনী আত্মীয়ের মেয়ের সাথে আমার বিবাহ সম্পর্ক গড়ে দেওয়ার জন্য। আমি নিজে বসন্তপুরে সশরীরে হাজির হয়ে তাদের আর্থিক অবস্থার পরিচয় পেয়েছিলাম। তাদের বাড়ির কর্তা ৮ বার হজ্জ করেছেন। ১০বছরের ছোট ছেলেটিও একবার হজ্জ করে এসেছে। সকলের মাথাতেই হামেশা কাপড়ের গোল টুপি। আমার মাথায় বাবরী চুল। কিন্তু আমার মোছ দড়ি ক্লিন সেভ অর্থাৎ সম্পূর্ন চাঁচা। আমার ক্লাশমেট আবু তাহেরের বোধকরি ফুফাতো বোন হবে। তার সাথেই আমার বিয়ের কথা হচ্ছিল। আবু তাহের বললোঃ আপনি হামেশা জাহির করেন, মুসলমানের মধ্যে কোনো জাতপাতের প্রশ্ন নাই, তাহলে আমাদের কারিকর সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনি নিজে শাদী করেন না কেন? আপনার পড়াশোনার খরচ বাবদ আমরা ১ লাখ টাকা দেবো। আমি তার জবাবে বলেছিলাম, আমি নিজে তো কোনো জাতপাত মানিনা। কিন্তু সমাজের ভেদাভেদ তো একা একা দূর করতে পারবো না। সকলের মধ্যে যখন জাতপাত সম্পর্কে ধ্যান ধারনা পালটাবে, সে সময় আমিই প্রথম বিয়ে-শাদীতে উৎসাহ জোড়াবো।

একমাস রমযানের ছুটি কাটিয়ে আমি আবু তাহেরদের বাড়ী থেকে পাবনা ফিরে এসেছিলাম। বলা বাহুল্য, আমার বিয়ের ব্যাপারে আর কোনো অগ্রগতি হয় নাই।

পরের বছরের রমযানের একমাস আমি কাটিয়েছিলাম আমার ক্লাশমেট মনসুর আলীর সাথে দিনাজপুর জেলার পোর্শা গ্রামে। পোর্শা গ্রামটাকে সেই ১৯৫৪ ইং সনের মদ্দতেই দেখেছিলাম খুবই মশহুর। বর্তমানে সেটা উপজেলায় পরিনত হয়েছে বলে শুনেছি। আমি যখন গিয়েছি, তখন পোর্শা গ্রামে থানা বসে নাই; কিন্তু পরে সেখানে থানাবসেছে।

পোর্শা গ্রামে প্রায় একমাস কাল কাটিয়েছিলাম। সেখানকার বিচিত্র স্মৃতি কথা লিখে কয়েক কিস্তিতে ঢাকা থেকে এ·কিউ· এম জুলফিকার হায়দার সম্পাদিত "সাপ্তাহিক নতুন দিন" পত্রিকায় আমি ছাপিয়েছিলাম। ঢাকায় পড়াশোনা কালে আমি কিছু দিন সাপ্তাহিক নতুন দিনে সাব-এডিটরের কাজ করেছিলাম। সেই সুযোগে নিজের অভিজ্ঞতা পত্রিকায় ছাপিয়েছিলাম। দিনাজপুরে রোজার দিনে ছিলাম বড়ই আরামে। সে সময়টা ছিল চৈত্র মাস। দিনাজপুর এলাকায় 'লু' হাওয়া বইত। কিন্তু আছর করতো না কিছুই। দোতালা তিন তালা মাটির ঘর। মাটির ঘরে বেজায় আরাম। আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল একটি দোতালা ঘরে। আমি সে সময় গজল ও হিন্দী গান খুব গাইতাম। আমার গলা যে মধুর, সেটা শ্রোতাদের আগ্রহ দেখেই বোঝা যেতো। আমার গজল শোনার জন্য পোর্শা গ্রামের মেয়েরা আমাদের ঘরের চারপাশে এসে উকিঝুঁকি মারতো। আমার ক্লাশমেট মনসুর আলীও তাতে মজা পেতো। আমি বেশ মজা পেতাম। ভাল লাগা থেকেই বেশ ভাল গান একের পর এক গেয়ে চলতাম।

www.pathagar.com

পোর্শা গ্রামের প্রতিটা লোকই ছিল বেজায় মালদার। এক একজনের প্রায় ৫/৬ হাজার বিঘা জমি। অধিকাংশ লোকের বাড়ীর সামনে ধানের মুড়গা ছিল ৫/৬ টি করে। মসজিদের গম্বুজের মতো করেই পালা দিয়ে ধান রাখার মুড়গা তৈরী করে বাহির আঙিনায় সারি সারি বসিয়ে রাখা হতো। প্রত্যেক মুড়গায় প্রায় পাঁচশ মন ধান রাখা যেতো। সে এলাকার গেরস্তরা ছিল বেজায় ধর্মভীরু, আমি সেখানে কয়েকটি জুমার নামাজে খোতবা পাঠের পর ওয়াজ করেছি। সেই ওয়াজের মধ্যে আমি বয়ান করেছি , আমাদের মুসলমান কওমের মধ্যে হানাফী লামোযাহাবী ইত্যাদি ভেদাভেদ সম্পূর্নই ভুল পীরালী সিষ্টেম ও ছহি নয়।

১৯৫৪ সনের আমলে পোর্শা থানার অধিবাসীদের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়াচ ছিল না বললেই চলে। মেয়েদের পোষাক আষাকের মধ্যে প্রাচীনতা ছিল চোখে লাগার মতো। মেয়েরা একখানা তহবন পরতো এবং একখানা গামছা কাঁধের উপর দিয়ে এক মাথা বুকের উপর , আরেক মাথা পিঠের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে পরনের তহবনের মধ্যে আটকে রাখতো। খুব মালদার পরিবারেও এই তহবন ও গামছাই ছিল মেয়েদের পোষাক। শাড়ী ব্লাউজ পরতে মেয়েরা অভ্যস্ত ছিল বলে মনে হয় না। প্রতিটি মালদার পরিবারে বাড়ির সামনে থাকতো পুকুর। সেই পুকুরে মেয়েরা গোছল সেরে না যাওয়া পর্যন্ত পুরুষের ঘাটে নামা নিষেধ ছিল।

আমি নিজে গোছলের সময় তৈরী হয়ে পুকুর ঘাটে গিয়ে দাঁড়াবার পরে মেয়েদেরকে চলে যাওয়ার জন্য ডাক ছেড়ে জানান দেওয়া হতো। যে পরিবারের পুকুর ঘাট, সেই পরিবারেরই কোনো একজন পুরুষ মানুষ ঘাটের কাছে গিয়ে হাঁক দিয়ে উঠতো, ঘাট খালি করো বলে। মেয়েদেরকে পর্দা পুসিদার মধ্যে রাখার ব্যাপারে ধনী গরীব সকলের মনোভাব প্রায় এক রকমই দেখেছি।

পোর্শা গ্রামের মালদার পরিবারের মেয়েরা আরাম আয়েশ ভোগ করতো যথেষ্ট। মাইল খানেক দূরেই সাঁওতাল পল্লী। খুব ফজরে সাঁওতাল মেয়েরা মালদার গেরস্তদের বাড়িতে ঝি-গিরি করতে আসতো। তাদের ও পরনে ছিল একখানা তহবন ও বুকের উপর গামছা। সাঁওতাল মেয়েদের মধ্যে বড়কে মান্য করার রেওয়াজ কড়াকড়ি ভাবে পালন করা হতো। ওরা যখন নিজ নিজ বাড়ি থেকে পথে নেমে মালদার গেরস্ত বাড়ীতে কাজে যাওয়ার জন্য হাটা দিতো, ছোট তারপর আরো ছোটো, এভাবে লাইন ধরে হেটে যেতো। কোনো অবস্থাতেই পথের মধ্যে লাইন ভাঙতোনা। এক এক করে মালিকের বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে সেই হিজুল ফুলের মতো লাইনটি নিঃশেষ হয়ে যেতো ।

সাঁওতাল মেয়েরা দেহে বেজায় হৃষ্টপুষ্ট। মেহনতও তারা খুবই করতে পারে। তারা ফুল খুব ভালবাসে।

বিশেষ করে কড়ি গাছের হলুদ ফুল তাদের বেজায় প্রিয়। গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ ফুল খোপায় গুঁজে প্রতিটি সাওতাল মেয়ে মালদার গেরস্ত বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করতে আসে। সাঁওতালদের নিজেদের একটা মাতৃভাষা আছে। কিন্তু তারা সুন্দর বাংলাও

www.pathagar.com

বলতে পারে। মুখের কথা শুনে বোঝবার উপায় নাই, তারা সৎ গেরস্ত কিনা। থ্যাবরা নাক দেখেই বোঝা যায় , তারা সৎ গেরস্ত ঘরের মেয়ে নয়।

তবে দেখা গেছে, বহু সাঁওতাল মেয়ের চেহারা দিন দিন পাল্‌টে যাচ্ছে। তারা সৎ গেরস্ত বাড়িতে কাজ করতে এসে এদের জীবন যাপন পদ্ধতির সংগে গভীর ভাবে পরিচিত হয়। নিজেদের সমাজেও তারা সেই পরিবর্তনের ছোঁয়াচ লাগায়। তাছাড়া কোনো কোনো সাঁওতাল মেয়ের রূপেগুনে মুগ্ধ হয়ে অনেক সৎ গেরস্ত ঘরের ছেলে শাদী করে ঘরে তোলে। এভাবে সমাজে ও রক্তে মিশ্রন ঘটে যায়।

পোর্শা গ্রামের মসজিদে জুম্মা নামাজের পর আমি প্রগতিশীল বক্তব্য পেশ করার ফলে ভাটি মুল্লুকের মোল্লারা তাদের খোদকারী নষ্ট হওয়ার আশংকায় সেখানকার সোজা সরল অধিবাসীদেরকে আমার বিরুদ্ধে নানারূপ তহমত দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। আমার দোস্ত মনসুর আলী একদিন খুব পেরেশান হয়ে আমাকে বললো, আজ রাতেই আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে না পারলে দুজনেরই বিপদ আছে।

বিদেশের বাড়িতে কি বিপদ আছে অতো খোঁজ পাত্তা না নিয়ে দোস্তের কথা মতো সেই রাত্রিতেই গরুর গাড়ী যোগে পোর্শা গ্রাম ত্যাগ করে রোহনপুর ষ্টেশনে হাজির হলাম। সেখান থেকে ট্রেনযোগে সোজা পাবনা ঈশ্বরদি, সেখান থেকে বাস যোগে পাবনা শহরে ফিরে এসেছিলাম।

বি-এ, পরীক্ষা দেওয়ার পর আমার অন্যান্য ক্লাশমেটদের মত্যে ঘরে ফিরে গিয়ে আব্বা-আম্মা ভাই ভাবী ও ভাই ঝিদের মাঝে আনন্দ কলোরবে কিছুদিন কাটাবার নছিব আমার ছিল না। যদিও বাড়ীতে আমার আব্বা-আম্মা, ভাই ভাবী ও ভাইঝিরা মিলে একটি গুলজার করা সংসার ছিল । কিন্তু সংসারে উপার্জন করার লোকের অভাবে আমাদের সংসারটা দৈন্য দশায় হামেশা ধুকে ধুকে চলতো। আব্বা পাড়ার জামাতের মসজিদে ইমামতী করতেন ফ্রি। নামাজে ইমামতী করে পয়সা নিলে ছোওয়াব বিক্রী করে দেওয়া হয়, এইটা ছিল আমাদের বাড়ীর সকলের ধ্যানধারনা। বিদ্যাকে দান করতে হবে বিনামূল্যে, তবেই ছোওয়াব হবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই দাদা বড় বাড়ীর মসজিতে সারাজীবন ইমামতী করেছেন ফ্রি। ছোট চাচাও জটিবাড়ী গ্রামে ইমামতী করতেন ফ্রি।

আমাদের জামাতের লোকেরা আমাদের সংসারের দারুন অভাব-অনটন দেখে আমার আব্বার কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন, মোল্লা সাব। আপনি আমাগোরে ছেলেমেয়েগুলিকে আরবী বাংলা শেখান; আমরা নিয়মিত মুষ্টি দেবো! সেই প্রস্তাব মোতাবেক আমার আব্বা সেই মক্তবে পড়িয়ে

www.pathagar.com

যা কিছু সাপ্তাহিক মুষ্টি পেতেন; তাতে আমাদের একপেট খেয়ে চলতো। তিনবেলা খাওয়া চলতো না।

কাজেই আমার কামাই রোজগার ছাড়া সংসার চলার আর কোনো উপায় ছিল না

বি–এ· পরীক্ষা দিয়েই আমি পাবনা শহরের বিখ্যাত হাইস্কুল জি, সি, ইনষ্টিটিউটে একজনের বদলিতে ছয়মাসের জন্য চাকুরী পেয়ে গেলাম। সেখানে আমি কয়েকজন প্রিয় ছাত্র পেয়েছিলাম। তাদের মধ্যে একজন রশিদ হায়দার বর্তমানে বাঙলা একাডেমীর একজন পরিচালকের পদে আছে।

জি·সি· ইনষ্টিটিউটে বদলি চাকরী শেষ না হতেই আমি জুবিলী হাই স্কুলে চাকুরী পেয়ে গেলাম। পাবনা জুবিলী স্কুল খুব নাম করা মাইনর স্কুল। বৃত্তি পরীক্ষায় জুবিলী মাইনর স্কুলের ছাত্ররা প্রতি বছর রেকর্ড করে থাকে। ১৯৫৫ সনে আমি যখন জুবিলী স্কুলে যোগদান করলাম তখন সেটা হাইস্কুলে উন্নীত করার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

জি·সি· ইনষ্টিটিউট ও জুবিলী হাইস্কুলে সামান্য কিছু দিন চাকুরী কালেই আমার কৃতিত্বের বিষয় ছড়িয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়। সে সময় পাবনার আটঘড়িয়াতে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। আটঘড়িয়া থানার তৎকালিন বড় দারোগা সাহেব পৃষ্ঠ পোষকতা দান করে সেই হাই স্কুলটা কায়েম করেছিলেন।

একদিন আটঘড়িয়া থানার দারোগা সাহেব উক্ত স্কুলের সেক্রেটারী এবং কয়েকজন প্রভাবশালী মেম্বরকে আমার কাছে পাঠিয়ে আমাকে একরূপ জোর করেই ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেলেন। জুবিলী হাই স্কুলের চাকুরী খুব আরামের, সে কথা চিন্তা করেই তারা একরূপ জোর করেই আমাকে আটঘড়িয়াতে নিয়ে গেলেন। আমার উপর তাদের বিরাট আশা ভরসা। আমি তাদের হাই স্কুলটা গোছগাছ করে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবো।

আমাকে আটঘড়িয়া হাই স্কুলের সেক্রেটারী সাহেবের বাড়ীতে বিশেষ তাজীমের সাথে রাখা হল। আমি তাদের আশানুরূপ শ্রম দিয়ে আটঘড়িয়া হাই স্কুল কায়েমে আমার যথাসাধ্য অবদান রেখেছিলাম। সেখানে চাকুরী করে বাড়ির খরচ চালাবার পরেও ৮৪০। – টাকা আমি জমাতে

পেরেছিলাম। সেই টাকা নিয়ে এম, এ পড়ার জন্য ঢাকা গিয়েছিলাম। আটঘড়িয়ার হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষ আমাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, আমার উচ্চ শিক্ষা লাভের পরিকল্পনার জন্য।

ঢাকা গিয়ে নীলক্ষেত ব্যারাকে শাহজাহানের ভাগিনেয় সেই সুবাদে আমারও ভাগিনেয় মাহবুবুর রহমানের রুমে মাথা গুঁজলাম। শুরু করলাম পার্ট টাইম চাকুরীর খোঁজে নানা জায়গায় দৌড়াদৌড়ি। প্রথম চাকুরী পেলাম এ, কিউ, এম, জুলফিকার হায়দার সাহেবের "নতুন

www.pathagar.com

দিন'' পত্রিকায়। ৪০।–টাকা মাসোহারার সাব এডিটরের চাকুরী।

বাংলায় এম·এ· ক্লাশে ভর্তি হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। ইকবাল হলে সীট নিয়ে ঢাকা ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হতে হবে। হোস্টেলবাসী হয়ে ঢাকা ভারসিটির পড়াশোনা চালাতে গেলে যে খরচ, সেটা পোষাবার মতো সংগতি আমার ছিল না। হাতের পুঁজি কয়েকশ মাত্র টাকা। ভর্তি হতে গিয়েই প্রায় নিঃশেষ। সম্ভবতঃ সেই ১৯৫৬ সনের আমলে এম· এ· ক্লাশে ভর্তি হতে বিভিন্ন আনুসংগিক খরচ ছিল ২১৮।– টাকার মতো। ইকবাল হলে সীট রেন্ট ছিল মাসে ১৮।–টাকা। খাওয়া–দাওয়ার চার্জ দিতে হতো ২২।– টাকা। তখন ইকবাল হলের ক্যানটিনে সকাল বিকালের নাস্তায় খরচ পড়তো ১টাকা চার আনা। তাতে দুটো মোটা পরোটা, ডিম মামলেট এবং এককাপ চা সহজেই জুটতো।

১৯৫৮ সনে এম,এ, ফাইনাল পরীক্ষার বছরে দ্রব্যমূল্য কিছু বেড়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। তখন হোস্টেল চার্জ দিতে হতো ৩৪।–টাকা

১৯৫৬–৫৮ সনের আমলে একজন হোস্টেলবাসী ছাত্রের জন্য ১০০–১২৫।– টাকা না হলে চলতো না। তখনকার আমলে এক ভরি সোনার দাম ছিল ৩০০।–টাকা। বর্তমান ১৯৯৪ সনে সোনার দাম সাড়ে ছয় হাজার টাকা। সে হিসাবে ১৯৫৬–৫৮ সনের আমলে বর্তমান আমলের মুদ্রামানে দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা খরচ পড়তো, একজন ছাত্রকে হোস্টেলে থেকে ভারসিটির পড়াশোনা চালিয়ে যেতে। গরীব ও নিম্নবিত্তের মানুষের ছেলেরা ভারসিটিতে পড়ার সুযোগ খুব কমই পেতো। আমি তো গরীবও নই, নিম্নবিত্তেরও নই। আমি বাপ–মা–পরিজনের ভরন–পোষন চালিয়ে পড়াশোনা করতাম। কিন্তু ঢাকায় এম, এ, পড়তে আসার আগে আমার আব্বা–আম্মাকে বলে এসেছিলাম, এম, এ, পড়ার খরচ জুটিয়ে তার উপর তোমাদের ভরন–পোষন করা আমার পক্ষে সম্ভব হবেনা। জমাজমি যা আছে, বিক্রী করে তোমরা খেয়ে বাঁচো। আমি এম, এ, পাশ করে চাকুরীতে ঢুকে তোমাদের জমাজমি উদ্ধাব করে দেবো।

কিন্তু আব্বা জানতেন যে, পৈতৃক জমি একবার হাত ছাড়া হলে আর কখনো ফিরে আসে না; কাজেই তিনি অনাহারে অর্ধাহারে থেকেও আমাদের জমিগুলি হাত ছাড়া করেন নাই।

কিন্তু আব্বা শেষ রক্ষা করতে পারেন নাই। যখন আমি প্রফেসরী চাকুরী নিলম , উপরি রোজগারের কোনো চাকুরীর কোশেশ করলাম না, জমাজমি খালাশ করার মতো প্রচুর বাড়তি রোজগারের কোনো পথ ধরলাম না; তখন বেঁচে থাকার গরজেই আব্বা আমাদের কয়েকবিঘা জমি বেঁচে সংসার খরচ মোকাবিলা করতে করতেই একদিন জান্নাতবাসী হয়ে গেলেন। কিন্তু সে ঘটনার আরো পরের।

www.pathagar.com

ইকবাল হল তখন ব্যারাক। ১৯৩৯-৪৫ সনের মুদ্দতে দ্বিতীয় মহাসমরের সময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বহু ভারতবাসী যুবককে এ,আর পিতে রিক্রুট করে তাদের বসবাসের জন্য এজবেষ্টরের চাল, তারাই বাঁশের ফ্রেম এবং বেড়া দিয়ে লম্বা লম্বা ব্যারাক তৈরী করেছিল। ১৯৪৫ সনে মহাযুদ্ধ শেষ হলে এ, আর, পি ভেংগে দিলে ব্যারাক গুলি খালি পড়েছিল। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান পয়দা হলে নতুন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সেই ব্যারাকগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। স্কুল, কলেজ, হোস্টেল, ডিস্পেনসারী ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যারাকগুলি ব্যবহৃত হতো। তেমনিভাবে সারীবদ্ধ অনেকগুলি ব্যারাক নিয়ে গড়ে উঠেছিল ইকবাল হল। ইকবাল হলের পাশেই সুদৃশ্য ইমারতে এস, এম, হল অবস্থিত। রাজবাড়ীর পাশে রাজ গোয়ালের বাড়ী যেমন ছরুতের, এস, এম, হলের পাশে ইকবাল হলের ব্যারাকগুলোও তেমনি ছুরুতের ছিল।

কিন্তু আমরা যারা ইকবাল হলের ছাত্র তাদের মধ্যে এস, এম, হলের জন্য কোনো হায়-আফসোস ছিল না। ইকবাল হলের অধিকাংশ ছাত্রই ছিল চাকুরীজীবি কিংবা কোনো না কোনো পেশা জীবি।

আমি নিজেও ছিলাম সাংবাদিক, আমার সাপ্তাহিক নতুন দিনের চাকুরী খুব একটা অর্থকরী ছিল না। সেজন্য ভাল কোনো সুযোগ সুবিধার তালাশে হামেশা ব্যস্ত ছিলাম। একদিন 'দৈনিক আজাদ' অফিসে প্রবেশ করলাম। বিভিন্ন কামরায় সাইনবোর্ড লেখা। যে কামরায় সম্পাদকের সাইনবোর্ড দেখলাম সেই কামরায় প্রবেশ করে ছালাম দিয়ে দাঁড়ালাম। সম্পাদক সাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বললেন, বসুন; কী মনে করে এসেছেন?

আমি জবাবে বললাম, আমি ইকবাল হলে সীট নিয়েছি। বাংলায় এম, এ, পড়তে চাই; কিন্তু আমার কোনো আর্থিক সংগতি নাই যে এম, এ, পড়ার খরচ চালিয়ে যাবো, আমাকে একটা চাকুরী দিলে আমি এম,এ, পড়ার আশা পূরন করতে পারতাম। আমার কথার মধ্যে কি ছিল আমি বলতে পারবোনা। সম্পাদক সাহেব আমাকে বললেন, বর্তমানে তো কোনো কর্মখালি নাই, তবে এখন থেকে আপনি আমার দুটি ছেলে মেয়েকে পড়াতে থাকুন, আমি আপনাকে মাসিক ৩৫।-টাকা দেবো।

আমি তার জবাবে বললাম, তার সংগে মেহেরবানী করে যদি প্রতি সপ্তাহে একবার আমার একটি কবিতা, গল্প, বা প্রবন্ধ আজাদ সাহিত্য মজলিশে ছাপিয়ে তার অনারারিয়াম বা সম্মানীর ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে আমার এম·এ·পড়তে আর কোনো বেগ পেতে হবে না। সম্পাদক সাহেব বললেন, ঠিক আছে। আপনি কাজ চালিয়েযান।

কেন এত তাড়াতাড়ি আমার আর্থিক সুরাহা হয়ে গেল সেটা আলেমুল গায়েব জানেন। সম্পাদক সাহেব আমার মধ্যে কী পেয়েছিলেন যে, আমার এম· এ· পড়ার পথের বাধা অতি সহজে দূর করে দিয়ে আমাকে প্রতিষ্ঠার পথে তুলে ধরেছিলাম। সেই সম্পাদক সাহেব একজন গ্রেট

www.pathagar.com

ম্যান। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার জগতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আবুলকালাম শামসুদ্দীন সাহেব। আমি তার মেয়ে লতিফা বানুকে পড়াতাম। লতিফার ছোট ভাই বাবুকেও পড়াতাম। পরবর্তীকালে লতিফা বানু কবি প্রাবন্ধিক সাংবাদিক মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্‌র স্ত্রী হিসাবে একটি সুখী সংসার গড়ে তুলেছে বলে শুনেছি।

১৯৫৪ সনের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পাশ হওয়ার পর ২৩মার্চ পাকিস্তান দিবস হিসাবে ঘোষিত হল। সেই সাথে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষিত হল। ১৯৫৪ সনে সাধারন নির্বাচনে হকভাসানী সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট Land slide Victory অর্জন করলো। তৎকালীন পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মাত্র ৩টি আসন বাদে সবগুলি প্রাদেশিক আসন লাভ করলেন। যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী তরুন খোদা নেওয়াজের কাছে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের উজিরে আলা স্বনামধন্য নূরুল আমিন পরাজিত হলেন।

আমরা তরুন ছাত্রগণ ভাসানী সোহরাওয়ার্দী ভক্ত ছিলাম। তারা ক্ষমতা লাভ করায় আমাদের ভক্তি আরো মজবুত হলো। আমরা ধারনা করলাম; একে ত বাংলা ভাষা, রাষ্ট্র ভাষা, তার উপর আবার তৎকালিন্য পূর্ব পাকিস্তানের দন্ড মুন্ডের কর্তাও যুক্তফ্রন্ট সরকার, কাজেই আমরা যদি বাংলায় মাষ্টার ডিগ্রী হাসিল করি, তাহলে আমাদের নছিব কোশাদা হতে বাধা থাকবে না।

সেই ধারনা নিয়ে আমি বাংলায় এম· এ· ক্লাশে ভর্তি হওয়ার জন্য দরখাস্ত দাখিল করলাম, আমাদের ভর্তি পরীক্ষার একটি তারিখ পড়লো। তারিখ মোতাবেক ভর্তি পরীক্ষা দিতে গিয়ে আর সকলে উৎরে গেলেও আমাকে ঠেকিয়ে দেওয়া হল। বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মদ আবদূল হাই আমার ম্যাট্রিক থেকে বি·এ পর্যন্ত সার্টিফিকেট ও টেসটিমোনিয়ালগুলি পরখ করে বললেন, তুমি তো বাংলা পড়ো নাই। হুট্ করে এম·এ· তে বাংলা নিয়ে তুমি তো মোটেই সুবিধা করতে পারবে না। তুমি ইংরেজী বা অন্য কোনো বিষয়ে এম·এ· পড়ো।

আমি জবাবে বললাম , আমি বি·এ·তে দুটো লিটারেচার পড়েছি, একটা ইংরাজী অপরটি আরবী। সেই সাথে কম্পোলসারী বাংলা পড়েছি। কাজেই এম·এ·তে বাংলা নিলে আমার খুব অসুবিধা হওয়ার কথা না। কিন্তু হাই সাহেবের মন কিছুতেই নরম হলো না। আমি একরূপ হতাশ হয়েই ফিরে এলাম ইকবাল হলে।

১৯৫৫ সনের আমলে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে সাপ্তাহিক ছুটি ছিল রবিবার। প্রতি রবিবারেই অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশ পেতো। সে আমলে দৈনিক পত্রিকা ছিল দৈনিক আজাদ , দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ, মাসিক পত্রিকার মধ্যে ছিল মাসিক মোহম্মদী, মাসিক মাহে-নও, মাসিক সওগাত, মাসিক দিলরুবা, সাপ্তাহিক বেগম ইত্যাদি।

www.pathagar.com

আজাদের রবিবাসরীয় সাহিত্য মজলিশে মহাকবি ইকবালের উপর আমার একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। প্রবন্ধটি হাতে করে আমি মুহাম্মদ আবদুল হাই সাহেবের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। সরাসরি তাঁর ড্রয়িং রুমে তাকে পাঠ অবস্থায় দেখে সালাম দিয়ে সামনে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, বসো? তারপর, নিজ থেকেই বললেন, তোমাকে বাংলায় ভর্তি করে নিতে আমার তো কোনো আপত্তির কারন ছিল না। কিন্তু তোমারই অসুবিধা হবে। তুমি এম·এ· এর বিষয়গুলো ফলো করতে পারবে না।

আমি তখন আমতা আমতা করে বললাম, পারবো স্যার। আমি কিছু পড়াশোনা করি।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, আজাদ পত্রিকার সাহিত্য মজলিশ স্যারের সামনের টেবিলে রয়েছে এবং আমার লেখা প্রথম প্রবন্ধটি তাঁর সামনে খোলা আছে। আমি বুদ্ধি করে বললাম, স্যার ! এইযে, আমার প্রবন্ধটি একবার পড়ে দেখেন স্যার।

স্যার আনন্দিত হয়ে আমার দিকে চোখ মেলে তাকালেন এবং বললেন, এটা তোমার লেখা? এই মাত্র আমি এটা পড়ে শেষ করলাম। তুমি তো বেশ গুছিয়ে গুছিয়ে শক্ত কথা লিখে ফেলেছো। তুমি আগামীকাল এসো। তোমাকে ভর্তি করে নেবো।

বাংলায় এম·এ· পড়ার মহা পরীক্ষায় আল্লামা ইকবাল আমাকে উৎড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ আল্লামা ইকবালের উপর লেখা আমার প্রবন্ধটি ভর্তি পরীক্ষায় কামিয়াবী হাসিল করালো। সে সময়ে অধ্যাপক হিসাবে আমরা পেলাম , মুহাম্মদ আবদুল হাই, ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ, ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম, আহম্মদ শরীফ ও অজিত বাবু প্রমুখকে। সে আমলে বাংলায় এম·এ ক্লাশে ছাত্র ছাত্রী মিলে মাত্র ১৮/২০ জন ছিল। তাদের নাম গুলি আমি ভুলে গেছি । মীর সোহরাব, কীর্তনীয়া, হরলাল রায়, কায়কোবাদ, আবুবকর, হামিদা আপা, শওকত আলী প্রমুখের নাম মনে আছে। আমি এম· এ ফাইনাল বর্ষে উঠলাম ২য় স্থান

দখল করে। প্রথম স্থান দখল করলো মরহুম হরলাল রায়। এম·এ ২য় বর্ষে উঠে আমরা ক্লাশমেট হিসাবে পেলাম ফেরদৌস কোরেশী, আসাদুজ্জামান, জহির রায়হান, আবদুল গফফার চৌধুরী ও আবুহেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখকে। শেষোক্ত জন এম·এ·ফাইনাল পরীক্ষা ড্রপ করলো। জহির রায়হান ও গফফার চৌধুরী ডিগ্রী হাসিলের দিকে মনোযোগী না হয়ে গফফার চৌধুরী মাসিক মোহাম্মদীতে সাংবাদিকতায় মশগুল হলেন এবং জহির রায়হান মনোনিবেশ করলেন সিনেমা শিল্পে। ১৯৫৬ সনে এম·এ প্রথম পর্বের ছাত্রাবস্থায় আমার রাজনীতিতে হাতে খড়ি হয়। সে সময় হল ইলেকশনের বেজায় তোড়জোড়। প্রত্যেক হলে মুসলিম লীগ সমর্থিত ছাত্রশক্তি এবং শহীদ ভাসানীর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের দ্বিমুখী লড়াই।

আমাকে ছাত্রলীগ তাদের প্যানেলে সাহিত্য সম্পাদকের পদে ইকবাল হল ছাত্র সংসদের ইলেকশনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করালো। ইলেকশন করার মতো অর্থ কড়ি আমার কিছুই ছিলনা। কিন্তু আমার ক্রেডনশিয়াল অর্থাৎ জীবনবৃত্তান্ত ছিল খুবই শক্তিশালী। দৈনিক আজাদের

www.pathagar.com

সাহিত্য মজলিশ, মাসিক মোহাম্মদীর মত পত্রিকায় আমার রচনা তখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল। ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদকের জন্য সেটা ছিল খুবই ইজ্জতের ব্যাপার। আমাদের প্যানেলের লীডার অর্থাৎ ভি·পি· প্রার্থী জনাব দেওয়ান শফিউল আলম সেটা খুব ভাল ওয়াকিব ছিলেন। আমাদের প্যানেলের আরেকজন এ্যাথলেটিক সেক্রেটারী পদে আকর্ষনীয় প্রার্থী সে আমলের এক নম্বর ক্রিকেট প্লেয়ার ইউসুফ বাবু। আমাদের প্যানেলে আছে প্রকৃত যোগ্য প্রার্থী, যাদের সাথে ভোট লড়াই করার সত্যিকার যোগ্য কোনো প্রার্থী বিপক্ষ দলে নাই।

হল ইলেকশনগুলি বেজায় ব্যয়বহুল ও তকলীফের। কিন্তু আমার কোনো পয়সা পাতি ছিল না। আবার তকলীফ খুব বেশী সহ্য করতে পারতাম না। প্রতিদিন আমাকে দেওয়ান শফি সাহেব নিজে ব্যক্তিগতভাবে এসে ঘুম ভাংগাতেন এবং ক্যানভাসের জন্য সাথে করে নিয়ে যেতেন। প্রত্যেক হলে আবাসিক ও এটাচড বা অনাবাসিক ছাত্ররা ছিল ভোটার। তাদের সংখ্যা হাজারের কম ছিল না। আবাসিক ছাত্রদের চেয়ে অনাবাসিক ছাত্রদের সংখ্যা ছিল বহু গুণ। তাদের ঠিকানা ছিল ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কিন্তু ঠিকানা যেখানেই থাক, সেখানেই আমাদেরকে ক্যানভাস করার জন্য যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। আমাদের ভি·পি· দেওয়ান শফি সাহেব আমাদের সকলকে ভোটারদের কাছে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরতেন।

ভোটারদের বাড়িতে হাটতে হাটতে আমার দুপায়ের তালুতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল, জ্বরও উঠেছিল শরীরে। কিন্তু রেহাই ছিলনা কিছুতেই। একদিন যদি ক্যানভাসে যেতে না চাইতাম, মনে হতো শফি সাহেবের মাথায় আকাশ ভেংগে পড়েছে। কাজেই আমাদের লীডারের মুখের দিকে তাকিয়েই সকল অবস্থাতেই আমরা ক্যানভাস চালু রেখেছিলাম।

তার সুফলও পেয়েছিলাম অশাতীত। ১৯৫৬ সনের ইলেকশনে ছাত্র লীগ সমর্থিত ক্রিকেট প্লেয়ার ইউসুফ বাবু এ্যাথলেটিক সেক্রেটারী পদে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে প্রথম হয়েছিলেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলাম আমি। ভি· পি· দেওয়ান শফিউল আলম সহ আমাদের প্যানেলের অন্য সকলেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু জি·এস· ও এ·জি ·এস পদে ছাত্র শক্তি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন জি·এস· মোহাম্মদ ওয়াজিউল্লাহ এবং এ·জি·এস মোঃ আবদুর রশিদ খান। প্রশংগতঃ উল্লেখ করা ভাল যে, মোঃ আবদুর রশিদ খান টাংগাইলের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ এডভোকেট ও আওয়ামী লীগের একজন প্রবীন নেতা। আরো উল্লেখ্য, ১৯৫৬–৫৭ সনের শফিউল আলমের ক্যাবিনেট আজকের 'জহুরুল হক হলের' সুদৃশ্য ইমারতের নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু করেন।

www.pathagar.com

এই সময়ে আমাদের পাশের এস·এম·হল অর্থাৎ সলিমুল্লাহ মুসীলম হল ছাত্র সংসদের ইলেকশনে ছাত্র লীগ প্রার্থী হিসাবে ভি·পি· হয়েছিলেন তুখোড় ছাত্রনেতা এ·টি·এম· শামসুল হক। তিনি আগের বছরে এস·এম হলের জি·এস·পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরের বছরে ভি·পি·। আবার তিনি এম·এ· ফাইনাল পাশ করে সি·এস·পি পরীক্ষা কৃতিত্বের সংগে পাশ করে প্রথম এস· ডি· ও হয়ে দায়িত্ব পেয়েছিলেন টাংগাইলের। এ সম্পর্কে আরো কিছু ঘটনা আমি যথা সময়ে বয়ান করবো।

এম· এ· প্রথম পর্বে আমি সেকেন্ড হয়ে অস্বস্থিতে ভুগছিলাম। আমি ক্লাশে চিরকালই ছিলাম রেগুলার এবং প্রত্যেক পরীক্ষায় আমার নাম্বার থাকতো সর্বোচ্চ। টিউটোরিয়াল ক্লাশে আমার রচনাগুলি ছিল খুবই মেহনতের ফসল। অধ্যাপক আহমদ শরীফ ছিলেন টিপ্পনী কাটার রাজা।
তিনিও আমার ব্যাপারে বেশ হুশিয়ার ছিলেন। ইউনিভারসিটির ওস্তাদদের মধ্যে আমাকে একটু বেশী পেয়ার করতেন বাংলা বিভাগের হাই সাহেব এবং তার পরেই অধ্যাপক কাজী দীন মোহাম্মদ।

এম·এ· প্রথম পর্বে সেকেন্ড হওয়ার পর থেকেই আমার মনে বদ্ধমূল ধারনা হল যে, ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, তালপাতার সোপাই হয়ে জীবনযুদ্ধে ফতেহ করা সম্ভব নয়। আমি প্রাইভেট টিউশনী করে ও কলম চালিয়ে মাসে যা রোজগার করি, তাতে ইকবাল হলে থাকা–খাওয়া চলে। কিন্তু বই পুস্তক কেনার সামর্থ হয় না। লাইব্রেরীতে বসে বিভিন্ন বই থেকে নোট করে নিয়ে আমি যতই খাতা বোঝাই করিনা কেন, রাত্রিতে হলের সীটে বসে দুচার ঘন্টা বই পড়ার নছিব না হলে,প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় মুখস্ত করে না রাখলে, ফ্রি হ্যান্ডে লিখে ফাষ্ট ক্লাশ পাওয়া সম্ভব হবে না।

এদিকে ১৯৫৮ সনে গুজব শোনা যাচ্ছিল যে, এ বছরে ফাষ্ট ক্লাশ কেউ পাবে বলে মনে হয় না। সেই গুজবে এবং কিছুটা অসুস্থতাবশতঃ আবুহেনা মোস্তফা কামাল আমাদের সাথে এম·এ·ফাইনাল দেওয়া ড্রপ করেছিল। কিন্তু গুজবে আস্থা রাখা আমার ধাতে সয় না। আমি ভাবলাম যে, বই পুস্তক কিনে হলের সীটে দুচার ঘন্টা পড়ে কিছু মুখস্ত করে রাখলে ফাস্ট ক্লাশ পাওয়া কঠিন হওয়ার কথা না।

কিন্তু এম·এ·ক্লাশের বই পুস্তক কিনতে গেলে আমাকে কারো না কারো কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে হবে। এম· এ· ফাইনাল ক্লাশের ছাত্রের জন্য আর্থিক সংগতি হাসিল করতে গেলে সবচেয়ে সহজ উপায় ছিল বিয়ে–করা।

ইতিপূর্বেই আমার বড় ভাই খোদাবক্স আমার কাছে ইকবাল হলের ঠিকানায় দু'খানা চিঠি লিখেছিল, তাতে সে সিরাজগঞ্জের শেখ নইমউদ্দিনের নূরজাহান নাম্নী মেয়ের সাথে আমার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে সেই সাথে আভাষ দিয়েছিল যে, শেখ নঈন উদ্দিন সাহেব কিছু খরচ পত্র দিতেও রাজী আছেন।

www.pathagar.com

চিঠিগুলি আমি পড়ে সুটকেসের তলায় ফেলে রেখেছিলাম। ভাইকে কোনো জবাব দেই নাই। কিন্তু হঠাৎ করেই আমার মাথায় খেয়াল চাপলো যে, ফাষ্ট ক্লাশ আমাকে পেতেই হবে। কাজেই প্রচুর বই কেনা আমার চাই-ই চাই। অতএব বিয়ে করে শশুরের কাছ থেকে টাকা নেওয়া ছাড়া আমার কোনো গত্যন্তর নাই।

সিদ্ধান্তে পৌছামাত্র ভাইয়ের কাছে চিঠি লিখে পাঠালাম ।তাকে জানিয়ে দিলাম, আমি ঢাকা থেকে সোজা রায় দৌলতপুর হাজির হবো। সেখানে থেকে আমরা কয়েকজন মিলে বরযাত্রী হিসাবে সিরাজগঞ্জ যাবো। কাবীন ও বিয়ে শেষ হওয়া মাত্রই আমি ঢাকার পথে পাড়ি জমাবো , শশুর বাড়িতে একদণ্ডও থাকবো না। আমার বই কেনার খরচ যেন বিয়ের পরপরই দিয়ে দেওয়া হয়-এই মর্মে আমার শশুর সাহেবকে জানিয়ে রাখতে হবে।

একই সময় আমি পাবনাতে শাহজাহান তোতা এবং ডাঃ আমিনুল হক কে জানিয়ে দিলাম, তাদেরকে বিশেষভাবে জানালাম, তারা যেন ঠিকঠাক মতো রায় দৌলতপুর গ্রামে হাজির থাকে। সেখান থেকে আমরা বরযাত্রী রূপে সিরাজগঞ্জ যাবো।

আমার যতদূর মনে আছে, আমি বুধবার রাত্রিতে ঢাকা থেকে ঢাকা-খুলনা মেইল ট্রেনে বাড়ির পথে রওনা দিয়েছিলাম। ট্রেন ও জাহাজে রাত্রি কেটে যায়। পর দিন বেলা প্রায় ১০টা নাগাদ সিরাজগঞ্জ শহরে নেমেই আমার হুট করে একটা কথা মনে পড়ে গেল। খাজা মতিয়র রহমান সিদ্দিকী সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় সেনেটারী ইন্সপেক্টরের চাকুরী করে সারা শহরে মশহুর ব্যক্তি হয়েছেন। তিনি রায় দৌলতপুর গ্রামে আমাদের পাশাপাশি বাড়ির লোকই কেবল নন, আমাদের আত্মীয়ও বটে। সম্পর্কে আমাদের ভাই। তারা গ্রামে তালুকদারীর মালিক হিসাবে আমাদেরকে আত্মীয় হিসাবে পরিচয় দিতে চান না, কিন্তু এখন আমি এম·এ· ক্লাশের ছাত্র হিসাবে তাদের কাছে গেলে মতি ভাই ও ভাবী সাহেব বেশ আদরের সাথে কথা বলেন।

সিরাজগঞ্জ সালেহা গার্লস হাই স্কুলের কাছে মতি ভাইয়ের বাসা। ট্রেন থেকে নেমে সরাসরি মতি ভাইয়ের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। মতিভাই বাসাতেই ছিলেন। ভাই ও ভাবী সাহেবকে একত্র পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, নূরজাহানকে তারা চেনে কিনা, নূরজাহান দেখতে কেমন। তারা স্বামী স্ত্রী দুজনেই বললেনঃ নূরজাহান তো আমাদের বুলবুলের (তাদের ৩য় কন্যা) সাথেই ক্লাশ নাইনে পড়ে। সে প্রায় সারা বেলাই আমাদের বাসাতেই থাকে, তুই তাকে দেখবি কি? যদি ওর বাপ তোর পড়ার খরচ দিতে রাজী হয়ে থাকে। তাহলে তুই টাকা পাবি। নূরজাহানের বাপ বেজায় দিল দরিয়া লোক। তুই নিশ্চিন্তে বিয়ে করতে পারিস। নূরজাহার খুব খুব ছুরুত মেয়ে ?

www.pathagar.com

মতি ভাইও ভাবী সাহেবার গাওয়াহী শুনেই আমি বাড়ী চলে গেলাম। সেদিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। পরদিন শুক্রবার আমরা রায়দৌলতপুর থেকে ১১ টার ট্রেনে সিরাজগঞ্জ এসে নামলাম।

শুক্রবার জুম্মার নামাজ বাদে কাজী সাহেব এলেন। তিনি বিয়ের কাবীন ও বিয়ে পড়ানো দুটোই সাড়লেন।

কাবীনের টাকা নিয়ে আমাদের বরযাত্রী পক্ষের সংগে আমার শশুরের কিছু দর কষাকষি লক্ষ্য করলাম। আমি বরবেশে চুপচাপ থেকে শুনছিলাম তাদের কথাবার্তা। অবশেষে আমি মুখ না খুলে পারলাম না। আমি একটু চড়া গলাতেই বললামঃ আপনারা কথা বাড়াচ্ছেন কেন? আমাদের বংশে বউ তালাকের কোনো রেওয়াজ নাই। কাজেই কাবীনের টাকা যা-খুশী উনি লিখে নিল; আমি দস্তখত দিয়ে দিচ্ছি।

আমার কথাতে আমার শশুর সাহেব একদম থেমে গেলেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, ওনাদের কথা মতো, ছয় হাজার টাকারই কাবীন করুন।

কাবীনের পরে শরীয়ত মোতাবেক বিয়ের ব্যবস্থা করা হলো। আমাদের পক্ষে উকিল হলেন ডাঃ আমিনূল হক। তিনি টাংগাইল জেলার মধুপুর উপজেলার বাশিন্দা। সম্প্রতি তিনি মেডিক্যাল সার্ভিস থেকে অবসর লাভ করেছেন, যেমন আমি শিক্ষা সার্ভিস থেকে অবসর লাভ করেছি।

বিয়ের পরে মুসলিম কস্তুমের রেওয়াজ মোতাবেক শুভ দৃষ্টির আড়ম্বরপূর্ন অনুষ্ঠানের আনজাম করা হয়। তাতে বর-কনেকে পাশাপাশি বসিয়ে কনের শাড়ীর আচল বরের আচকানের সাথে বেঁধে রেখে এক বাটি দুধ ভাগাভাগী করে খাওয়ানো দিয়ে শুরু হয় শুভ দৃষ্টির পালা।

আমি এম· এ· ফাইনাল পর্বের ছাত্র, নূরজাহান ক্লাশ নাইনের ছাত্রী। আমাদের বৈবাহিক জিন্দেগীর চেয়ে শিক্ষা-ই মূল লক্ষ্য। সেই দিকে বিবেচনা করে শুভ দৃষ্টির কোনো ব্যবস্থা হলো না। আমি বিষয়টা পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলাম যে বিকাল ৫টায় ঢাকা ট্রেন আমাকে অবশ্যই ধরতে হবে। দেখা গেল, আমার শশুরের দিক থেকেও ওজর আপত্তি নাই।

বিকেল ৫টায় আমার ঢাকা যাওয়ার ট্রেন। উপস্থিত হাজিরাশ মজলিশে আমার শশুর সাহেব আমার হাতে ছয়শত টাকা তুলে দিলেন। আমাদের বিয়ের সেই তারিখটি ছিল ৬-১০-১৯৫৭ ইং সন। সেই ১৯৫৭ সনের আমলে ছয়শত টাকা বর্তমান আমলের ছয়হাজার টাকার কম না এবং ছয়হাজার টাকা ২ লাখ টাকার কম নয়।

ঢাকায় ফিরে এসে যথারীতি শনিবার দিন নির্বিকারভাবে ক্লাশ করতে লাগলাম। আমার রুম মেট বর্তমান টাংগাইলের বিশিষ্ট উকিল মোঃ নূরুল ইসলাম এডভোকেট এবং ডঃএ জলিল- তারা কেউ মালুম করতে পারলো না, আমার জীবনে ইতিমধ্যে কোনো বড় রকমের ঘটনা ঘটে গেছে কিনা।

www.pathagar.com

সেই বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডারের উক্তিঃ গেলাম, দেখলাম, জয় করলাম –এর মতোই গেলাম আর জয় করলাম অর্থাৎ বুধবারে ক্লাশ করে বাড়ি গেছি,শনিবারে ঢাকা ফিরে এসে যথারীতি ক্লাশ করে যাচ্ছি। এতো সংক্ষিপ্ত সময়ে জীবনের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ন ঘটনাটি নীরবে নির্ভৃতে ঘটে যাওয়া কারো কল্পনাতেও ধরা পড়ে নাই।

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের ফাইনাল পরীক্ষার বছরটি সম্পূর্ন আলাদা মেজাজের। অনার্স ক্লাশে ভর্তি হয়েই ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে রোমান্স শুরু হয়। ফাইনাল পরীক্ষার বছর আসার সাথে সাথে সব রোমান্স ফিঁকে হয়ে যায় ।

আমাদের সেই ১৯৫৮ সনের আমলে ঢাকা শহরের বনানী, গুলশান, শেরে বাংলা নগর, বায়তুল মোকাররম, মতিঝিল, ফকিরাপুল, বিজয়নগর, নতুন এয়ার পোর্ট, কমলাপুর রেল ষ্টেশন, রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এগুলো পয়দা হয় নাই। শাহবাগ হোটেল ও নিউমার্কেট ছিল সে আমলের দশনীয় স্থান।

সকল শ্রেনীর রসিক জনেরা বিকালে নিউমার্কেটের গোল চক্করে দশবার ঘুরপাক খেয়ে আনন্দ কুড়াতো।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও নিউমার্কেটের গোলচক্করে ঘুরপাক না খেলে সেদিনটি সার্থক হয়েছে বলে মনে করতে পারতাম না। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার বছরে সেই ঘুরপাক খাওয়ার অভ্যাসটা কমাতে হতো।

আমিও নিউমার্কেটে ঘুরপাক খাওয়া কমাতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু আমার অজান্তেই আমার আর একটি অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। সেটা হচ্ছে আমার সদ্য বিবাহিত অদেখা অজানা বিবি সাহেবার কাছে চিঠি লেখার অভ্যাস।

প্রথম একখানা চিঠি লিখেছিলাম ঃ তোমাকে না দেখেই বিয়ে করেছি। তুমি পেঁচা পেত্নী যা–ই হও না কেন, আমার চিঠির জবাব দিও।

ঢাকা থেকে সিরাজগঞ্জ চিঠি যাতায়াতে সাতদিনের বেশী সময় লাগতো না। কিন্তু পনর দিন পর্যন্ত পথ তাকিয়ে রইলাম, চিঠির কোনো জবাব পেলাম না। তখন আবারও চিঠি লিখলাম প্রথম চিঠির চেয়ে আরো কিছু খোলাসা করে। আরো পনেরো দিন এন্তেজারী চললো। কিন্তু রেজাল্ট সেই আগের মতোই ।।

১৯৫৮ সনে রোজার ছুটিতে সিরাজগঞ্জ শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। আমার শ্বশুর সাহেব আমাকে দেখে বেজায় বেজার হয়েছেন, এটা মালুম করা কঠিন হয় নাই; কিন্তু আমার তখন এমন উতালা অবস্থা যে, শ্বশুর সাহেবের মুখের চেহারা পরখ করে আমার নিজ বাড়ি দৌলতপুর চলে যাওয়ার মতো মনের জোর ছিল না।

আমার শ্বশুর সাহেব আমাকে তৎকালীন চিত্রালী সিনেমা হলের অফিস কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমার শ্বশুরকে প্রায় সবাই শেঠজী বলতো। শেঠজীর মেয়ে জামাই ইউনিভারসিটির এম· এ· ফাইনাল ক্লাশের ছাত্রের কোনোরূপ অযত্ন হয়, এটা কারো পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।

www.pathagar.com

আমার চার পাঁচ বছরের শ্যালক দিলীপ বেশ চালাক চতুর হয়ে উঠেছে। দিলীপ আমার কাছে এসে দুলাভাই দুলাভাই করে ডাকাডাকি করতো এবং বই পুস্তক কাগজ পত্র হাতাহাতি করতো। আমি দিলীপের মুখেই ওর বোন নূরজাহানের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতাম। ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে বেজায় আদর করতাম। ফলে এমন অবস্থা হলো যে, যে-দিলীপ ওর সংগী সাথীদের সাথে খেলা ধুলায় মেতে থেকে ওর আম্মা অর্থাৎ আমার শাশুড়ীর শত ডাকাডাকিতেও ঘরে ফিরে আসতে চাইতো না, সেই দিলীপ আমার কাছ ছাড়া হতো না কখনো।

রমজানের পুরো ছুটিটাই আমাকে চিত্রালী সিনেমা হলের অফিসে কাটাতে হল। আমার শ্বশুর সাহেবের ইয়ার দোস্তেরা আমাদের পক্ষে কিছুটা ওকালতী করে সুবিধা করতে পারে নাই। আমার শ্বশুর সাহেব একরোখা মানুষ। তার মুখে এক কথা। জামাই মেয়ের সামনে তো সারা জীবন পড়ে আছে। কিন্তু লেখাপড়া যদি ফেল মারে, তাহলে তো ওদের সারা জিন্দেগী বরবাদ।

আমি এম·এ ক্লাশের ছাত্র। তাছাড়া বাল্যকাল থেকেই বহু জায়গায় জায়গীর থেকে বহু লোকের সহবত লাভ করে সাধারন ছাত্রদের চেয়ে পরিপক্কতা কিছু বেশী লাভ করেছিলাম। আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমার শ্বশুর সাহেবের দুশ্চিন্তা দেখে তার স্নেহকাতর মনের কাছে আমি হার মেনে গিয়েছিলা।

রমজানের ছুটিটা আমি চিত্রালী সিনেমা হলের অফিস ঘরেই কাটিয়ে ঢাকার পথে পাড়ি জমাবার পূর্বে কয়েকদিন রায়দৌলতপুর গ্রামে আমার বাড়ীতে গিয়ে কাটিয়ে আমার আব্বা-আম্মা ও মুরুব্বিদের দোয়া নিয়ে আবার সিরাজগঞ্জ শহরে ফিরে এলাম। একই ঘরে দুতিন দিন থেকে ঢাকার পথে পাড়ি জমাবো। এই সময়টার মধ্যে আমার বিবি সাহেবা নূরজাহানকে দুচোখে দেখার সুযোগ হয় নাই। আমার মন খুবই উতালা ছিল। দুপুরের খাওয়ার পর ঘুম দিয়ে বিকেলে উঠে মুখ ধুয়ে চা খাচ্ছি। এমন সময় দেখতে পেলাম তিনচার টি মেয়ে আমার বিবি সাহেবাকে জোর করে আমার ঘরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। তাদের ঠেলে আনতে দেখেই বুঝতে পারলাম কোনটি আমার বিবি সাহেবা। তাছাড়া যে তিনটি মেয়ে আমার বিবি সাহেবাকে ঠেলে আনছিল, তারা বেশ স্পষ্ট আওয়াজেই বলাবলি করছিল, যা না ছুড়ি। ইস! লজ্জা দেখো!

তাদেরই একজন আমাকে ইশারা করে বলছিল, আসুন না? ধরে নিয়ে যান।

আমি তখন এমনি বিহবল যে, এক পা এগিয়ে যাওয়ারও হুশ আমার ছিল না। তবে জীবনের প্রথম আমার বিবি সাহেবা নূরজাহানকে দেখে বুঝতে আর অসুবিধা হলো না যে, ওর নামটা মোটেই বেমানান হয় নাই।

সেই একবার দেখেই ঢাকা ফিরে গেলাম। ঢাকা থেকে এবারে আর লিখতে পারলাম না, তুমি ভূতপেত্নী যা-ই হওনা কেন, আমার চিঠির জবাব দিও। এবারে চিঠির ভাষা একদম পাল্টে গেল। আমি লিখলাম, আমার আত্মবিশ্বাস এতই প্রবল যে, আমাকে কেউ ঠকাবে, এমনটা আমি বিশ্বাস করি না, কেননা, আল্লাহ হামেশা আমার

www.pathagar.com

নেখাহবান। সেই জন্যই আমার মতো একটি শ্যামলা ছেলের বিবি হয়েছে জগতের আলো অর্থাৎ নূরজাহান।

১৯৫৮ সনের অটাম ভ্যাকেশন অর্থাৎ শরৎকালীন ছুটিতে পুনরায় সিরাজগঞ্জ যাওয়ার পূর্বে আমি আরো অনেক চিঠি নূরজাহানের নামে পাঠিয়েছি। বলা বাহুল্য কোনোটারই জবাব পাই নাই।

দ্বিতীয়বার আমি সিরাজগঞ্জ গেলে আমার শশুর সাহেব আমাকে বাসার দোকানঘরে থাকার ব্যবস্থা করলেন। আমার শশুরের দোকানঘরটা ছিল রোড সাইডে পশ্চিম দুয়ারী এখন সেখানে একটি চা ষ্টল দেখা যায়। দোকান ঘরটা ছিল এক সময়ের অভিজাত কাপড়ের দোকান; কিন্তু আমার শশুর সাহেব পাটের ব্যবসায় পুঁজি ঘাটাতে গিয়ে কাপড়ের দোকান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমি যখন সেই দোকান ঘরে ছিলাম তখনো সেখানে কাপড় রাখার শো কেসগুলি ছিল গদিও ছিল। সেখানে আমার শশুর সাহেব তার দোস্তদের নিয়ে তাস খেলতেন। আবদুল্লাহ আলমামুন আখতার মিয়া, মতি তালুকদার, নওজেশ আলী উকিল প্রমুখ সিরাজগঞ্জ শহরের তৎকালিন সেরা ব্যক্তিরা আমার শশুর সাহেবের দোস্ত ছিলেন।

এখানে বলে রাখতে হয়, দ্বিতীয় বার আমি যদিও বাসার দোকানেই থাকার জায়গা পেলাম, কিন্তু আমার কাছে নূরজাহানকে আসতে দেওয়া হয় নাই। আমার শশুরের একই কথা যে, আগে ভালভাবে পড়াশোনা শেষ করুক, তারপর ধূমধাম করে বৌভাতের ব্যবস্থা করা হবে।

কিন্তু দ্বিতীয় বার ঢাকা ফেরার আগের দিন আমি নূরজাহানকে পাকড়াও করেছিলাম। তবে মেলামেশা করা শশুর সাহেবের কড়া নিষেধ ছিল বলেই সে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয়বার সিরাজগঞ্জ গেলাম এম· এ· ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরন করার পর। অর্থাৎ মাত্র দেড়মাস পরেই এম·এ· ফাইনাল পরীক্ষা।

আমার শশুর সাহেবকে হয়ত তাঁর দোস্তেরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, এভাবে জামাই ও মেয়েকে মেলামেশা করতে না দিলে ওদের ভাল'র পরিবর্তে মন্দ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। বোধহয় সেই কারনেই ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরন করে চূড়ান্ত প্রিপারেশনের জন্য অবকাশ কালিন সময়ে সিরাজগঞ্জ গেলেও এবারে আমাদের দুজনের জন্য ভিতর বাড়ির একটি ঘর ঠিকঠাক করে দেওয়া হলো।

বিয়ের প্রায় এক বছর পর আমি আমার চির জীবনের সংগীনী নূরজাহানকে কাছে পেলাম। এমন আজব কান্ড ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাখে দু'একজনের জীবনে হয়েছে কিনা, আমার বিস্তর সন্দেহ আছে। সেই ঘরে আমরা একত্র বসবাসের সময় আমি জিগ্‌গেস করে জানতে

www.pathagar.com

পারলাম, আমার এতদিনের লেখা চিঠিগুলি সম্পর্কে ঘূনাক্ষরেও কিছু জানে না নূরজাহান।

আমি এতগুলি চিঠির জবাব না পেয়ে যে, নূরজাহানের উপর বেজায় রাগ করেছি, এইটা মালুম করতে পেরে একদিন নূরজাহান এক বান্ডিল ইনভেলপ এনে আমার সামনে রাখলো। ইনভেলপগুলি আমি ঢাকা থেকে যেভাবে পাঠিয়েছি, সেইভাবেই আছে। সেগুলি খোলার কোনো চিহ্ন নাই।

আমার শ্বশুর শেঠজীর হুকুম। ডাক পিওনের সাধ্যি ছিলনা, তাঁর হাতে ছাড়া বাড়িতে অন্য কারো কাছে চিঠিগুলি ডেলিভারী দেয়। তাজ্জব হয়ে গেলাম আমার শ্বশুর (শেঠজী) সাহেবের কান্ড দেখে। তিনি নিজে লেখাপড়া জানতেন না। কাজেই তাঁর অতি আদরের মেয়ে এবং জামাইয়ের লেখাপড়া যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য তিনি কতোখানি হুশিয়ার নজর রেখেছিলেন, সেকথা ইয়াদ হওয়া মাত্র আমার শ্বশুর সাহেবের রূহের মাগফেরাত কামনায় আমার দুটি চোখে আসুর দরিয়া নেমে আসে।

পরীক্ষার তারিখ ঘনিয়ে এলে নূরজাহানের কাছ থেকে বিদায় হয়ে সিরাজগঞ্জ থেকে ঢাকার পথে পাড়ি জমালাম। ইকবাল হলে পৌছে পড়াশোনার কাজে মশগুল হলাম।

আমি বাংলা ফাষ্ট পার্টে ভর্তি হয়ে ঢাকা ভারসিটির ইকবাল হলের ছাত্র হিসাবে থাকা কালে একটি ঘটনার কথা আমার বেশ ইয়াদ আছে। আমার স্কুল জীবনের সাথী মফিজ ঢাকা ভারসিটিতে ল' পড়তো। সে ছিল হালুয়াকান্দি গ্রামের ডাঃ কোরপ আলী তালুকদার সাহেবের একমাত্র সন্তান হিসাবে খুবই বাবুয়ানায় অভ্যস্ত। ইকবাল হলের ছাত্র হিসাবে ল' পড়তে এসে সেই বাবুয়ানার দরুন তার দোস্তদের কাছে সে বেশ ধার দেনা করে ফেলেছিল। সেই ধার দেনা শোধ দেওয়ার টাকা আনার জন্য মফিজ তার গ্রামের বাড়ী যাওয়ার সময় তার রেলি সাইকেলটি আমার রুমে এনে বললোঃ রহিম ভাই! আমার সাইকেলটি তোমার জিম্মায় রেখে গেলাম। বাড়ী থেকে টাকা পয়সা এনে এখানকার দোস্তাদের ধারদেনা শোধ দিয়ে সাইকেলখানা নিয়ে যাবো।

প্রায় ১০মাস পরে একদিন মফিজ ভাই ইকবাল হলে আমার কাছে এলো। বললো, রহিম ভাই! সব পাওনাদারদের টাকা পয়সা চুকিয়ে দিয়েছি। কাজেই সাইকেল খানা নিয়ে গেলাম। তুমি এবার সিরাজগঞ্জ তোমার শশুর বাড়ি এলে অবশ্য অবশ্যই আমার বাড়িতে আসবে। তোমার শশুর বাড়ির কাছে ইসলামিয়া ইন্টার কলেজের খেলার মাঠের পশ্চিম পাশেই আমি বাড়ী করেছি।

আমার ফুটবল খেলার সাথী হালুয়া কান্দির মফিজ সিরাজগঞ্জ একখানা বাড়ি করেছে, সেটা আমাকে দেখাবার এত আগ্রহ কেন? আমারও একটু কৌতুহল পয়দা হল। ফাইনাল পরীক্ষার জন্য সিরাজগঞ্জ যাওয়া হয়ে উঠলো না।

ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে কাগমারী কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগদান করে মাস খানেকের মত অধ্যাপনা করলাম। ইতিপূর্বে বয়ান করেছি, আমি বি-এ পরীক্ষা দিয়ে একবছর পাবনা জি, সি, ইনষ্টিটিউসনে, জুবিলী স্কুলে শিক্ষক হিসাবে এবং সর্বশেষ আটঘড়িয়া

www.pathagar.com

হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হেড মাষ্টার হিসাবে শিক্ষকতার হাতে খড়ি নিয়েছি। কাজেই কাগমারী কলেজে অধ্যাপনা শুরু দিয়েই প্রথম দিন থেকেই ছাত্র ও অধ্যক্ষ এ· জলিল সাহেবকে মুগ্ধ করার খোশনছিব আমি হাসিল করেছিলাম। সেই জন্য পরবর্তীকালে জলিল সাহেব বিভিন্ন অনুষ্ঠানে Versatile genius বলে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতেন। পরে প্রাইভেটে আমি তার কাছে অনুযোগ করতাম, স্যার। আমাকে শরম দ্যান কেন? জলিল সাহেব জবাবে বলতেন, যার যা গুণ সেটা চাপা দিয়ে রাখার অর্থ সেই লোকটাকে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ করা। আমি তা করতে যাবো কেন?

জলিল সাহেবের কথা শুনে আর কোনো রা করতে পারতাম না। মাথা নীচু করে নীরবে ভাবতাম, আল্লাহ! তুমি জলিল সাহেবের দেওয়া Versatile genius পরিচয়ের যোগ্যতা আমাকে মনজুর করো।

যাহোক, কাগমারী থেকে বোধকরি রমযানের ছুটিতে সিরাজগঞ্জ গেলাম। শশুর বাড়ীতেই দেখতে পেলাম আমার শশুরের সাথে বেজায় খাতির জমিয়ে নিয়েছে মফিজ ভাই। আমিও একদিন তার বাড়িতে গেলাম। সেটা বাড়ি না; সেটা আলীসান বিল্ডিংস। মোজাইক করা মেঝে। শাল মেহগিনির জানালা দরোজা। দামীদামী সোফাসেট শোকেস। মফিস সব আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো এবং বয়ান করতে থাকলো,তার এত তাড়াতাড়ি আলাদীনের চেরাগ লাভ করার কেচ্ছা।

কেচ্ছা খুব বড় কিছু নয়। তকদিরই বড়। ইকবাল হল থেকে এসে মফিজ ভাই তার মায়ের কাছ থেকে মাত্র পাঁচ হাজার টাকার পুঁজি নিয়ে রংপুরে তাঁর রেলওয়ে গার্ড ভগিনীপতির আশ্রয়ে থেকে কন্ট্রাকটরী ও সাপ্লাইয়ের কাজ করেছে। মাত্র দশ এগার মাসের মধ্যেই লাখ দুই টাকা কামাই করে তার শশুরবাড়ির লাগোয়া এই জমিটা কিনে এখানে প্রায় ২৮শত বর্গফুটের একটি আলীশান ইমারত নির্মান করেছে। সেই ৫৭-৫৮ সনের মুদ্দতে ৬০ হাজার টাকা এখনকার তিন কোটি টাকার সমান। প্রায় ৬০ হাজার টাকা খরচ করে মফিজ ভাই মোজাইক করা একটি বাড়ি করেছে। তাছাড়া কন্ট্রাকটারী ছেড়ে দিয়ে নর্দার্ন ফ্লাওয়ার মিল্‌স গড়ে তুলেছে ইলিয়ট ব্রীজের কাছে।

এখানে কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী সরকারী কলেজের ১৯৯০-৯১ সনের বার্ষিক কলেজ ম্যাগাজিন ''মমাক'' এ আমার লেখা ''মওলানা ভাসানী ও আমরা ক'জন" শীর্ষক মূল প্রবন্ধটি পাঠকের খেদমতে পেশ করছি ঃ

ইছায়ী ১৯৫৮ সনের কথা।

আগষ্ট মাসে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম, এ, ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছি। আমরা তখন ইকবাল হলের ছাত্র। ইকবার হলটি তখন অনেক গুলি ব্যারাক সমন্বয়ে গঠিত। আমি তখন ইকবাল হলের ছাত্র স ংসদের সাহিত্য সম্পাদক। আমাদের ভি, পি, ছিলেন

www.pathagar.com

দেওয়ান শফিউল আলম এবং জি, এস, ছিলেন মোঃ ওয়াজিউল্লাহ, এ, জি, এস ছিলেন বর্তমানে টাংগাইল বারের স্বনাম খ্যাত উকিল আবদুর রশিদ খান । বর্তমানে ইকবাল হলের যে চোখ জুড়ানো ইমারত, সেটা আমাদের সেই ১৯৫৬-৫৭ সনের ছাত্র সংসদের আমলেই শুরু দেওয়া হয়েছিল। তখন ইকবাল হলের প্রভোষ্ট ছিলেন ডক্টর মফিজ উদ্দীন আহমদ এবং হাউস টিউটর ছিলেন স্বনামখ্যাত নাট্যকার আশকার ইব্‌নে শাইখ ওরফে জনাব মোঃ ওবায়দুল্লাহ্।

ইকবাল হলের ঢাকাস্থ ক্যান্টিনে মীর আবুল হোসেন (ঢাকাস্থ শহীদ সোহরাওয়াদী কলেজের সম্প্রতি অবসর প্রাপ্ত ভাইস-প্রিন্সিপাল) সাহেবের সাথে নাস্তা করতে বসে আমি আফসোস করে বলেছিলাম "বড় ভাই! আমার ক্লাশমেটদের মধ্যে মাহমুদশাহ কোরায়শী (পরিচালক, বাঙলা একাডেমী), শওকত আলী (প্রখ্যাত কথাশিল্পী), মোঃ আসাদুজ্জামান খান (অধ্যক্ষ সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, করটিয়া), মীর সোহরাব আলী (বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, করটিয়া) মোঃ কায়কোবাদ, আবু বকর সিদ্দিকী প্রমুখ এম,এ, ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই অধ্যাপক পদে নিয়োগ পত্র পেয়েছে বলে শুনতে পেলাম,অথচ আমার নছিবে কিছুই জুটলোনা। আমার আফসোস শুনে মীর সাহেব বললেন, "আপনি কাগমারী কলেজে দরখাস্ত করতে পারেন। কয়েকদিন আগে কাগমারী কলেজের বিজ্ঞাপন দেখেছি।"

১৯৫৮ সনে কাগমারী সন্তোষ বৃহত্তর মোমেনশাহী জেলার অন্তর্গত ছিল। আমি সেই কাগমারীর উদ্দেশ্যে একখানা পোষ্টকার্ড লিখে পাঠালাম। পোষ্ট কার্ড খানা লিখলাম প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে, তাতে আমি বাংলার অধ্যাপক পদে দরখাস্ত দাখিলের এরাদা জাহির করলাম এবং অধ্যক্ষ সাহেবের বিশেষ অবগতির জন্য বয়ান করলাম যে, আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ১ম পর্বের পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করেছি; কাজেই এম,এ, ফাইনাল পরীক্ষায় আমি নির্দেশ পক্ষে হাইয়ার সেকেন্ড ক্লাশ পাবো। কাজেই আমাকে দরখাস্ত পেশ করার সুযোগ দিলে আমি বিশেষ সরফরাজ হবো-একথা জহির করে আমি পোষ্ট কার্ড শেষ করে ছিলাম।

সপ্তাহ না ঘুরতেই আমি কাগমারী কলেজের অধ্যক্ষ এ, জলিল এম-এ, (ডবল) সাহেবের জবাব পেলাম। তিনি আমার পরীক্ষার পর সরাসরি কলেজে যোগদান করার তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখেছেন; দরখাস্ত পাঠাবার ফর্মালিটি নিয়ে পেরেশান হওয়ার কিছুই নাই; সে সব ফর্মালিটি কলেজে হাজির হয়েই করা যাবে বলে তিনি চিঠিতে বয়ান করেছেন।

www.pathagar.com

আমি সেই অপ্রত্যাশিত চিঠি পেয়ে আল্লাহ্‌র অপার রহতের বিষয় ভেবে আল্লাহ্‌র কাছে হাজার শোকর গোজার করলাম। বিষয়টি সবার আগে আমার পরম হিতৈষী মীর আবুল হোসেনের কাছে জাহির করলাম ; তার পর পরীক্ষা কেন্দ্রে হাজির হয়ে মীর সোহরাব আলীকেও খবরটা জানালাম। আমার একটা হিল্লা হয়েছে দেখে আল্লাহর কাছে তারাও শুকরিয়া জাহির করেছিলেন।

এম-এ পরীক্ষায় শরীক হওয়ার মধ্যেই আমি এক ফাঁকে কাগমারী কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবকে একটি পথ- নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য একখানা অনুরোধ পত্র লিখলাম। আমি জানালাম, আমি কখনো কাগমারী যাই নাই, পথঘাট চিনি না ; আমি যাতে সহজেই কাগমারী হাজির হতে পারি, সে জন্যে আমাকে একটা পথ নির্দেশিকা পাঠিয়ে দিলে আমি শুকরিয়া জাহির করবো।

আমার সেই চিঠির জবাবে জলিল সাহেব স্বহস্তে একটি ম্যাপ তৈরী করে ঢাকা থেকে কাগমারী পৌছার পথ নির্দেশিকা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই পথ নির্দেশিকা পকেটে পুরে আমাদের এম-এ, ফাইনাল পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা শেষ করলাম। ২৫শে আগষ্ট ভোর বেলাতেই ইকবাল হলের সীট ছেড়ে কাগমারীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

১৯৫৮ সনের আগষ্ট মাসে সমগ্র বাংলাদেশ থৈ থৈ বর্ষার পানিতে ভাসছিল। ঢাকা থেকে যে বাসে টাংগাইলের পথে আসছিলাম সে বাসটি কালিয়াকৈর ছাড়বার পর মাঝ মাঝেই পানির মধ্যে ছপ ছপ করে এগিয়ে আসছিল। মির্জাপুর ছাড়বার পর সড়ক পথের উপর পানির পরিমান ক্রমেই বেড়ে চলছিল। কোন কোন স্থানে পানিতে বাসের পা'দানি তলিয়ে যাচ্ছিল।

সেই অবস্থার মধ্যে বেলা নাগাদ তিনটার মধ্যে আমি টাংগাইল হাজির হয়েছিলাম। টাংগাইল শহরটির মধ্যে সবগুলি পথ-ঘাটই পানির তলে চলে গিয়েছিল। একমাত্র বর্তমান ঘ্যাগের দালানের কাছের পুলটার দুপাশে খানিকটা এলাকা ছিল। সেখানেই প্রতিদিন বাজার বসতো।

আমি ঘ্যাগের দালানের পুল পার হয়ে পশ্চিম দিকে আরফান খান কোং এবং খাদ্য বিভাগের গুদাম ঘরের কাছে লৌহজং নদীর ঘাটে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে বহু কেরায়া নৌকা লোকজন পারাপার করছিল। আমি সেই সব কেরায়া নৌকার একটিতে উঠে বসলাম।

কেরায়া নৌকার মাঝির বয়স চল্লিশের উপরে। তার সাথে একটি সাত আট বছরের ছেলে। তারা জাতিতে মুসলমান। বাপ-বেটা ঐ কেরায়া নৌকার ভাড়ার পয়সায়

www.pathagar.com

সংসার চালায়। আমি মাঝিকে বললাম, ভাই! কাগমারী কখনো যাই নাই। জায়গাটির ঠিকানা চিনি না। আমাকে ঠিকমতো পৌছে দিতে না পারলে আমাকে তোমার বাড়িতেই আজ রাত অতিথি রাখতে হবে। আমার হাত এতো শূন্য যে তোমার ভাড়ার পয়সাও আমি দিতে পারবো না।

মাঝি আমাকে পুছ্ করলোঃ আপনি কাগমারীতে যাইবেন কার কাছে? আমি জবাব দিলাম আমি কাগমারী কলেজের চাকুরীতে যোগ দিতে যাচ্ছি।

মাঝি বললো, তা হুজুর ভাসানী সাহেবের কলেজে চাকুরী করতে যাইতাছেন? আপনে ভাড়ার পয়সা না দিতে পারেন, না দিবেন। তাতে কি! আমরা ভাসানী হুজুরের মুরীদ। ভাসানী হুজুরের দোয়াই আমাদের জন্য মেলা কিছু।

আমি গরীব মানুষটির মধ্যে শুধু ভাসানী হুজুরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা দেখেই মুগ্ধ হলাম না, বরং ভাসানী হুজুরের প্রতি এই গরীব লোকটির মধ্যেও যে ত্যাগের সদিচ্ছা দেখলাম সেটা অনেক ধনবান ব্যক্তির মধ্যেও দেখি নাই।

বেলা আছরের ওয়াক্তে আমি কাগমারী কলেজ অফিসের সামনে নামলাম। অফিসটি হজরত শাহজামানের মাজারের পাশেই অবস্থিত। অফিসে একজন পিওন সহ প্রিন্সিপাল জলিল সাহেব অপেক্ষা করছিলেন। ইতিপুর্বেই আমি ২৫শে আগষ্ট কাগমারীর পথে ঢাকা ত্যাগ করার এরাদা জাহির করে প্রিন্সিপাল জলিল সাহেবের কাছে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। সেই চিঠি মোতাবেক জলিল সাহেব কাগমারী কলেজে আমার হাজিরার জন্য এন্তেজার করছিলেন।

আমি কাগমারীতে হাজির হয়ে কেরায়া নৌকার ভাড়া দেওয়ার জন্য জলিল সাহেবকে অনুরোধ করলাম। জলিল সাহেব মাঝিকে বললেন, তোমার ভাড়ার জন্য ভাবতে হবেনা। তোমার ভাড়া কলেজ থেকে দেবো। তুমি আমাদেরকে সন্তোষে হুজুরের কাছে নিয়ে চলো।

অতঃপর আমরা কলেজ অফিস বন্ধ করে সন্তোষের পথে পুনরায় নৌকা ভাসালাম। চারিদিকে থৈ থৈ করা পানি। কাগমারী থেকে সন্তোষ বরাবর যে খালটি, তার দু'পাড় পানিতে তলিয়ে একাকার হয়ে গেছে। স্রোতও প্রবল। মাঝি সেই কড়া স্রোতের মধ্যে লগি ঠেলে তার নৌকা নিয়ে সন্তোষের ঘাটে ভিড়ালো। আমরা কেরায়া নৌকা থেকে নেমে পড়লাম।

প্রিন্সিপাল জলিল সাহেব বললেন, চলুন! রহিম সাহেব! ভাসানী হুজুরের সাথে আগে মোলাকাত করি। তিনিই আমাদের আসল মুরুব্বি। আমি বিসমিল্লাহ বলে ভাসানী হুজুরের নজদিকে হাজির হওয়ার জন্য হাটা দিলাম। সামনেই একখানা ছোনের ঘর।

www.pathagar.com

সেই ছোনের ঘরের মধ্যে কাঁথা বিছানো। একটা চৌকিতে হুজুর ভাসানী সাহেব শুয়ে ছিলেন। প্রথমে জলিল সাহেব এবং পরে আমি ভাসানী হুজুরের কদমবুচি করলে তিনি চৌকির উপরে উঠে বসলেন।

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, নাম কি, বাড়ী কোথায়। আমি আমার নাম ও আমার গ্রামের নাম বললেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাপের নাম কি। আমার বাপের নাম বললাম, মুন্সি মোহাম্মদ নূরবক্স খোন্দকার। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার দাদার নাম কি।

আমি জবাব দিলাম ঃ আমার দাদার নাম মরহুম মুন্সি মওলা বক্স খোন্দকার ।

মওলানা সাহেব তখন প্রশ্ন রাখলেন, তোমাদের বাড়ী কি রায় দৌলত পুর গ্রামের উত্তর পাড়া তালগাছওয়ালা বাড়ী। আমি জবাব দিলাম, জি হুজুর।

তখন সামনেই দাঁড়ানো কালু ফকিরকে লক্ষ্য করে ভাসানী হুজুর বললেন, কালু! রহিম তো আমাদের আত্মীয় হয়। ওর জন্য প্রফেসরগোরে মেসে একটা ভাল রুম ঠিকঠাক কইরা দ্যাওগা।

কালু ফকির অতীব তাজিমের সাথে জবাব দিলেন! জি হুজুর। তার পর আমাকে ও জলিল সাহেবকে লক্ষ্য করে কালু ফকির বললেন, স্যার! আসেন আপনেরা ?

আমরা কালু ফকিরের সাথে সাথে হাটা দিলাম। সন্তোষ জমিদার বাড়ীর পাঁচ আনী তরফের সিংহ দরোজা তখনো বিদ্যমান। বিশাল লোহার গেট হা করা। আমরা সেই গেট পার হয়ে পাঁচ আনী জমিদার বাড়ীর অন্দর মহলের পুকুর পাড়ে পুবে পশ্চিমে লম্বা বর্তমানে বালিকা হাই স্কুলের টিনের ঘরের বারান্দায় হাজির হলাম । কালু ফকির চাবি দিয়ে পুবের একটি রুমের দরোজা খুলে আমার বেডিং পত্র সেই রুমের মধ্যে তুললেন। তার ভিতরে একটি চৌকি ঝেরে মুছে ছাফ করে জায়গা মত বসিয়ে দিলেন। তার পর প্রিন্সিপাল জলিল সাহেব এবং কালু ফকির দুজনেই আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

খানিক পরেই সেই মেসের দুই রুম থেকে দু'জন অধ্যাপক এলেন আমার পরিচয় নিয়ে আমার সাথে জান পহ্ছান করতে। তাদের মধ্যে একজন অধ্যাপক হচ্ছেন আব্দুল মতিন সরকার। তিনি দর্শন শাস্ত্রে ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট। অপর জন হচ্ছে ননী গোপাল দত্ত। অংকের অধ্যাপক। খানিক পরে এলেন পাশের বাসা থেকে একজন অধ্যাপক, তার নাম হচ্ছে এ, বি, এম, আব্দুল মোতালেব। তিনি রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

www.pathagar.com

প্রথম কিছুদিন আমরা চারজন অধ্যাপক মিলে কাগমারী কলেজ এবং সন্তোষ মেস গুলজার করে কাটালাম। কিছুদিন পরে এলেন ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক মোঃ মিজানুররহমান।

সন্তোষ জমিদার বাড়ীর সেই মেস জীবনকে কেন্দ্র করেই আমি আমার প্রথম উপন্যাস 'পলাশ ডাঙার উপকথা' রচনা করেছি। আমার সহকর্মি অধ্যাপক আব্দুল মতিন সরকার আট নয় বছরের একটি মেয়ের কাছ থেকে দুধ রোজ নিতো। মেয়েটার প্রতি মতিন সাহেবের বেজায় দরদ পয়দা হয়েছিল। আমি নিজেও সেটা উপলব্দি করতে পারতাম। আমার সেই উপলব্দিটাই একটা কাহিনীতে রূপলাভ করেছে। পলাশ ডাঙার উপকথা আমার প্রথম উপন্যাস হলেও, যেহেতু তার কাহিনীতে কিছু বাস্তবতার স্পর্শ ছিল, সেইহেতু আমার অন্যান্য পাকা হাতের সৃষ্টির চেয়েও এইটি পাঠকের দরদ পেয়েছে বেশী। তাছাড়া আমি সর্ব প্রথম মুসলিম সমাজে তাঁতি,কলু, গারস্ত ইত্যাদি আশরাফ আতরাফ বা কুলিন-অকুলিন সমস্যার উপর তীব্র কষাঘাত হেনে উপন্যাসটি পয়দা করেছি। এতোটা খোলাখুলি ভাবে মুসলিম সমাজের এই আশরাফ আতরাফ সমাস্যাগুলির উপর কেহই আলোকপাত করেন নাই।

সন্তোষ জমিদার বাড়ীর মেসে আমার মাস দেড়েকের বেশী কাটাতে হয় নাই। কেননা, কাগমারী কলেজের চাকুরীতে বহাল হওয়ার পর ছালাম কদমবুচি করার উছিলায় আমি যখনই হুজুর ভাসানী সাহেবের সামনে গিয়েছি, তখনি তিনি আমার আরো কিছু পরিচয় জেনে নিয়েছেন। আমি যে এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার আগেই সিরাজ গঞ্জ শহরে শেখ নইম উদ্দিন সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করেছি, এটা হুজুর ভাসানী সাহেব ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন। একদিন আমি হুজুর ভাসানী সাহেবের কাছে বসে থেকে তাঁর মুখের কথাবার্তা নীরবে শুনে যাচ্ছিলাম, এমন সময় মোয়াজ্জেম হোসেন নামক এক ব্যক্তি এসে তাঁর কদম বুচি করে অদুরে দাঁড়িয়ে রইলো।

হুজুর মোয়াজ্জেম হোসেনকে দেখেই বলে উঠলেন, মোয়াজ্জেম! তোমার পূর্ব আদালত পাড়ার বাসায় একটা আলাদা বৈঠক খানা ও আলাদা পাক ঘর তুইলা রহিমের জন্য বাসা কইরা দাও। প্রথম প্রথম বিশ টাকা কইরা ভাড়াপাইবা।

হুজুর ভাসানীকে মোয়াজ্জেম হোসেন "আববা" করে ডাকতেন। তিনি হুজুরের কাছেই বাল্যকালে মানুষ হয়েছেন। অনেকেই মোয়াজ্জেমকে হুজুরের পালিত পুত্র বলে মনে করতো। মোয়াজ্জেম বিশেষ তাজীমের সাথে জবাব দিয়েছিল, আচ্ছা আববা! আমি সাত দিনের মধ্যেই টিনের ঘর কিনা রহিম সাহেবের থাকার ব্যবস্থা কইরা দিমু।

www.pathagar.com

হুজুর ভাসানী সাহেব টাংগাইল শহরে আমার বাসার ব্যবস্থা ও করে দিলেন ; সে বাসার ভাড়াটাও তিনিই ঠিক করে দিলেন। আমার সে জন্য কোনো তকলীফই স্বীকার করতেহলোনা।

পনর দিন পর মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে সিরাজ গঞ্জ থেকে সপরিবার তাঁর বাসায় উঠার জন্য খবর দিয়ে গেলেন। আমি সিরাজগঞ্জ গিয়ে আমার স্ত্রী নুরজাহানকে নিয়ে টাংগাইল শহরে পূর্ব আদালত পাড়া ডাঃ এইচ, আর, খানের বর্তমান বাসার পার্শে মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় এসে উঠলাম। সিরাজ গঞ্জ থেকে সাথে নিয়ে এলাম একটি চামড়ার সুটকেস, একটা তোষকও দুইটা বালিশ। আমার অন্য কোনো মাল সামান আসবাব পত্র ছিলনা। আমার স্ত্রীর কানে একজোড়া মাকড়ি এবং তার পরনে একটা কমদামের শাড়ী ব্যতীত দ্বিতীয় কাপড় ছিলনা। তখন আমার মাসিক বেতন ছিল সর্ব সাকুল্যে ২০৫/০০টাকা মাত্র। তার মধ্যে ২০/০০টাকা বাসা ভাড়া দিয়ে এবং ১৮/০০ টাকা মনের আধা মন চাউল কিনে সারা মাস দিব্বি আরামে কাটিয়ে দিয়েছি। তখন দিনে পাঁচবার বাজারে এসেছি। কেননা, আমার স্ত্রী নুরজাহান বেগম সংসারের কিছুই জানতোনা ; রান্না উঠিয়ে দেওয়ার পর তার হুশ হত যে, সরিষার তেল তো নাই। তখনি ছয় আনী বাজারে ছুটতাম তেল কেনার জন্যে। খানিক পরেই তার মনে পড়ে যেতো, জিরা তো ঘরে এক দানাও নেই। অমনি ছুটতাম ছয় আনী বাজারে জিরা আনার জন্যে।

স্ত্রীর কথা অনুসারে দিনের মধ্যে পাঁচ বার ছয় আনী বাজারে আসা যাওয়া করেছি। তবুও কখনো তার উপরে রাগ করি নাই। কেননা আমার স্ত্রীর প্রতি আমার ভালবাসা ছিল নিখাদও গভীর। তার ভুলত্রুটি নিয়ে রাগারাগি করার পরিবর্তে তার হুকুম মতো কাজ করতেই তখন বেশী আনন্দ পেয়েছি। বাসা থেকে ছয় আনী বাজার মাত্র ২/৩ মিনিটের পথ। একবার গেছি আবার এসেছি, আবারও গেছি,আবারও এসেছি, তাতে কেউ কখনো ঠাট্টা মস্কারা করতে ও আসে নাই।

সে সময় মোয়াজ্জেম সাহেবের মেয়ে সুফিয়া কোলের মেয়ে। আমরা স্বামী স্ত্রী মাত্র দুটি প্রাণী। মোয়াজ্জেম সাহেব তার নিজের বসবাসের ঘরখানার মাঝখানে পার্টিশন দিয়ে আলাদা করলেও ছোট দুটি ফ্যামিলী কোলের মেয়ে সুফিয়াকে নিয়ে দিনগুলি সুখে আনন্দেই কাটিয়ে দিয়েছি। সুফিয়ার আম্মা আমার স্ত্রী নূরজাহানকে আপন মায়ের পেটের ছোট বোনের মতো স্নেহ করতেন। আমি তাকে আপা বলে ডাক্‌তাম। সে আপা ছিলেন সত্যিকার আপার মতোই। তাঁর স্নেহ মমতায় কোনো খাদ ছিলনা। আমি ও মোয়াজ্জেম ছিলাম যেন একই মায়ের দুটি সন্তান। মোয়াজ্জেম ভাইয়ের সেই মেয়ে

www.pathagar.com

সুফিয়া এখন আমার একজন প্রিয় ছাত্র মিয়া মোহাম্মদ আবুল কাশেমের স্ত্রী। আবুল কাশেম এই গ্রন্থ রচনা কালে (১৯৯২ ইং) আমার জন্মস্থান সিরাজগঞ্জ জেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমাদের সুখ বেশী দিন সইলনা। ১৯৫৮ সনের ২৮শে অক্টোবর ফিল্ড মার্শাল আইউব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে গদি থেকে নামিয়ে লন্ডনে নির্বাসিত জীবনে পাঠিয়ে দিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়ে বসলেন। তিনি তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বহু নেতাকে গেরেফ্তার করে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে আমাদের মাথার উপরকার বটগাছ হুজুর ভাসানী সাহেবকে গেরেফতার করে ঢাকার ধানন্ডীর এক বাসায় অন্তরীন করে রাখলেন।

নছিব ভাল যে গেরেফতার হওয়ার আগেই হুজুর ভাসানী সাহেব কাগমারী কলেজের কোষাধ্যক্ষ মরহুম মোঃ শমশের আলী (পৌর চেয়ারম্যান মোঃ শামসুল হকের পিতা) সাহেবকে অছিয়ত করে বলেছিলেন ঃ শমশের শোনো ? রহিমের জন্য মাসিক বেতন বাবদ যা লাগে তোমার নিজের ক্যাশ থিকা দিবা; অন্যান্য প্রফেসরদের বেতন বাকী পড়লেও তারা কোনো রকমে চালায়া নিতে পারবে ; কিন্তু রহিমের পক্ষে এই বিদেশে সংসার চালানো কঠিন। হুজুর ভাসানী সাহেবের সেই অছিয়ত মোতাবেক আমার মাসিক বেতন শমশের হাজী ও কলেজের অধ্যক্ষ জনাব এ, জলিল সাহেবদ্বয় ধারে কর্জে চালিয়ে যেতেন।

তবুও দীর্ঘ দিন হুজুর ভাসানী সাহেবের অনুপস্থিতির ফলে কলেজের দুর্দিন বেড়েই চললো। বছরে প্রায় দশ মাস বেতন বাকী পড়ে যেতো! অবশ্য আমার দশ মাসের পুরো বেতন বাকী পড়তে দেওয়া হয় নাই। সকলেই আমার প্রতি ছিলেন দারাজ দিল্।

এ সময় কলেজে আমার উপরে বোঝাও চেপেছিল গুরুভার। আমার সহকর্মীদের মধ্যে ননী গোপাল দত্ত মোঃ আবদুল মতিন সরকার ও এ বি এম আবদুল মোতালেব প্রমুখ ভাল ভাল সুযোগ পেয়ে কাগমারী কলেজ ছেড়ে চলে গেলেন। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য আমি একাই পৌর বিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস, লজিক এবং ইংরাজীর ক্লাশ নিতাম। তার উপরে আমার নিজের বাংলার ক্লাশ তো ছিলই। অধ্যক্ষ জলিল সাহেব ছিলেন রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও ইংরাজীতে এম-এ, এবং আমি ছিলাম বাংলায় এম-এ। আমরা দুজনে মিলে প্রায় সবগুলি ক্লাশই চালিয়ে যেতাম। কিন্তু সেভাবে তো কলেজের সরকারী অনুমোদন রক্ষা করা যায় না। সে জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপক নিয়োগ করা ছাড়া উপায় নাই।

www.pathagar.com

কিন্তু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হুজুর ভাসানী সাহেব তখন আইয়ুব খানের দ্বারা অন্তরীনাবদ্ধ। কলেজের তহবিল যোগাড় করতে হলে হুজুর ভাসানী সাহেব ছাড়া কারো ক্ষমতা নাই। হুজুর ভাসানী সাহেবের কাছে পরিস্থিতি ভালভাবে বয়ান করার জন্য নিজাম উদ্দিন আহম্মদ, শমশের আলী সরকার এবং আমি সরকারের পারমিশন যোগাড় করে ঢাকার ধানমন্ডীতে অন্তরীনাবদ্ধ হুজুর ভাসানী সাহেবের নজদিকে হাজির হলাম। হুজুর সব কথা শুনে আমাকে বাংলায় একটা দরখাস্তের মুসাবিদা তৈরী করে দিলেন এবং সেটা ভালভাবে ইংরাজীতে অনুবাদের পর টাইপ করে তাঁর দস্তখতের জন্য পুনরায় তাঁর কাছে হাজির হতে বললেন। তিনি সেই মুসাবিদার মধ্যে প্রকাশ করলেন, তিনি সন্তোষ কাগমারী ও মহীপুরে ষোল সতরটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করে এসেছেন। তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করলেন কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ, পীর শাহজামান প্রাইমারী স্কুল, সন্তোষে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ম্যাটার্নিটি হাসপাতাল এবং মহীপুরের হাজী মহসিন কলেজ প্রভৃতির কথা। এবং ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের যাতে কোনরূপ ক্ষতি না হয়, সেই দাবীউল্লেখকরলেন।

আমাদের অধ্যক্ষ জলিল সাহেব ইংরাজীতে ৩য় শ্রেনীর মাষ্টার ডিগ্রী হাসিল করলেও তিনি ইংরাজী বোলচাল ও মুসাবিদায় ছিলেন তুখোড় ব্যক্তি। তিনি হুজুরের বাংলা মুসাবিদা করা চিঠির ইংরেজী অনুবাদ করে দিলেন। আমি নিজে সেটা খসড়া করে টাইপ করিয়ে নিয়ে হুজুর ভাসানী সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি বললেন, রহিম, পড়োতো কী ইংরেজী লিখেছো ? আমি পড়ে গেলাম। হুজুর চুপচাপ শুনে গেলেন। চিঠিটা প্রায় শেষ। আমি পড়েছি I, therefore, solicit the fovour of your kindly granting a lump of কিন্তু বাক্যটা শেষ করার আগেই হুজুর চেতে উঠলেন, কী বললে! আমি কি আইউব খানের চাকরী করি? সে আমাকে favour করার কে? ঘুরিয়ে লেখ; you are requested to sanction a lump of Taka যাও পুনরায় ভাল করে টাইপ করে নিয়ে আসো গা।

আমি মাথা নীচু করে হুজুরের সম্মুখ থেকে বেরিয়ে এলাম। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লে যা হয়, আমার অবস্থা ছিল তাই। তারপর পুনরায় কাগমারীতে ফিরে এসে কলেজের প্যাড নিয়ে সম্পূর্ন নতুন ভাবে ইংরাজী দরখাস্ত তৈরী করে হুজুরের দস্তখতের জন্য পাঠিয়ে দিলাম।

www.pathagar.com

সেই দরখাস্তের পরে আইউব সরকার কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজে স্পেশাল মিলিটারী টীম পাঠালেন ; তারপর ২৭ হাজার টাকার একটি বরাদ্দ মঞ্জুর করলেন। আমরা কলেজের দুর্দিন থেকে এহছানী লাভ করলাম।

ইতিমধ্যে ৪৪ মাস অন্তরীনাবদ্ধ জীবন শেষ করে হুজুর ভাসানী সাহেব সন্তোষে ফিরে এলেন। আমরা তার কদমবুচি করে তার খেদমতে হাজির থাকলাম। কিছু দিন পর কলেজে তিন লাখ টাকার একটি চেক এসে হাজির। চেকটি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নামে ক্রস করা। জলিল সাহেব চেক সহ আমাকে নিয়ে হুজুর ভাসানী সাহেবের সামনে হাজির হলেন। চেকটি তাঁর হাতে দিয়ে জলিল সাহেব চুপ করেরইলেন।

আমি কল্পনাও করতে পারি নাই যে, এর পিছনে এতটা রহস্য আছে। আমি তিন লাখ টাকার চেক দেখেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে কেবল উচ্চারন করেছি, হুজুর! আমরা এই চেকের টাকা দিয়ে কলেজ বিল্ডিং, হোস্টেল, লাইব্রেরী বেবাক কিছু পাকা কইরা ফেল্মু।

হুজুর ভাসানী সাহেব এতক্ষন বসে ছিলেন। এবার তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পায়চারী শুরু দিয়েই তিনি বলতে লাগলেনঃ তোমরা আমাকে আইউব খাঁর কাছে বেচতে চাও? আইউব খানের কাছে আমি চাইলে শুধু তিন লাখ কেন, তারও অনেক বেশী দিয়ে সে খুশী হবে, বুঝলা ? আইউব খানের যদি কাগমারী কলেজে সাহায্য দেওয়ার ইচ্ছাই থাকতো, তাহলে সে কলেজের প্রেসিডেন্টের বরাবর চেকটা পাঠাতে পারতো। তোমরা চেকটা ফিরিয়ে দিয়ে লেখো গা, চেকটা যেন কাগমারী কলেজের প্রেসিডেন্টের নামে পাঠিয়েদেয়।

আমরা হুজুর ভাসানী সাহেবের অছিয়ত মোতাবেক আইউব সরকারের কাছে চেকটি ফিরিয়ে দিয়ে সেই চেকটি কলেজের প্রেসিডেন্টের বরাবরে পাঠাবার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সেই চেক আর কখনো কলেজে ফিরে আসে নাই।

কিছুদিন মোয়াজ্জেম সাহেবের বাসায় তাদের ভাই-বোনের মত মিল মহব্বতে বসবাসের পর আমি আলাদা বাসা ভাড়া করে থানাপাড়া মরহুম ওসমান গনী খান উকিল সাহেবের বাসায় এলাম। উকিল সাহেবের বড় ছেলে কায়সার খান সাংবাদিকতা করতেন। সে সময়ে বোধহয় সে তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান যার বর্তমান নাম দৈনিক বাংলা তাতে চাকুরী করতো। আমি কবিতা গল্প প্রবন্ধ সব কিছুতেই হাত চালাতাম। সাহিত্যিক হিসাবে সাংবাদিক কায়সার খানের সাথে আমার মহব্বত গড়ে ওঠা ছিল একান্তই স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

এই সময় আমাদের প্রিয় কবি মীর আবুল খায়ের ও আমাদের কলেজের তৎকালীন লাইব্রেরীয়ান জওশন খান–যিনি বর্তমান করটিয়া সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বাংলার সহকারী অধ্যাপক হিসাবে সুনামের হকদার হয়ে আছেন, তাদের কে নিয়ে আমার থানাপাড়া বাসায় সাহিত্য মজলিশ গড়ে উঠেছিল। কায়সার খান, মীর আবুল খায়ের ও জওশন খান আমাকে টাংগাইল জেলা সাহিত্য মজলিশের সভাপতি হিসাবে ইমামতী দান করলেও তারা আমার ধ্যানধারনার সাথে একাত্মতা বোধ করতে পারে নাই। তারা গোপনে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারনায় প্রভাবান্বিত ছিলেন বলে আমি উপলব্ধি করেছি। কিন্তু আমি গোড়া থেকেই বলে আসতাম, ইসলামের চেয়ে সমাজতন্ত্র আর কোনো ইজমে নাই।

১৯৬২ সনে ভয়াবহ প্লাবন দেখাদিল। টাংগাইল শহর তলিয়ে গেল। আমি উকিল সাহেবের যে ঘরে বাস করতাম সে ঘরে ধন্নার সাথে মোটা রশি দিয়ে চৌকি উঁচু করে বেধে কোনো মতে দিন গুজরান করতাম। আমাদের কোলে তখন তিন বছরের ছেলে পারভেজ। প্রতি মুহূর্তে ভয়ে ভয়ে থাকতাম, কখন ছেলে চৌকির উপর থেকে পানির মধ্যে পড়ে যায়। এদিকে আমার স্ত্রী নূরজাহান সাতার জানতো না। সেও এক দারুন ভয় ছিল। বাড়িতে উঠোনেই তখন সাতার। ডাক পিওন চিঠি পত্র দিতে আসতো ডিঙ্গি নৌকায়। ডিঙ্গি নৌকা প্রত্যেকের ঘরের দুয়ারে এসে ভিড়তো এবং হাত বাড়িয়ে চিঠিপত্র মনি অর্ডার ইত্যাদি দিতো। বর্ষার শেষে আমরা মোহাম্মদ আলী রেঞ্জারস সাহেবের বাসায় উঠলাম। সেখানে পেলাম আর একটা ছোট ফেমিলি। খলিল সাহেব ও তার স্ত্রী। আমাদের তিন বছরের ছেলে পারভেজকে খলিল সাহেবের স্ত্রী আদরে যত্নে এমন নেওটা করেছিল যে, আমরা কখনো তাকে ঘরে পেতাম না। আমি কলেজ থেকে এলে এক দৌড়ে আমার কোলে উঠতো ; তারপর দেখতে না দেখতেই খলিল সাহেবের ঘরে তার স্ত্রীর কোলে গিয়ে আশ্রয় নিতো। আমার স্ত্রী নূরজাহান পারভেজকে এমন শাসনে রাখতো যেটা পারভেজের ভাল লাগতো না। সে দুপুরে খাওয়ায়ে পারভেজকে নিয়ে বিছানায় ঘুম পাড়াতে কোশেশ করতো। পারভেজ কিছুতেই ঘুম পারতে চাইতোনা। কিন্তু ওর মায়ের শাসনে চুপ করে চোখ বুজে ওর মায়ের কোলের মধ্যে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতো। আমি বিকেল ৩/৪ টার মধ্যে কলেজ থেকে বাসায় ফেরা মাত্র আমার গলার আওয়াজ পেয়েই আব্বা এসেছে বলেই পারভেজ বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছুটে আসতো আমার কাছে। আমি তখন বড় ঘরের দরোজা খুলে দিতাম। পারভেজ

www.pathagar.com

মুক্তি পেয়ে একদৌড়ে গিয়ে খলিল সাহেবের স্ত্রীর কোলে আশ্রয় নিতো ; কখনো সামনের মাঠে ওর সংগীদের সাথে খেলতে যেতো। পারভেজের বয়স ৬/৭ বছর পর্যন্ত একই অবস্থা চলছিল

ইতিমধ্যে খলিল সাহেবের ঘরে জন্ম নিল মিলি। সেই মিলি এসে আমার স্ত্রী নূরজাহানের কোল দখল করলো। প্রায় দিনই দেখা যেতো মিলি ভাতখাচ্ছে আমার স্ত্রী নূরজাহানের হাতে এবং পারভেজ ভাত খাচ্ছে মিলির মায়ের হাতে। এই পরিবেশে আমার ও খলিল সাহেবের সংসারে যে বাতাস বইতো সেটা কোনো মায়ের পেটের সন্তানদের যৌথ সংসারেও বইতো কিনা সন্দেহ আছে। আমাদের মিল মহব্বত ছিল নিখুঁত ও গভীর।

মিলিকে কন্যাতুল্য স্নেহে লালন পালন করলেও আমার স্ত্রী ভিতরে ভিতরে একটি কন্যা সন্তানের জন্য ব্যাকুল পেরেশান ছিলেন। আমাদের যাতে আর একটি সন্তান জন্মে সেজন্যে মিলির মা নূরজাহানকে কতোভাবেই যে সাহায্য করেছে তার কোনো শুমার নাই। আমি তার অনেক খবরই রাখতাম না। একদিন শুনলাম মিলির মা আমার স্ত্রীকে এক কবিরাজের পিঠা খাওয়াছেন। যেখানে মিলির মা আছে সেখানে আমার উদ্বিগ্ন থাকার কোনো কারন থাকতে পারে না। কেননা, তারা উভয়েই দুই বোনের মতো।

কবিরাজের পিঠা খাওয়াবার আগে আমি টাংগাইলের ৩জন বড় ডাক্তার ডাঃ এইচ, আর, খান,ডাঃ হারুন-অর-রশিদ ও তৎকালিন মহকুমা মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ হাবিবুল্লাহ-এই তিনজনের এক বোর্ডের মাধ্যমে আমার স্ত্রীকে পরীক্ষা করিয়েছিলাম। তারা ঐক্যমত জাহির করে আমাদের জানালেন যে, আমার স্ত্রীর দেহে অত্যাধিক চর্বি ধরেছে, অপারেশন করলেই সন্তান ধারনের উপযোগী হবেন। অপারেশনের কথা শুনে আমরা চুপ্‌সে গিয়েছিলাম।

মিলির মায়ের সাহায্যে নানারূপ ঝার ফুক তাবীজ কবচ চলছিল। শেষে চলছিল কবিরাজের পিঠা খাওয়া। এক কবিরাজ একটি দৈয়ের পাত্রে একটি পিঠা স্থাপন করে দিয়েছিলেন। প্রতিদিন সকালে দেখা যেতো সেখানে দুটি পিঠা হয়ে আছে। তারই একটি খেতে হতো। পরদিন দেখা যেতো আরেকটি পিঠা হয়ে আছে। সেটাও খেয়ে ফেলতে হতো। এভাবে সাতদিন সাতটি পিঠা খেলেই পিঠা খাওয়া শেষ হতো।

আমার স্ত্রী তা-ই খেতো। আমি জানতাম কিন্তু কিছু বলতাম না। আমাকেও তারা কেউ জানতে দিতে চাইতো না। কারন আমি বুজুরকিতে আদৌ বিশ্বাস করিনা -এটা

www.pathagar.com

তারা ভালোই জানতো। কাজেই আমাকে কিছুনা জানিয়েই তারা কবিরাজের পিঠা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল।

মাস দেড়েকের মধ্যে সেই কবিরাজের পিঠা খাওয়ার করুন পরিনতি শুরু হল। আমার স্ত্রী নূরজাহানের প্রথমে ঢোক গিলতে কষ্ট হতে শুরু দিল। জ্বরও শুরু হল। নূরজাহান দুই তিন দিনের মধ্যে তরল জিনিস ছাড়া কিছুই গিলতে পারতো না। উপরোক্ত তিন জন ডাক্তার ছাড়াও আমেরিকা ফেরৎ ডাঃ সুকুমার বোসও চিকিৎসা করতে লাগলেন। কোনোই উপশম নাই। ক্রমেই রোগের বৃদ্ধি। রেঞ্জার্স কোয়াটারে আমাদের একটা করুন জীবন শুরু হয়ে গেল। আমি সেই পিঠা চিকিৎসক কবিরাজের কোনো সন্ধান করতে পারলাম না। মাস তিনেকের মধ্যে নূরজাহানের গলার ঘা কিছু উপশম হলো। কিছু তরল জাউ ও দুধ পথ্য সে গিলতে পারলো।

নূরজাহান যখন সম্পূর্ন সুস্থ হল, তখন সে পাট কাঠির মতো শুকনো। তারপর অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই নূরজাহান সন্তান ধারন করলো। যথাসময়ে জন্ম হলো আমার ২য় মেয়ে মুন্নী। মুন্নীর জন্মের পিছনের এই করুন কাহিনী আমাদের জীবনে একটি অমোচনীয় দাগ কেটে রেখেছে।

মুন্নী আমাদের কোলে আসার পরে মিলি পেলো তার ছোট বোন। মিলি মুন্নীকে ছোট বোনের মতোই আদর যত্ন করতো। এখন মিলির স্বামী মোঃ আবুল হোসেন কৃষি করপোরেশনের এক জন অফিসার। মিলির কোলে ৩টি সন্তান। কিন্তু আমাদের মুন্নীকে সেই আগের মতোই আপন বোন হিসাবে সে মনে করে। কিছু দিন আগে মিলির আব্বা খলিল সাব এন্তেকাল করেছেন। আমি মিলি ও তার স্বামীকে বলেছিঃ আমি তো এখনো বেঁচে আছি। আমাকেই তোমরা হামেশা খলিল ভাইয়ের বিকল্প মনে করতে ভুলবে না। রেঞ্জারস কোয়াটারের মালিক মরহুম মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের দুই ছেলে মোযহারুল ইসলাম খান বা তোতা মিয়া এবং শাহজাহান খানদের সাথেও আমাদের মধুর আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল, শাহজাহান খানের বড় অবদান আমার চাকুরী উদ্ধার কালে তাদের ঢাকাস্থ সুত্রাপুরের বাসায় ভাত দিয়ে টাকা দিয়ে আমাকে এক বছর কাল পালা। আমি চাকুরী উদ্ধার করে তাদের পাওনা টাকাগুলি কড়ায় গন্ডায় শোধ করে দিয়েছিলাম বলে তারা আমার উপর বেজায় খুশী ছিল । কিন্তু আমি তাদের বাড়িতে যে এক বছর ভাত খেয়েছি, সেটা আমি শোধ দিতে পারিনাই।

www.pathagar.com

তবে তারা বলে, আমি যখন এক নাগার ১৪ বছর থানাপাড়া তাদের রেঞ্জারস কোয়াটারে ছিলাম তখন তারা ঢাকা থেকে সপরিবারে টাংগাইল এসে আমার ঘরেই খাওয়া দাওয়া করতো। আমার স্ত্রী নূরজাহান অতীব অতিথি পরায়না। তোতা মিয়া শাহজাহান ও খলিল সাহেবকে সে ভাইজান বলে ডাকতো এবং নিজে পরিবেশন করে তাদের এমন ভাবেই খাওয়াতো যে, তারা খেতে খেতে হাফিয়ে উঠে বার বার বিনয়ের সাথে নিষেধ করতো। তোতা মিয়া ও শাহজাহান সাহেব সেই সব কথা হামেশাই বলতো এবং আমাকে তাদের সূত্রাপুর বাসায় একটা রুম ছেড়ে দিয়ে এক বছর কাল ভাত দিয়ে ও টাকা দিয়ে প্রতিপালন করেছিল বলেই সরকারের উর্ধতন মহলে আমি তদবির করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই তদবিরের সুযোগেই আমি অসাধ্য সাধনও করতে পেরেছিলাম। শাহাজাহান সাহেবের ছেলে শায়েস্তা এখনো আমার এতিমখানা রোডের নুরজাহান ভিলায় আসে। শাহজাহান সাহেবের স্ত্রীও মেহেরবানী করে আমার বাড়িতে তশরিফ আনেন। তিনি পাকুল্লা জমিদার বংশের মেয়ে। কোনো অহংকারের বালাই নাই তার মধ্যে। শাহজাহান সাহেবের ২য় ছেলে শাহ নেওয়াজ ও ৩য় ছেলে শাহরেজ এবং তিন মেয়ে রেহানা সাহানা– এরা সকলেই আমাদের সাথে পরম আত্মীয়ের মতোই ব্যবহার করে থাকে। তোতা মিয়ার ছেলেমেয়েরাও একই রকম। তাদের কাউকেই একটুও খাটো করে ভাবার উপায় নাই। খালিল ভাইয়ের শালা ও শালীরা এমনকি ওদের স্বামীরা পর্যন্ত আমাদেরকে একান্ত আপনজন বলেই মনে করে। খলিল ভাইয়ের শালা জাহাঙ্গীরকে আমরা আদর দিয়ে মানুষ করেছি। জাহাঙ্গীর সেটা ভোলে নাই। যখনই টাংগাইল আসে আমাদের খোঁজ না দিয়ে যায় না। খলিল ভাইয়ের আরেক শালা জহুরুল ইসলাম খান বর্তমানে ভাইস পিন্সিপাল, সে কাগমারী সরকারী কলেজে আমার শুধু সহকর্মি নয়; আমার ডান হাত ছিল। জহুরুল ইসলাম খান এর এক ভাই বদরে আলম খানকে আমাদের কলেজে আমরাই ইংরাজীর অধ্যাপক হিসাবে নিয়েছিলাম। কিন্তু পাকিস্তান আমলেই তিনি ই, পি, সি, এস, পাশ করে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেছিলেন। বর্তমানে তিনি বহু উচ্চ পদে সমাসীন।

জহুরুল ইসলামের বিয়েটা ছিল রোমান্টিক। একদিন আমার স্ত্রী নূরজাহান আমার কানে দিল, জহুরুল–বকুলকে ভালবাসে। ওদের বিয়েটা ঘটিয়ে দাও। আমি বললাম। তুমি আনজাম কর। জহুরুল তো আমার ছোট ভাইয়ের মতো। কাজেই আমাদের মাধ্যমে যদি বকুল ও জহুরুল ওদের দুটি জীবনের মিলন ঘটে, সেটা অসীম ছোয়াবের ব্যাপার হবে। জহুরুল ইসলাম এর বিয়ের সকল আনজাম খলিল ভাই, মিলির মা,

www.pathagar.com

আমার ও নূরজাহান এই চারজনের মাধ্যমেই হয়েছিল খুব জমকালো ভাবে। আল্লাহ জানে সেজন্য আমাদের ছোয়াবের খাতায় কিছু জমা আছে কিনা।

ইছায়ী ১৯৬৩ সনের প্রায় শেষাশেষী। তৎকালীন টাংগাইলের এস, ডি, ও জনাব এ, টি এম শামসূল হক (সাবেক সি, এস, পি,) টাংগাইল জেলার ইতিহাস রচনার উদ্যোগ গ্রহন ক'রে করটিয়া সাদত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ তোফায়েল আহম্মদকে সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি এবং অধ্যাপক খলিলুর রহমানকে প্রধান সম্পাদক হিসাবে নিয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছিলেন। সেই কমিটিতে আমি টাংগাইলের বাশিন্দা না হওয়া সত্বেও আমাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে শরীক করা হয়েছিল। টাংগাইলের ইতিহাস রচনার উদ্যোগের সাথে শরীক হয়ে আমার খেয়াল চাপলো, আর কেহ কিছু করুক বা না করুক, আমাকে টাংগাইলের ইতিহাস রচনার একটা কিনারা করতেই হবে।

আমি টাংগাইলের প্রবীনতম উকিল মরহুম নূরুর রহমান খান ইউসুফজী ও মরহুম এবাদত আলী খাঁ প্রমুখের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম, টাংগাইলের প্রাচীন ইতিহাস জানেন মওলানা ভাসানী সাহেব।

মাওলানা ভাসানী হুজুর আমাকে সন্তান তুল্য স্নেহ করতেন। কাজেই তার কাছে আমার আলাদা জোর ছিল।

আমি হামেশা একখানা খাতা বা ডায়রী সাথে রাখতাম । একদিন আছরের নামাজ বাদে মওলানা ভাসানী হুজুরের কাছে গিয়ে বললামঃ আমি টাংগাইলের ইতিহাস লেখার এরাদা করেছি। হুজুর যা জানেন, সেগুলো বললে আমি নোট করতাম।

মওলানা ভাসানী হুজুর কোন ভূমিকার ধারে কাছে না গিয়ে সোজাসুজি বলতে লাগলেন, কাগমারী পরগণার আদি শাসক ছিলেন হজরত পীর শাহ জামান সাহেব, যার নামে কাগমারী মাজারের পাশে আমি একটি প্রাইমারী স্কুল কায়েম করেছি। হযরত পীর শাহজামান ছিলেন চিরকুমার। কাজেই কাগমারী পরগণার মোতওয়াল্লী বজায় রাখার উছিলায় তিনি স্থানীয় কায়স্থ বংশীয় একটি ছেলেকে পালিত পুত্র হিসাবে রেখেছিলেন। ছেলেটির নাম ছিল ইন্দ্র নারায়ন রায়। ছেলেটি পীর হজরত শাহজামানের সহবতে বসবাস করতে করতে ইসলামের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়ে যায়। তার মুসলমান নাম হয় এনায়েতুল্লাহ। হজরত শাহজামান সাহেব এনায়েতুল্লার হাতেই পরগনার শাসনভার ন্যস্ত রেখে এনায়েতপুর গ্রামে একটি খান্‌কা শরীফ কায়েম করে তাঁর শীষ্য সাগরেদ সহ সেখানে এবাদত বন্দেগী জিকির আজকারে মশগুল থাকতেন। পীর শাহজামানের এন্তেকালের পরে এনায়েতুল্লাহ্‌র উপর কাগমারী পরগনার

www.pathagar.com

মোতওয়াল্লীর দায়ীত্ব পুরোপুরি চেপেছিল। সে দায়িত্ব তিনি দক্ষতার সাথেই পালন করেছেন।

শেষ বয়সে শাহ এনায়ে তুল্লাহ হজ্জ পালনের জন্য মক্কার পথে রওনা হওয়ার সময় তাঁর তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যা ও স্ত্রীকে তার ভাইপো বিশ্ব নাথ রায়ের হেফাজতে রেখে যান। কিন্তু শাহ এনায়েতুল্লাহ্ সাহেব হজে গিয়ে মক্কাতেই এন্তেকাল করেন। তাঁর এন্তেকালের খবর জানার পর বিশ্বনাথ রায় তার পাত্র-মিত্রদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় শাহ এনায়েতুল্লাহ্র স্ত্রী ও তিনটি সন্তানকে কূয়ো খুড়ে সেই কূয়োর ভিতর জীবন্ত প্রোথিত করে তার উপর রাতারাতি একটি মঠ তৈরী করে রাজ্যময় প্রচার করে দিয়েছিল যে, মারাত্মক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে তারা এক দিনেই মারা গেছে। এই ভাবে কাগমারী পরগনার ক্ষমতার হাত বদল হয়। পুরো ব্রিটিশ আমল কাগমারী পরগনায় হিন্দু জমিদারগণ বংশ পরম্পরায় দাপটের সংগে রাজত্ব করে গেলেও পরগণাটির আদি মালিক একজন বুজর্গ মুসলমান হজরত পীর শাহজামান।

মওলানা ভাসানী হুজুরের কাছ থেকে এই চমকপ্রদ ঘটনা জানার পর আমি একক প্রচেষ্টায় টাংগাইলের ইতিহাস রচনা করতে শুরু দিয়েছিলাম। বর্তমান টাংগাইলের ইতিহাস আমার সেই প্রচেষ্টারই ফসল। দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ টাংগাইলের ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহ করার তকলীফ থেকে আজ পর্যন্ত রেহাই পাই নাই। এখনো টাংগাইলের ইতিহাসের গুলুত্বপূর্ণ বহু বিষয় দেশবাসীর খেদমতে তুলে ধরা বাকী আছে ; যে জন্য টাংগাইলের ইতিহাসের পঞ্চম সংস্করন প্রকাশের তাগিদ তীব্র ভাবে অনুভব করছি।

ইছায়ী ১৯৬৩ সনের পর থেকে মওলানা ভাসানী হুজুরের প্রত্যক্ষ তদারকিতে কাগমারী কলেজে ও পাঁচবিবিতে অবস্থিত হাজী মহসিন কলেজ সহ তাঁর আরো ১৩টি প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। এই মুদ্দতেই কাগমারী কলেজে নৈশ বিভাগ চালু করা হয়েছিল। বর্তমান সরকারী বিন্দুবাসিনী বয়েজ হাই স্কুলেই মাসিক ভাড়া ভিত্তিতে কাগমারী কলেজের নৈশ বিভাগ চালু হয়। কলেজের অধ্যক্ষ জলিল সাহেব মূল কলেজটি আমার দায়িত্বে রেখে নৈশ বিভাগটি মরহুম এম, এ, লতিফ সাহেবের দায়িত্বে ন্যস্ত করে ছহিছালামতে আমাদের ইমামতী করে গেছেন। কাগমারী কলেজের সেই নৈশ বিভাগ থেকে আমরা বিপুল সংখ্যক বয়স্ক ছাত্রকে আই, এ,বি-এ, পাশ করিয়ে দুনিয়াদারীতে ইজ্জতের ভাগীদার করেছিলাম। আমাদের সেই অবদানকে আজো

www.pathagar.com

যারা অকুন্ঠ চিত্তে স্বীকার করে আমাদের আন্তরিক দোয়ার ভাগীদার তাদের মধ্যে এডভোকেট মোঃ ইনছান আলী, এডভোকেট মোঃ সেতাব আলী খান, এডভোকেট মোঃ আবদুল আজিজ, এডভোকেট মোঃ শামসুল হক চৌধুরী, এডভোকেট মোঃ সেকেন্দার আলী চাকলাদার, কাজী সাকেরুল মওলা, মোহাম্মদ আলী (ডি,সি,কোর্টের হেড এসিষ্ট্যান্ট) মোঃ মকবুল হোসেন (ঐ) প্রয়াত মিসেস নিবেদিতা মন্ডল, মাহমুদা খাতুন (বীনা) সাবেক মহিলা এম, পি, প্রমুখের নাম আমি হামেশাই ইয়াদকরি।

ইছায়ী ১৯৬৮ সনে প্রেসিডেন্ট আইউব খান পাকিস্তানে 'উন্নয়নের দশ বছর' পালনের তোড়জোর শুরু দিলেন। সংগে সংগে শুরু হয়ে গেল তার বিরোধিতা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রদের মধ্যে আইউব বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে শুরু দিল। স্কুল-কলেজে ছাত্রদের আন্দোলন যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধেই সোচ্চার হয়ে উঠলো।

একদিন বিকাল প্রায় ৪ টার সময় আমি থানাপাড়া রেঞ্জার্স কোয়াটারে অবস্থিত আমার বাসায় কেবল মাত্র বৈকালিক ঘুম থেকে উঠেছি, এমন সময় শুনতে পেলাম, কাগমারী কলেজের অধ্যক্ষ জলিল সাহেবের কাছ থেকে কলেজের ছাত্ররা জোর করে তাঁর পদত্যাগ পত্র আদায় করে নিয়েছে। কাজটা যদিও বেআইনী, কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের মুখে জলিল সাহেব কোন বাধা দেন নাই। তবে তিনি থানার এজাহার দিয়েছেন এবং একই দিন বিকালেই কলেজ গবর্নির বোডির মিটিং ডেকে তিনি ছয় মাসের ছুটি নিয়েছেন। সেই একই মিটিংএ আমাকে কলেজের এ্যাকটিং প্রিন্সিপাল নিয়োগ করা হয়েছে।

সেই মুদ্দতে কলেজের গবর্নিং বোডির প্রেসিডেন্ট ছিলেন তৎকালিন এস, ডি, ও, পশ্চিম পাকিস্তানের বাশিন্দা জনাব আবদুল্লাহ জে, মেনন সি, এস, পি। বিকালেই মেনন সাহেবের দস্তখত দেওয়া নিয়োগ পত্র পেয়ে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম।

আমি সেজন্য জলিল সাহেবকে যথেষ্ট শেকায়েৎ করেছি। এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল অথচ তিনি আমাকে কিছুই জানান নাই। জলিল সাহেব জবাবে বলেছিলেনঃ কলেজের নৈশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মরহুম এম-এ, লতিফ সাহেব বিগত ৬মাস যাবৎ ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন গোপন স্থানে ৩২টি মিটিং করেছে। কলেজের ক্ষমতা দখলের জন্য সংগোপনে মরহুম লতিফ সাহেবের এই সব কারসাজী সম্পর্কে আমার অজ্ঞতার কারনেই কলেজের দায়িত্ব আমার মতো নির্দলীয় লোকের হাতেই

www.pathagar.com

তুলে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আমি মওলানা ভাসানী হুজুরের লোক এবং চাকুরীতেও কলেজের সকলের মধ্যে প্রবীন। কাজেই ক্ষমতা আপোষেই আমার হাতে এসে যায়।

কলেজের ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী সকলেরই অভাব-অভিযোগ আমার নখদর্পনে ছিল। পরদিন কলেজের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল্লাহ জে, মেনন আমার কাছে জানতে চাইলেনঃ আমি এ্যাকটিং প্রিন্সিপাল হিসাবে কলেজের কি কি উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে চাই। আমি ২৩টি পরিকল্পনা তাঁর মজদিগে পেশ করলাম। আমার পরিকল্পনার ভিতরে কাগমারী কলেজ সম্পর্কে আমার এতো স্বচ্ছ ধারনা দেখে মেনন সাহেব আমার ভূয়সী তারীফ করলেন এবং বললেনঃ রহিম সাহেব! আপনি কোনো কিছু তোয়াক্কা না করে আপনার প্ল্যান প্রোগ্রাম মোতাবেক কাজ করে যাবেন ; আপনার জন্য আমার হামেশা মদদ থাকবে।

আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এবং মওলানা ভাসানী হুজুরের দোয়া নিয়ে কলেজ উন্নয়নের কাজ শুরু দিলাম। আমি কাগমারী কলেজের এ্যাকটিং প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্বে ছিলাম মাত্র সাত মাস; কিন্তু সেই অল্প সময়ে আমি যে সমস্ত কাজ করেছিলাম, আজ পযন্ত দুই যুগ পার হয়ে গেছে, তবুও আমার সেই কাজের নিদর্শনগুলি অক্ষয় অটুট হয়ে আছে। আমি অধ্যাপক ও কর্মচারীদের জন্য সরকারী স্কেলের সমমানের বেতন স্কেল এবং দ্বিপাক্ষিক জমাভিত্তিক ভবিষ্যত তহবিল চালু করেছিলাম।

কলেজের লাইব্রেরীয়ান,হেড ক্লার্ক, হিসাব রক্ষক, সহকারী কেরানী, আর্টস কমার্স ও সাইয়েন্স প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন করে বেয়ারার নিয়োগ করেছিলাম। বিজ্ঞান ভবন, কমার্স ভবন, আলাদা অফিস কক্ষ, আলাদা লাইব্রেরী, অধ্যাপকদের আলাদা কমন রুম, কমার্স মিউজিয়াম, আলাদা দুটি ছাত্রাবাস (একটি কলেজ প্রাংগণে অপরটি সন্তোষ জমিদার বাড়ীর পাঁচ আলী তরফের পুঁজা মন্ডপের দালানে), ছাত্রদের বহু আকাংখিত কমন রুম, পাকা ও সেমিপাকা ল্যাট্রিন ইত্যাদি গড়েতুলেছিলাম।

দীর্ঘ দিনের প্রয়োজনের তাগিদে কলেজ প্রশাসনকে আমি আমুল সংস্কার করতে বাধ্য হয়ে ছিলাম। কলেজের হেড-ক্লার্ক নিত্যানন্দ পালকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে উৎসাহ ও তাগিদ দিয়ে বাংলায় এম-এ পাশ করিয়ে ছিলাম। উক্ত নিত্যানন্দ পালকে আমি বাংলার অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করে কলেজের সেকেন্ড ক্লার্ক আমার ছাত্র মোঃ নিজাম উদ্দিন মিয়াকে হেড ক্লার্ক এবং কলেজের পিওন আবদুল গফুরকে সহকারী কেরানী পদে প্রমোশন দিয়েছিলাম। মোঃ শামসুল হক কে কেরানী পদে এবং মোঃ জমশের আলী ও অমলেশ সরকারকে দক্ষ বেয়ারার পদে চাকুরী স্থায়ী করেছি।

www.pathagar.com

তদুপরি মওদুদ হোসেন খান মজনুকে লাইব্রেরীয়ান পদে, হরিপদ সাহাকে হিসাব রক্ষক পদে, আবদুস সাত্তার ও দেওয়ান আবদুল মোতালেবকে সহকারী কেরানী পদে, মির্জা আবদুল মান্নানকে টাইপিষ্ট পদেএবং মোঃ মজিবর রহমান মোহাম্মদ আলী মন্ডল, মোঃ আবদুল গণি মিয়া, মোঃ হায়দার আলী ও তোতা মিয়াকে বেয়ারার শব্দে নিযুক্ত করে কলেজ প্রশাসনে দীর্ঘ দিনের শূন্যতা পূরন করেছিলাম।

কিন্তু সে জন্য আমার নছিবে পুরস্কারের পরিবর্তে তিরস্কারই জুটেছে। বিরুদ্ধবাদিরা আমার এই সংস্কার কাজের মধ্যে খুঁৎ বের করে প্রপাগান্ডা করেছিলেন যে, আমি কলেজের ফান্ড খোকলা করে নিজে পপুলার হওয়ার খোয়াবে মশগুল হয়েছি। তারা সেখানেই থেমে থাকেন নাই। কলেজের বিজ্ঞান ভবন, কমার্স ভবন, আলাদা অফিস কক্ষ, আলাদা লাইব্রেরী, দুটি ছাত্রাবাস, ছাত্রদের কমন রুম, সেনেটারী ও সেমিসেনিটারী ল্যাট্রিন ইত্যাদি নির্মান করতে গিয়ে আমি কলেজ ফান্ডের টাকা মেরে ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়েছি–এই মর্মে অভিযোগ সাজিয়ে তারা মওলানা ভাসানী হুজুরের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন। আমি রোজকার নিয়ম মাফিক হুজুরের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র হুজুর আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, রহিম! তুমি নাকি কলেজের তহবিল মেরে ঢোল হয়ে গেছো। ওরা সেই সব আমার কাছে বলে গেল। আমি ওদেরকে তোমার নামে থানায় এজাহার দিতে বলেছি।

আমি সংগে সংগে জবাব দিয়েছিলাম, হুজুর! খুব ভাল কথা বলেছেন।

প্রসংগতঃ বলে রাখা ভাল। কলেজের সবগুলি নির্মাণ কাজ টেন্ডারের মাধ্যমে করা হয়েছিল। সেমি পাকা কাজের টেন্ডার পেয়েছিলেন থানা পাড়ার মোঃ আবদুল জলিল খান এবং সাইয়েন্ড বিল্ডিং এর টেন্ডার পেয়ে ছিলেন ছোনাট গ্রামের মোঃ রোস্তম আলী সরকার।

আমি যে সমস্ত ছেলেকে চাকুরী দিয়ে ছিলাম, তারা কেউই আমার আত্মীয় কুটুম্ব নয়, তারা সকলেই কলেজের আশপাশের বাশিন্দা।

যারা ভাসানী হুজুরের কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ছিলেন, তারা কলেজের বহুমুখী উন্নয়নের পথে বাধা পয়দা করে ফয়দা হাসিল করতে চেয়েছিলেন, এই সামান্য ব্যাপারটা আঁচ করা হুজুর ভাসানী সাহেবের কাছে কঠিন ছিলনা। তিনি তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন এই ভাবে যে, তাদের হাতে যদি তহবিল তছরুপের দলিল থেকেই থাক, তাহলে হুজুরের কাছে ধন্না না দিয়ে সোজা থানায় রহিমের বিরুদ্ধে এজাহার দিক।

www.pathagar.com

আমার বিরুদ্ধে এজাহার দেওয়ার মুরোদ তাদের কোনো দিনও হয় নাই।

কলেজের মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করে সেটা ডি, পি, আই কর্তৃক অনুমোদিত করেছিলাম এবং সেই প্ল্যান মোতাবেক বর্তমান সাইয়েন্স বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ শুরুদিয়েছিলাম।

সাইয়েন্স বিল্ডিং এর নির্মান কাজ সরাসরি তদারক করতেন মওলানা ভাসানী হুজুর। আমি বরাবরই রাত্রির ঘুম থেকে লেট রাইজার। ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে কলেজে হাজির হতে আমার প্রায়ই সাড়ে ন'টা বেজে যেতো। হুজুর ভাসানী সাহেব ফজরের নামাজ শেষ করে কিছু নাস্তা-পানি মুখে দিয়ে সন্তোষ থেকে কাগমারী কলেজের দিকে হাটা দিতেন। রাজ মিস্তিরা তৈরী হওয়ার আগেই হুজুর ভাসানী সাহেব তাদের সামনে এসে হাজির হতেন। তাঁকে দেখা মাত্রই রাজ মিস্তিরা তাড়াতাড়ি কাজ শুরুদিতো।

ইতিমধ্যে নাগাদ সাড়ে নটার মধ্যে আমি কলেজে হাজির হতাম। দেখতে পেতাম, আমার কাজগুলি হুজুর ভাসানী সাহেব দেখাশোনা করছেন। আমাকে দেখা মাত্রই হুজুর ভাসানী সাহেব আস্তে আস্তে সন্তোষের পথে হাটা দিতেন। কোনো কোনো দিন যাবার সময় বলতেনঃ ঠিকমতো দেখাশোনা না করলে কামলারা কোদাল তাগাড়ী ধুতেই বেলা দশটা বাজায়। তোমার বিল্ডিংএর কাজ শুরু দেবে কখন ?

হুজুরের এই শেকায়েতের অর্থ আমার বুঝতে অসুবিধা হতো না। আমার প্রতি হুজুরের স্নেহের তাগিদেই আমার অনুপস্থিতির সময়টা তিনি নিজেই তদারক করে যেতেন। আমাকে কলেজে হাজির দেখা মাত্রই তাঁর সেই তদারকির প্রয়োজন ফুরাতো; কাজেই তখন তিনি অন্য কাজে সন্তোষের দিকে ফিরে যেতেন।

আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল কলেজের গবর্নিং বোডির নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। কেননা ১৯৬৪ সনে নির্বাচিত গবর্নিং বোডির কাজ ২ (দুই) বছর আগে শেষ হয়ে গেলেও কোন নতুন গবর্নিং বোডি গঠন না করার ফলে কলেজের ছাত্র অসন্তোষ তীব্র ভাবে দানা বেধে ওঠে। কাজেই নতুন গবর্নিং বোডি গঠন করা ছিল ছাত্র-অভিভাবক ও অধ্যাপকবৃন্দের প্রধান দাবী। আমি সেই দাবী অনুসারে কলেজের নতুন গবর্নিং বোডির নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছি।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেনচেলার ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং কলেজ ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন সৈয়দ বদর উদ্দিন হোসাইন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাদের সাথে মোলাকাত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে জনাব মির্জা আশরাফ আলীকে মনোনীত করে এনেছিলাম।

www.pathagar.com

ঢাকা বোর্ড থেকে মনোনীত করে এনেছিলাম জনাব হুমায়ুন হোসেন খান এডভোকেটকে।

শিক্ষকদের মধ্যে নির্বাচিত মেম্বর ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক এম, এ, খালেক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক নরেন্দ্র নাথ ঘোষ। অভিভাবকদের মধ্যে নির্বাচিত মেম্বর ছিলেন মোঃ আবদুল জব্বার মিয়া (মোক্তার), ডাঃ মহেন্দ্র নাথ পাল, জনাব মোঃ খাদেম আলী সরকার, জনাব মোহাম্মদ বক্স সরকার।

অধ্যাপক এম, এ, খালেক ছিলেন অধ্যক্ষ জলিল সাহেবের ছাত্র। কিন্তু তিনি এমনি মর্দে মুমিন হিসাবে কলেজে মশহুর ছিলেন যে, গুরুজনের অন্যায় হজম করাও তিনি জায়েজ বিবেচনা করেন নাই। তাঁর ওস্তাদ জলিল সাহেব তত্ত্বিবাহক গভনিং বোডির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বছরের পর বছর সেই মরা লাশ দিয়ে কলেজ চালাবেন, এটা তিনি জায়েজ বিবেচনা না করে নতুন গভনিং বোডির জন্য ছাত্র অভিভাবক ও অধ্যাপক মন্ডলীর পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা দান করেছিলেন।

কিন্তু এই গবর্নিং বোডির উপর ছুটি ভোগরত অধ্যক্ষ জলিল সাহেব ইনজাংশন আদেশ প্রার্থনা করে স্থানীয় মুন্সেফ আদালতে এক মোকদ্দমা দায়ের করেন। সেই মোকদ্দমায় নবনির্বাচিত গবর্নিং বোডির উপর ইনজাংশন আদেশ বহাল রাখার জন্য সওয়াল জওয়াব করতে জলিল

সাহেবের পক্ষে আসেন প্রখ্যাত আইনজীবি মরহুম ডঃ আলীম আল রাজী বার-এট-ল, ও ব্যারিষ্টার খন্দকার আমির হোসেন, এবং আমার পক্ষে হাজিরা দেন স্থানীয় উকিল খন্দকার শাহাদৎ হোসেন জনাব আমজাদ হোসেন, ঢাকার উকিল জনাব হযরত আলী সিকদার ও তাঁর সহকর্মী।

নব নির্বাচিত গবর্নিং বোডির উপর ইন্‌জাংশন আদেশ বহাল হয়ে যায়। আমরা উক্ত ইন্‌জাংশন আদেশ ভ্যাকেট বা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য জজ কোর্টে আপীল দায়ের করার কোশেশ করতে থাকি। সেই সময় টাংগাইল জেলার জন্মের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। ১৯৬৯ সনের ১লা ডিসেম্বর টাংগাইল মহকুমাটি আলাদা জেলায় পরিণত হবে। কাজেই অবিভক্ত মোমেনশাহী জেলার জজ কোর্ট টাংগাইলের কোন কেস নথি ভূক্ত করছেন না।

আমরা মোমেনশাহী জজ কোর্টে কোন আপীল মোকদ্দমা দায়ের করতে না পেরে টাংগাইল জেলার জন্ম ও জজ কোর্ট চালু হওয়া পর্যন্ত এন্তেজার করতে বাধ্য হলাম।

www.pathagar.com

তখন বর্ষাকাল। শুনতে পেলাম, হুজুর ভাসানী সাহেব যমুনা নদীতে দীর্ঘ দিন নৌকা বিহার করে টাংগাইল পার্কের কাছে নৌকা ভিড়িয়ে ভক্তদের ছালাম কদমবুচি গ্রহনের পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মীদের তালীম দান করছেন। আমি তখন বিশেষ ভাবে পেরেশান ছিলাম।

জলিল সাহেব ইন্‌জাংশন মোকদ্দমায় জিতেই তার দলবল সহ তিনি কলেজের গদি দখল করেছেন। এবং আমি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজের সাধারণ দায়দায়িত্ব ছাড়াও বহুমুখী গুরু দায়িত্ব পালন করার অপরাধে আমাকে বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়েছেন। কাজেই আমি কয়েক মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছিনা। আমার উকিল জনাব খন্দকার শাহাদৎ হোসেন আমাকে দিয়ে ডিক্লেয়ারেটোরী স্যুট অর্থাৎ আমি কাগমারী কলেজের বৈধ অধ্যক্ষ এই মর্মে ঘোষনা দিয়ে একটি মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। সেই মোকদ্দমার ফলে জলিল সাহেবের পক্ষে অজুহাত দেখানো সুবিধা হয়েছে যে, রহিম সাহেব মোকদ্দমায় জিতলে বেতন পাবেন, নতুবা পাবেন না। জলিল সাহেবের জানা ছিল যে, রহিম সাহেব কখনো সঞ্চয়ী স্বভাবের লোক নন ; কাজেই তাঁর বেতন বন্ধ করলেই তিনি দুচোখে অন্ধকার দেখে মাফমুক্তি চাইতে বাধ্য হবেন।

বেতন বন্ধ অবস্থায় আমার খুব কষ্টেই চলতে হতো। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে ব্যতীত কারো কাছে মাথা হেট করা আমার ধাতে নাই। কাজেই ধারেকর্জে সংসার টেনে নিয়ে চলছিলাম আমার এই বিপদের সময়েই প্রথমে আমার আব্বাজান এন্তেকাল করেন। তার ছ'মাস পরে আমার আম্মাও এন্তেকাল করেন। কিন্তু তাদের দেখার নছিব আমার হয় নাই।

আমি টাংগাইল পার্কের কাছে নৌকার ঘাটে গিয়ে হুজুর ভাসানী সাহেবের কদমবুচি করে বিষন্ন মুখে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মুখ দিয়ে কোন কথা সড়লোনা।

হুজুর ভাসানী সাহেব আমাকে কোন কিছুই পুছ করলেন না। আমার বুকে তাঁর ডান হাতের আংগুল ঠেকিয়ে ফুঁক দিলেন এবং বললেন, রহিম! যাও, তুমি মামলায় জিত্‌বা।

আমি মাথা হেট্ করে হুজুর ভাসানী সাহেবের নজদিক থেকে চলে এলাম।

www.pathagar.com

কয়েকদিন পর আমি শুনতে পেলাম দলবল সহ জলিল সাহেব ছাত্র অভিভাবক ও অধ্যাপকদের এক সভা আহবান করেছেন। সেই সভায় জেলা প্রশাসক জনাব জালাল উদ্‌দিন আহমদ সভাপতিত্ব করবেন; প্রধান অতিথি থাকবেন হুজুর ভাসানী সাহেব। সেই সভাতেই, হয় রহিম সাহেব, নতুবা জলিল সাহেব, যে কোনো একজনকে কলেজ ছাড়তে হবে ; নতুবা কলেজের শান্তি ফিরে আসবে না।

আমি কোন দোষ করিনাই। কাজেই আমি থাকতাম নির্ভীক। আমি একিন দেলে বিশ্বাস করতাম আল্লাহ আমার নেঘাহবান।

কয়েক দিনের মধ্যেই ছাত্র-অভিভাবক -অধ্যাপকদের এক বিরাট সভা শুরু হ'ল। সভায় জেলা প্রশাসক জালাল উদ্‌দিন আহম্মদ সভাপতি এবং প্রধান অতিথি মওলানা ভাসানী হুজুর। অভিভাবকদের তরফ থেকে কয়েকজন বক্তব্য পেশ করলেন। তারা জোর দিয়ে জাহির করলেন যে, হুজুর ভাসানী সাহেব যদি এই সভাতেই ঘোষনা করেন যে জলিল কিংবা রহিম, তোমাদের যে কোনো একজনকে এই কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হবে, তাহলে তাদের না যেয়ে কি উপায় আছে? কাজেই সবই এখন নির্ভর করছে হুজুরের মর্জির উপর।

হুজুর ভাসানী সাহেব কখনো কোনো সভায় কম কথা বলেন না। জানাজার মোনাযাতের মধ্যেও সরকারের বিরুদ্ধে লম্বা এক ফিরিস্তি বলতেই তিনি হামেশা অভ্যস্ত। কিন্তু সেই মানুষ এই সভাতে মুখ্‌তাছার ভাবে বললেনঃ রহিম আমার জন্মস্থানের লোক, জলিল আমার কর্মস্থানে লোক। তাদের মধ্যে কে হারবে, কে জিতবে-সেজন্যে আদালতে মোকদ্দমা চলছে। আদালতের উপরে আমি কথা বলবো কেন ?

হুজুর ভাসানী সাহেব এই কথা বলেই মাইক ছেড়ে দিয়ে হন্ হন্ করে সন্তোষের পথে হাটা দিলেন। জেলা প্রশাসক জালাল সাহেবও উঠে তার জীপে চেপে চলে গেলেন। জলিল সাহেব লতিফ সাহেব প্রমুখ মুখ চুকা করে বসে রইলেন।

এর কয়েক দিন পর ছাত্রনেতা আতোয়ার রহমান, আফছার আলী, আবদুল হামিদ, আবদুল কুদ্দুস, আবদুল মালেক, বাদশা, আলী আজগার এবং অধ্যাপকদের মধ্যে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের এম, এ, খালেক, এম, এ, লতিফ, বানিজ্য বিভাগের খন্দকার মোজহারুল ইসলাম, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের জহুরুল ইসলাম খান ও নরেন্দ্র নাথ ঘোষ, বাংলা বিভাগের সুকুমার হোড়, বিজ্ঞান বিভাগের নজরুল ইসলাম খান, আমিনুল ইসলাম ও সত্যেন চ্যাটার্জি, কলেজ লাইব্রেরীয়ান মওদুদ খান মজনু প্রমুখের নেতৃত্বে কলেজের তৎকালীন আর্টস

www.pathagar.com

বিল্ডিংএ কলেজের সমুদয় ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকবৃন্দ দীর্ঘ তিন ঘন্টা ব্যাপী এক অলোচনা সভায় চূড়ান্ত ফয়সালা করে তারা প্রিন্সিপালের অফিসের দিকে এক জংগী মিছিল সহকারে এগিয়ে এলো। মিছিলের নেতৃত্বে উপরোক্ত অধ্যাপক ও ছাত্রনেতাগণ প্রিন্সিপালের অফিসে ঢুকেই জলিল সাহেবকে লক্ষ্য করে বললোঃ আপনি এক্ষনি বেরিয়ে আসুন। চলুন আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসছি। আপনি আর কোনো দিন এই কলেজের দিকে পা দেবেন না। বলা অনাবশ্যক যে, এই জংগী মিছিলের ভাবগতিক দেখা মাত্রই মরহুম লতিফ সাহেব অফিস ঘরের জানলা টপকে চো-দৌড় দিয়েছিলেন তার দুচোখ যেদিকে যায়।

অতঃপর অধ্যাপক এম, এ, খালেক, অধ্যাপক জহুরুল ইসলাম খান, অধ্যাপক সুকুমার হোড়,অধ্যাপক নরেন্দ্র নাথ ঘোষ, অধ্যাপক আহমদ রেজা, অধ্যাপক এস,এম, এম, কাদের প্রমুখ আমার দুই বাহু ধরে টেনে নিয়ে প্রিন্সিপালের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলঃ স্যার! আপনি এই কলেজের প্রকৃত প্রিন্সিপাল; আপনি এই গদিতে বসে থাকুন। আমরা দেখবো, কে আপনাকে গদি থেকে সড়ায়।

আমি ছাত্র ও অধ্যাপক বৃন্দের মধ্যে বেজায় জংগী মনোভাব দেখে খুবই পেরেশানী বোধ করলাম। জলিল সাহেবের মতো একজন ইজ্জতওয়ালা শিক্ষাবিদকে বেইজ্জত করলে সেটা গোঁটা শিক্ষক সমাজেরই বেইজ্জত, একথা মনে করে আমি সেই জংগী মিছিলের সামনে জোরহাত করে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলাম ঃ তোমরা জলিল সাহেবকে ইজ্জতের সাথে যেতে দাও। তোমাদের কিছু করতে হবেনা। আমি তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসবো। কিন্তু ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দ জলিল সাহেবের বেশরম আচরনের কথা জাহির করে মিছিল সহকারে তাঁকে আগলে নিয়ে চললো তার বাড়ির দিকে।

জলিল সাহেবের বাড়ি ঢাকা রোডে ফুড গোডাউনের কাছে। কাগমারী কলেজ থেকে টাংগাইল শহরের মেইন রোড দিয়ে প্রায় ৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলে জলিল সাহেবের বাড়ি। এত দীর্ঘ রাস্তায় "জলিল যদি ভাল চাও, কলেজ ছেড়ে চলে যাও", শ্লোগান দিতে দিতে ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দ মিছিল সহকারে তাকে এগিয়ে বাড়িতে পৌছেদিয়ে এসেছিল।

অতঃপর আমার ও জলিল সাহেবের পজিশন সম্পর্কে আদালতের রায় বের হওয়া সাপেক্ষে কলেজের মধ্যে নিরপেক্ষ প্রশাসন বজায় রাখার তাগিদে কলেজের গবনিং বোডির প্রেসিডেন্ট আমার পরবর্তী সিনিয়র অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসাককে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগ করলেন।

www.pathagar.com

অল্প কিছু দিনের মধ্যেই জলিল সাহেব টাংগাইল জেলার গোপালপুর কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করলেন। কাগমারী কলেজের দ্বন্দ্ব সংঘাত আপ্‌সে দুরীভূত হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আমার আমলের গবর্নিং বোডির বিরুদ্ধে আদালতের ইনজাংশন আদেশ ভ্যাকেট বা উঠে গেল। উক্ত গবর্নিং বোডির ৬-১১-১৯৭০ ই তারিখের সভায় আমাকে কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ও জনাব সেকেন্দার হায়াতকে প্রিন্সিপাল হিসাবে নিয়োগ প্রদান করে কলেজ প্রশাসনে স্থিতিশীলতা পয়দার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

আমরা ৪/৫ মাস কিছুটা স্বস্তির মধ্যে দিন গুজরান করতে পেরেছিলাম। তারপর ১৯৭১ এর ২৬ শে মার্চের পর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল জাতীয় পেরেশানী। সেই পেরেশানীতে কতো জনের নছিব যে কতো ভাবে টলে গিয়েছিল, তার হিসাব কে রাখে।

টাংগাইলে পাক মিলিটারী আগমনের পর জনাব সেকেন্দার হায়াত কলেজে হাজির না হয়ে তার বাশাইল উপজেলার গ্রামের বাড়িতে থেকেই কলেজের কাগজ পত্র সই-সাবুদ করে দিতে লাগলেন। কিছু দিনের মধ্যে কলেজের পিওনকে তার গ্রামের বাড়িতে পাঠানোর কোন উপায় থাকলো না। পথঘাটে গোলাগুলি ও ধরপাকড়ের গুজব হামেশাই চলছিল। উক্ত পরিস্থিতিতে কলেজের যাবতীয় কাজ এমনকি গবর্নিং বোডির মিটিং পর্যন্ত আমাকেই করতে হোতো। সরকারী হুকুম তামীল করা,একই সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ার পরিবেশ বজায় রাখা-উভয়টাই আমি বিচক্ষনতার সাথেই করেছিলাম। কিন্তু তারই পুরস্কার স্বরূপ আমার নছিবে পরবর্তী কালে জুটেছিল দালালীর অভিযোগে চাকুরী থেকে পদচ্যুতি। আমার ক্যারিয়ার ধ্বংস করার জন্য যে সব ঈর্ষাপরায়ন লোক গোপনে ঘাপটি দিয়ে ছিল, তারাই একজন প্রভাবশালী নেতার মদদে আমাকে বিপুলভাবে পুরস্কারের পরিবর্তে যে ভাবে তিরস্কৃত করে রুশ ভারতের নির্লজ্জ দালালীর বদনাম থেকে বাঁচিয়েছিল, তার পরিনাম ফল তখন মালুম করতে না পারলেও এখন মালুম করতে পারছি।

ইছায়ী ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বরে আমি কাগমারী কলেজের প্রিন্সিপালের গুরুদায়িত্ব পূর্বের মতোই পালন করেছি। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে জনাব সেকেন্দার হায়াত কলেজে হাজির হয়ে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করতে শুরু দিয়েছিলেন। সে সময় বাংলাদেশ সরকার আমাদের কাছে নাগরিকত্ব

www.pathagar.com

ঘোষনার কাজপত্র সই সাবুদ করে বেতন গ্রহনের ফরমান জারি করেছিল। আমরা সে সব কাগজ পত্র যথারীতি সই–সাবুদ করে দিয়ে বেতন গ্রহণ করেছি।

কিন্তু ১৯৭২ সনের মার্চ মাসের দিকে কলেজের মধ্যে ক্ষমতা দখলের পুরাতন চক্রটি আওয়ামী লীগ সরকারের প্রভাবশালী মহলের মদদে পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আমার বিরুদ্ধে ভাড়াটে লোক দিয়ে বানোয়াট কুৎসা ও বদনাম রটনা করতে শুরুদেয়।

তারা মওলানা ভাসানী হুজুরের কাছে গিয়েও আমার বিরুদ্ধে বানোয়াট কাহিনী বয়ান করে। একদিন আমি হুজুরের কাছে গিয়ে কদমবুচি করে দাঁড়ালে, হুজুর আমাকে বলেন, রহিম! তুমি মজিবরের কাছে মাপ চাও গিয়া।

আমি হুজুরের কথাটা শুনে থ'মেরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হুজুর কথাটা বলেছিলেন আমার ইমান পরীক্ষা করার জন্য কিনা, সেটা আমি বলতে পারবো না।

আমি যদি অপরাধী হয়েই থাকি, তাহলে শেখ মুজিবের কাছে যাবো কেন? আমি হুজুরের পা ধরেই তো মাপমুক্তি চাইতে পারি। আমি ভাসানী হুজুরের কদমবুচি তো হামেশাই করছি। কাজেই তাঁর পা ধরে মাপমুক্তি চাইতে আমার ইজ্জত হানির কোন কারণ থাকতে পারেনা।

মওলানা ভাসানী হুজুর আমার তরফ থেকে নীরবতা লক্ষ্য করে আর দ্বিতীয় কোনো কথা বলেন নাই। যে ব্যক্তি কারো পক্ষে বিপক্ষে কথা বলতে শুরু দিলে আর থামার নামটি করতেন না, তিনি আমাকে আর কিছু না বলে সম্পূর্ণ চুপচাপ ছিলেন। ইছায়ী ১৯৭১ সনের শেষ কয়টি মাসে কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজের ভাইস–প্রিন্সিপাল এবং ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল হিসাবে কতখানি ঝুঁকিপূর্ণ জিন্দেগী অতি বাহিত করেছি, আমার টাংগাইলের ইতিহাস থেকে তার বয়ান পেশ করছিঃ

সেই ১৯৭০ এর নির্বাচনের পরেই শুরু হলো ক্ষমতা হস্তান্তরের পালা। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের তৎকালিন মনোভাব দেখে মনে হয়েছিল, তিনি শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবেন। ১৯৭১ এর ১১, ১২ও ১৩ই জানুয়ারী এই তিন দিন শেখ মুজিবের সংগে আলাপ আলোচনা ক'রে করাচী যাত্রার প্রাক্কালে তেজগাঁও বিমান বন্দরে জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাংবাদিকদের বললেনঃ দেশের ভাবী প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিব তাঁর সংগে আলোচনা সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন, তা পুরো পুরি সঠিক।

কিন্তু দিন যতই যায়, পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশে সন্দেহ, অবিশ্বাস, ষড়যন্ত্রের মেঘ ততই ঘনিয়ে উঠতে থাকে। ঘোর প্রতিকুল অবস্থা আঁচ করতে পেরেই শেখ মুজিব ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে ঘোষণা করলেনঃ এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

অতঃপর আওয়ামী লীগ সুপ্রিম কমান্ড থেকে দেশব্যাপী ডাইরেকটিভ জারী করা শুরু হলো ! সেই ডাইরেকটিভ মোতাবেক সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন ব্যবসা

www.pathagar.com

বাণিজ্য ,স্কুল কলেজ, ব্যাংক বীমা,করপোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন কাউন্সিল– রাষ্ট্রীয় সর্বক্ষেত্রের শাসন কার্য পরিচালিত হতে লাগলো। পাকিস্তান সারকারের শাসন পদ্ধতি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে কার্যতঃ সম্পূর্ণ অচল হয়ে রইলো।

বিভাগীয় কমিশনার সাহেব, জেলার ডি·সি· সাহেব মহকুমার এস· ডি· ও· এস·পি, ডি·ও·এস, পি, থানার সার্কেল অফিসার, ওসি ব্যাংক বীমার ম্যানেজার এবং স্কুল কলেজের প্রধান প্রমুখেরা আওয়ামী লীগের নির্দেশ মোতাবেক নিজ নিজ দপ্তরের দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন।

তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও এমন কোনো অফিসারের সাক্ষাৎ মেলে নাই, যিনি একক প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগের নির্দেশ অমান্য করে পাকিস্তানের কেনদ্রীর শাসনের যোয়াল কাঁধে বহন করে তথাকথিত দালালীর কোনো নজির স্থাপন করেছিলেন। বরং সার্বিকভাবে আওযামী লীগের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে সকল স্তরের অফিসার ও কর্মচারীগণ আওয়ামী লীগের আন্দোলনের সহায়ক শক্তি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেছিল।

এই সময়ে টাংগাইল জেলায় গঠিত হলো সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। উক্ত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক হলেন জনাব বদিউজ্জামান খান। সদস্য হলেন জনাব শামসুর রহমান খান এ্যাডভোকেট,জনাব মাহবুবর রহমান মটু মিঞা,জনাব মির্জা তোফাজজল হোসেন মুকুল, অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদ,জনাব হাতেম আলী তালুকদার, জনাব আবদুল বাছেত সিদ্দিকী, জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক, জনাব সেতাব আলী খান এাডভোকেট, জনাব ইনছান আলী এ্যাডভোকেট, জনাব মোঃ খোদবক্স এ্যাডভোকেট,জনাব নূরুল ইসলাম এ্যাডভোকেট, জনাব আবদুর রশিদ খান এ্যাডভোকেট, জনাব হাবিবর রহমান মিঞা এ্যাডভোকেট, জনাব শওকত আলী তালুকদার, জনাব নইমউদ্দিন এ্যাডভোকেট, আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, কাদের সিদ্দিকী, খন্দকার আবদুল বাতেন,জনাব হবিবর রহমান মিয়া, জনাব জাবদুল হামিদ মিঞা, জনাব আবদুর রহমান, সৈয়দ আবদুল মতিন, মির্জা আসফ আলী চন্দন,আতিকুর রহমান খান ইউসুফজীসালু, আলিমুজ্জামান খান রাজু, জনাব আলী আজগর খান, হামিদুল হক মোহন, আলী আকবর খান, আলমগীর খান মিনু, এনায়েত করিম, মোয়াজ্জেম হোসেন, শামসুল হক, শামীম আল মামুন, বুলবুল খান মাহবুব, জনাব গোলাম নুরুন্নবী, জনাব মোহাম্মদ আলী মিঞা, আতাউর রহমান খান বালা; মোঃ আফছার আলী মিঞা, আতোয়ার রহমান, মুজিবর রহমান চৌধুরী এ্যাডভোকেট প্রমুখ নেতা ও ছাত্রনেতাগণ। প্রসংগত উদ্দেশ্য, এ সময় টাংগাইলের বিশিষ্ট নেতা সর্ব জনাব আবদুল মান্নান এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা শাহজাহান সিরাজ ঢাকায় কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদে শরিক ছিলেন।

সর্ব দলীয় সংগ্রাম পরিষদের সহায়ক শক্তি হিসেবে টাংগাইল জেলার শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিকদের সমন্বয়ে, শিল্পী সাহিত্যিক, সাংবাদিক সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হল। সেই সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হিসেবে এই গ্রন্থকার এবং সম্পাদক হিসেবে বুলবুল খান মাহবুব, সহসম্পাদক

www.pathagar.com

হিসেবে অধ্যাপক মাহবুব সাদিক নূরুল আমিন, সদস্য হিসেবে অধ্যাপক সায়্মাদ কাদির, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, সুবিনয় দাশ প্রমুখ টাংগাইল ক্লাবে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এন্তেজাম করেছিলেন। এই গ্রন্থকারের সভাপতিত্বে সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রখ্যাত গীতিকার ও সংগীত পরিচালক মরহুম লোকমান হোসেন ফকির অনেকগুলো জাতীয় উদ্দীপনামূলক সংগীত পরিবেশন করেছিলেন; আরো সংগীত পরিবেশন করেছিলেন তপন ভট্টাচার্য, শীলা ঘটক এবং মিসেস নিবেদিতা মন্ডরের নেতৃত্বে অন্যান্য স্থানীয় শিল্পীগণ।

৭১ এর ৯ই মার্চ তারিখে মওলানা ভাসানী সাহেব পল্টনের এক বিশাল জনসভায় বজ্রনিঘোর্ষে ঘোষণা করলেনঃ সাতকোটি বাংগালীর মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। তিনি অবিলম্বে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ৭ কোটি বাংগালীকে স্বাধীনতা দানের আহ্বান জানান। ঐ তারিখেই মওলানা ভাসানী সাহেব স্বাক্ষরিত একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়। তার শুরুতেই বলা হয়ঃ পাকিস্তানের বঞ্চিত জনসাধারণের প্রতি মওলানা ভাসানীর আহবান। পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন। ---আসুন, আমরা বজ্রকন্ঠে ঘোষণা করি যে, পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা, সার্ব ভৌমত্ব ও জনগণের হাতে গণতান্ত্রিক পূর্ণ ক্ষমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরণ সংগ্রাম করে যাবো।

মওলানা ভাসানী সাহেব ৭১এর ১০, ১১, ১২ই মার্চ পর্যন্ত মোমেনশাহী,খূলনা, রাজশাহীতে বিশাল জনসভায় আজাদ পূর্ব বাংলার স্বপক্ষে দারাজকন্ঠে ঘোষণা করেন। সেই সমস্ত জনসভায় লাখো মানুষের করতালীর মধ্যে ঘোষণা করেন,-লাকুম দ্বীনকুম ওয়ালিয়াদ্বীন; অর্থাৎ তোমাদের ধর্ম (পশ্চিম পাকিস্তানীদের) তোমাদের, আমাদের (পূর্ব পাকিস্তনীদের) ধর্ম আমাদের। তিনি সেই সব সভাতেই পাকিস্তানী শাসকদের "অ-আলাইকুম আচ্ছালাম"সম্ভাষন দিয়ে বিদায় বার্তা ঘোষণা করেন। লাখো কন্ঠের গনবিদারী হর্ষধ্বনির মাধ্যমে মওলানা ভাসানী সাহেবের সেই "অ-আলাইকুম-আচ্ছালাম"সমর্থিত হলো।

এই সময় জনাব নরুল আমিন, জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী,জনাব খান এ, সবুর, অধ্যাপক গোলাম আজম, জনাব আতাউর রহমান খান, পীর মোহসেন উদ্দিন প্রমুখ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষ স্থানীয় নেতাগণ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে কালবিলম্ব না করে পূর্ব পাকিস্তানে এসে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের সংগে একটা শান্তিপূর্ণ ফয়সালায় পৌছার জন্যে আকুল আহবান জানান। সেই বিবৃতিকারীদের মধ্যে জনাব খান এ, সবুর বলেছিলেন, পদ্মা মেঘনা যমুনায় বহু পানি গড়িয়ে গেছে,-আর বিলম্ব নয়। যত শিঘ্র সমভব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পূর্ব পাকিস্তানে (সাবেক) এসে ন্যায় সংগত উপায়ে ফয়সালায় পৌছতে হবে। অন্যথায় রাজনৈতিক ফয়সালার আর কোনো পথই খোলা থাকবেনা।

www.pathagar.com

২৬ শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি শহর জনপদে আওয়ামী লীগের বিরোধী মহলের প্রতিটি লোকই সেই মিছিলে শরীক হয়ে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানীদের দাবীর ন্যায্যতা প্রমান করেছিল। প্রেসিডেন্ট এহিয়া খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের মিলিটারী জান্তা নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে যতই টালবাহানা করেছে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের লোকেরা ততই দুর্বার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। আওয়ামী লীগের জন্য সাবেক পূর্ব পাকিস্তানীদের সেই সার্বিক একাত্মতা ইতিহাসের এক বিরল ঘটনা। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এমন নজির আছে যে, মাত্র পৌনে দু'কোটি ভোটারের ভোটে নির্বাচিত প্রতি নিধিদেরকে গদিতে বসাবর জন্যে দেশের সাড়ে সাতকোটি নরনারী পাহাড়ের মত ঐক্যগড়ে তোলে। কিন্তু দেশ প্রেমিক তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তনীরা পৃথিবীর সেই বিরল ইতিহাস পয়দা করেছিল।

১৯ শে মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আগমন করলেন শেখ মুজিবের সংগে একটা শাসনতান্ত্রিক ফয়সালায় পৌছার উদ্দেশ্যে। ২৩ শে মার্চ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দলবলের সংগে শেখ সাহেব, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মোঃ মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও ডঃ কামাল হোসেনকে নিয়ে বৈঠক করছিলেন। সেই বৈঠকে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আশায় সাড়ে সাতকোটি জনসাধারণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দিন গুজরান করছিল।

২২ শে মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো সাহেব পূর্ব পাকিস্তান আগমন করলেন তাঁর দলবল নিয়ে। তার পূর্বেই হাজির হয়েছিলেন মওলানা মাহমুদ, মিঞা মমতাজ দৌলতানা এবং ওয়ালী খান প্রমুখ। তাঁরাও শেখ সাহেবের সংগে শাসনতান্তিক সংকট মোচনের উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।

শেখ সাহেবের সংগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বৈঠক দিনের পর দিন চলছিল। প্রতি বৈঠকের পরই শেখ সাহেব অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে,বৈঠক সন্তোষ জনক ভাবেই এগিয়েচলছে।

এই অবস্থার মধ্যে ২৩ শে মার্চ মওলানা ভাসানী সাহেব পল্টন ময়দানে এক বিশাল জন সভায় "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের" ঘোষনা জারী করে এক অনল বর্ষী বক্তৃতা দান করেছিলেন। তাঁর সেই বক্তৃতা মঞ্চে মরহুম মশিয়ুর রহমান, আলি আহাদ, আজাদ সুলতান প্রমুখের সাথে বাংলাদেশের সাবেক উজিরে আজম শাহ আজিজুর রহমান হাজির থেকে সভাকে অনন্য সাফল্যে ভূষিত করেছিলেন। হুজুর ভাসানী সাহেবের বক্তৃতার শেষে একদল ছাত্র নেতা শেখ সাহেবের বাসায় হাজির হয়ে তাঁর হাত দিয়ে "স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা" উত্তোলন করিয়েছিলেন।

২৫ শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে (Martial law Administration, Zone B) লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে সামরিক প্রশাসক নিয়োগ করে বিনা নোটীশে ঢাকা থেকে রাওয়ালপিন্ডি পাড়ি জমিয়েছিলেন। সামরিক

www.pathagar.com

প্রশাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খান ঐ দিন রাত্রেই এক ফরমান বলে স্কুল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষনা করেছিলেন।

২৬ শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করেছিলেন এবং সেই ফরমানের মধ্যেই আওয়ামী লীগকেও বাতিল ঘোষনা করেছিলেন।

২৮ শে মার্চ টাংগাইল জেলার সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ভেংগে দিয়ে আরো ব্যাপক ভিত্তিতে হাই কমান্ড বা বিপ্লব কমিটি গঠিত হলো। সেই হাই কমান্ড টাংগাইল জেলা শাসন করতে আরম্ভ করলো। ডি,সি, এ,ডি, সি, এস, পি, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যাংক ম্যানেজার, অধ্যক্ষ, হেডমাষ্টার প্রমুখ সকল সরকারী ও বেরসকারী কর্মকর্তাকে হাই কমান্ডের কাছে কাজে যোগদানের রিপোর্ট করতে নির্দেশ দেওয়া হলো।

৩০ শে মার্চ টাংগাইন্দের ডি,সি, জনাব জালার উদ্দিন আহম্মদ (সাবেক সি, এস,পি,) প্রমুখকে গেরেফতার করে হাই কমান্ড অফিসে আনা হলো। সাবেক এ, ডি,সি, জনাব মাহমুদ হাসান ছিলেন সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের বাশিন্দা। এ সময় কতিপয় সংগ্রামী যুবক স্থানীয় বাংলাদেশ ক্ষুদ্রকুটির শিল্প সংস্থা বা বি'সি, কের একজন নিরীহ রিফিউজি দারোয়ানকে নির্মমভাবে জান কবজ করলো।আরো কয়েকজন রিফিউজি দক্ষ শ্রমিককে বিভিন্ন জায়গা থেকে পাকড়াও করে এনে জীবন -মৃত্যুর সন্ধিক্ষনে ফেলে রাখলো। এমতাবস্থায় খাস পশ্চিম পাকিস্তানের বাশিন্দা এ,ডি, সি, জনাব মাহমুদ হাসানের জন্য মানবদরদীদের অন্তর কেঁপে উঠলো। জনাব মাহমুদ হাসান টাংগাইলে কার্যকালে দরদী হৃদয় দিয়ে এদেশের মাটি ও মানুষকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। তাঁর জীবন-নাশ হলে আল্লাহ্‌র জমিন থেকে ইনছাফ উঠ যাবে বলে অনেকেই ভাবতে লাগলেন; কিন্তু ঘাপটি মেরে থাকা মতলব বাজদের খুনের নেশা লক্ষ্য করে কেউ আহা-উঁহু উচ্চারণ করতে সাহস পেলো না।

পাকিস্তানের সাবেক এম,এন,এ, প্রখ্যাত আইনজীবি ও শীর্ষ স্থানীয় মুসলীম লীগ নেতা খন্দকার আবদুস সামাদ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র ব্রিলিয়ান্ট সি, এস, পি, অফিসার খন্দকার আসাদুজ্জামান মঞ্জু সাহেব প্রয়োজনের মুহূর্তে টাংগাইল জেলার হাই কমাণ্ডে শরীক হলেন। তিনি তাঁর বিপুল কর্মদক্ষতা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে হাই কমান্ডকে বাস্তব ভিত্তিক প্রতিরোধ ঘাটি হিসেবে গড়ে তোলার কোশেশ করতে লাগলেন। তাঁরই মধ্যস্থতায় পশ্চিম পাকিস্তানের বাশিন্দা এ, ডি, সি, মাহমুদ হাসান সাহেব প্রাণে বেঁচে গেলেন। ডি, সি, ও এস, পি, সাহেবদ্বয় হাই কান্ডের হুকুম তামীল করার ওয়াদার ভিত্তিতে মুক্তি লাভ করলেন। তার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ডি, সি, এবং এস, পি, সাহেবদ্বয় তাদের জীবনের নিরাপত্তার অভাব বুঝতে পেরে আত্মগোপন করলেন।

www.pathagar.com

৩রা এপ্রিল বিপুল বিক্রমে মেসিনগান, মর্টার ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলি নিক্ষেপ করতে করতে পাক বাহিনী টাংগাইলের পথে অগ্রসর হলো। টাংগাইলের হাই কমান্ড প্রেরিত অগ্রবর্তী বাহিনী নাটিয়া বাড়ীর কাছে পাক বাহিনীকে প্রতিরোধের কোশেশ করলো। পাক বাহিনীর আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জামের পাল্লায় মুক্তি বাহিনী বহুক্ষণ টিকে থাকলেও আখেরে তারা ছত্রভংগ হয়ে গেল।

পাক বাহিনী টাংগাইলের পথে অগ্রসর হওয়ার সময় দুটো জীপ বোঝাই একদল সশস্ত্র ব্যক্তি টাংগাইলের সোনালী ব্যাংক লুট করার জন্য বেপরোয়া উদ্যোগ গ্রহণ করলো। কিন্তু ব্যাংকের ষ্ট্রংরুম ভাঙ্গার কায়দা কসরত করতে করতেই পাক বাহিনী টাংগাইল শহরে প্রবেশের খবর ছড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে সেই সশস্ত্র লোকেরা তড়িঘড়ি জীপে আরোহন করে লা-পাত্তা হয়ে গেল।

টাংগাইল শহরে পাক বাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ্য করে না হক হত্যা লীলা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে অফিসে অফিসে ঘরে ঘরে পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে দিতে দেখা গেল।

১৯ শে এপ্রিল টাংগাইলের ডি,সি, জনাব জালাল উদ্দিন আহমেদ (সাবেক সি, এস,পি,) ও এস,পি, সাহেবদ্বয় পাক বাহিনী কর্তৃক নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে আত্মগোপন অবস্থা থেকে ফিরে এসে কাজে যোগদান করলেন। তাদের দুজনের কাজে যোগদানের সংবাদে টাংগাইলের জনমন থেকে শংকার ভাব কেটে গেল।

ইতিপূর্বে টাংগাইল জেলায় পাক বাহিনী দখল জমিয়ে তোলার পর থেকেই হাই কমান্ডের লোকরা উধাও হয়ে গেছেন। তাঁরা নানা পথে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেল। এদিকে পাকবাহিনীর লোকেরা হাই কমান্ডের লোকজনদের তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু কারো সন্ধান মিললো না। তারা পাকড়াও করতে লাগলো সাধারণ জনতাকে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনতা পাক বাহিনীর হাতে নানাভাবে হয়রান হয়ে ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে লাগলো।

হুজুর ভাসানী সাহেব মিলিটারী অপারেশন দেখে কখনো আত্মগোপন করতে জানেন নাই। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার অভ্যাস তাঁর চরিত্রের বরখেলাপ কাজ। কিন্তু পাকবাহিনীর হটকারী অভিযান লক্ষ্য করে তিনি সন্তোষ থেকে সাত তাড়াতাড়ি বিন্নাফৈর গ্রামের দিকে সরে গেলেন। পাক বাহিনী সন্তোষে নেমেই হুজুর ভাসানী সাহেবের ক'খানা ছোনবনের ঘর ও এক খানা টিনের ঘরসহ বাস্তভিটা পুড়িয়ে খাক করে দিল। তিনি বিন্নাফৈর থেকে পাক বাহিনীর সেই বেওকুফী উম্মত্ততার খবর পেলেন।

তার পরের কয়েক দিন হুজুর ভাসানী সাহেব বিন্নাফৈর গ্রামের বাড়িতে অস্থিরভাবে দিন কাটাতে লাগলেন। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি জানতে পেরে তিনি উৎকণ্ঠায় দিনরাত্রির ঘুমও ভুলে গেলেন। কার কাছে যে পাকবাহিনীর উম্মত্ততার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে টেলিগ্রাম রেডিওগ্রাম করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন,তাঁর মত একজন জননেতাও সেসময় সেটা ঠাহর করতে পারলেন না। জনগণ তার কাছে ছুটে এসে এতকাল যেমন ফরিয়াদ জানিয়েছে, তেমনি ফরিয়াদ জানাতে লাগলো। কিন্তু হুজুর ভাসানী সাহেব সে সব অভিযোগ শুনে পাথরের মত চুপ করে থাকতে বাধ্য হলেন। ঢাকা থেকে যে সমস্ত জেনারেল তাঁর প্রিয় দেশ ও দেশবাসীর উপর বেপরোয়াভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাদের হুশজ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের কাছে প্রতিকারের যেকোনো বানী ব্যর্থ হতে বাধ্য। তিনি জনগণকে বুঝাতে লাগলেন, জালীমের জুলুমের দিন ঘনিয়ে এসেছে, তাই তারা মরীয়া হযে শেষ মরন কামড় দিচ্ছে। জনগন সবুর করো; আল্লাহ্ তায়ালা কখনো জালীমকে সহ্য করেন না।

কয়েক দিন পর পাক বাহিনী বিন্নাফৈর গ্রামের দিকে হানা দিল। সেদিনের অভিযানও একইরূপ সামরিক কায়দাতেই চলছিল। হুজুর ভাসানী সাহেব যখন দেখলেন, তাঁর সাথে কোনো পাকিস্তানী জেনারেল দেখা করতে না এসে যুদ্ধংদেহীভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সেন্য লেলিয়ে দিয়েছে, তখন তিনি বিন্নাফৈর গ্রাম থেকে সরে গিয়ে যমুনা নদীতে ভাড়া করা নৌকায় আশ্রয় নিলেন। পরে সময় ও সুযোগ বুঝে তিনি যমুনা নদীর উজান বেযে সীমান্তের ওপারে মাইনকার চরে গিয়ে হাজির হলেন। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিই পাক বাহিনীর সেই চরম হটকারিতাকে কস্মিনকালেও সমর্থন জানাতে পারেন নাই। বরং তারা মনে ক'রে রেখেছ, পৃথিবীর যে কোনো বিপর্যয়কর পরিনতির ইতিহাসে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য বেওকুফী আছে,-তারই একটা উজ্জল নতিজা হচ্ছে পাকবাহিনী কর্তৃক ভাসানী সাহেবকে তাড়া করে ফেরা। মওলানা ভাসানী সাহেবকে তাজীমের সংগে দেশের মধ্যে না রেখে অমর্যাদাকর পন্থায় তাড়া করে ভারত সীমান্তে ঠেলে দেওয়া পাকিস্তানী নেতাদের রাজনীতির ও যুদ্ধনীতির চরম দেউলিয়াত্বই প্রমাণ করেছিল। পূর্ব বাংলার গ্রামে গঞ্জে শহর বন্দরে পাকবাহিনীর প্রতি দরদ হ্রাস পেয়েছিল। সেই দরদ লাভ করেছিল মুক্তিবাহিনীর তরুন যুবকেরা।

পাকিস্তানের যুদ্ধনীতির ইতিহাসে ভ্রান্ত পদক্ষেপের কোনো কথা লিখতে গেলেই অত্যন্ত উজ্জ্বল হরফে লিখে রাখতে হবেঃ ৭১ সনে মওলানা ভাসানী সাহেবের প্রতি পাক বাহিনরি চরম হটকারিতা। যে সমস্ত যুদ্ধবাজ জেনারেল বাপভাইয়ের নাম জানে না, তাদের পক্ষে হয়ত বা মওলানা ভাসানী সাহেবকে না-চেনার ভান করা সাজে। কিন্তু পাকিস্তানের জেনারেলগণ যারা ১৯৬৫ সনে পাক ভারতীয় যুদ্ধে মওলানা ভাসানী সাহেবের উদাত্ত কন্ঠ স্বরে দমকে দমকে উচ্চকিত হয়েছিল, তাঁরা এত তাড়াতাড়ি তাঁকে ভুলে গেলেন কোন্ বেওকুফীর কারনে, সেটা অনন্তকাল জিগ্‌গাসা হয়ে থাকবে!

টাংগাইল জেলা দখলের জন্য যে সমস্ত সৈন্যের উপর ভার পড়েছিল, যে সমস্ত নায়ক সেই সৈন্যদেরকে পরিচালিত করেছিলেন, তারা পরবর্তী কালে ভারতীয় কারাগারে পঁচে পঁচে তাদের হটকারিতার মাশুল কতটা দিয়েছে সেটা আল্লাহ মালুম।

www.pathagar.com

কিন্তু এদেশের জনগণ ঠিকই বুঝেছিল। যে ভাসানী সাহেব এক সময় পাকিস্তান কায়েমের জন্য জান কবুল সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁরই যখন ইজ্জত রইলোনা, তখন ফেদু-নেদু উল্লাহ উদ্দিন কারোই ইজ্জতের বালাই থাকতে পারে না।

রাখে আল্লাহ্ মারে কে, -এ কথা ভাসানী সাহেবের কাছে শোনে নাই,-এমন লোক খুব বিরল। ভাসানী সাহেবকে পাক বাহিনী রক্ষা করতে চায় নাই, কিন্তু আল্লাহ তাকে হেফাজত করেছে।তাই পরবর্তী ইতিহাসে দেখা গেছেঃ যখন পাক বাহিনী ভারতীয় জেলে, তখন মওলানা ভাসানী সাহেব তাঁর সেই প্রিয় আস্তানা সন্তোষের নরম মাটির কোমল কোলে বিজয়গর্বে সমাসীন।

পাক বাহিনীর অফিসারগণ সাবেক পূর্ব পাকিস্তান দখলের প্রথম ধাক্কা সামলে ওঠার পরই উপলব্ধি করতে পারলো- যদিও ভূমি দখল বিনা বাধাতেই সম্পন্ন হলো,কিন্তু দেশের জনগণের মন দখল হয় নাই এখন পর্যন্ত। তাই আস্তে আস্তে শুরু হলো মন দখলের পালা।

পাক বাহিনীর ভালো ভালো অফিসার বিভিন্ন জেলার সামরিক শাসক হিসেবে এসে আরম্ভ করলেন জনসংযোগ। তাঁরা পাবলিকের সাথে খোশ মেজাজে মেলামেশা ক'রে তাদের অসুবিধাগুলোর আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। পাবলিকের মনে আস্থা ফিরে আসতে লাগলো।

পাবলিকের মুখপাত্র হিসেবে দাবীদাওয়া অভাব-অভিযোগ জুলুম অত্যাচারের প্রতিকার লাভের উদ্দেশ্যে জেলা, মহকুমা, থানা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে ব্যাপকভাবে শান্তি কমিটি গঠিত হলো। স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ ডি,সি,এস,ডি, ও, সার্কেল অফিসার এবং ও'সি'দের সভাপতিত্বে গঠিত সেইসব শান্তি কমিটি মারফত জনগনের জানমাল হেফাজত, ইজ্জত মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার দাবীগুলো প্রস্তাবাকারে লিপিবদ্ধ করে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হতে লাগলো। তার ফলে ৭১ এর জুন জুলাই মাসের মধ্যেই জনমনে অনেকটা স্বস্তির ভাব লক্ষ্য করা গেল।

এদিকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বুকে স্বস্তির ভাব লক্ষ্য করে কিছু কিছু আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য দেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলেন। কেউ হয়ত সীমান্তের ওপারে পালিয়ে গিয়েছিলেন, কেউ হয়তো দেশের অভ্যন্তরেই আত্মগোপন করে ছিলেন,-এমন সকল সদস্যই আত্ম প্রকাশ করে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের কাছে আনুগত্য জাহির করলেন।

অবস্থা বহুলাংশে অনুকূল দেখে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসক দেশে উপনির্বাচন ঘোষণা করলেন। ২৫ শে অক্টোবরে অনুষ্ঠিত সেই উপনির্বাচনে ভারতে হিজরত কারী আওয়ামী লীগ দলীয় ৭২ জন সদস্যের শূন্য আসনে কেহবা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে,কেহবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচিত হলেন।

নির্বাচনের পূর্বে ৩রা সেপ্টেম্বর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ডাঃ মালিককে গবর্ণর নিযুক্ত করে বেসামরিক সরকার চালুর বন্দোবস্ত হয়েছিল। ডাঃ মালিক সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের একজন শ্রদ্ধেয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। তাঁর নেতৃত্বে বেসামরিক সরকার

www.pathagar.com

দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে পারবেন বলে বহু মহল থেকেই আশাবাদ ব্যক্তহলো।

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর ডাঃ মালিকের নেতৃত্বে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার যখন প্রশাসনিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ব্যবসা, বানিজ্য, ব্যাংক, বীমা, কলকারখানা,বাস রেলগাড়ী –ষ্টিমার লঞ্চ পূর্ববৎ চালু রাখার ব্যাপারে কামিয়াবী হাসিল করেছিলেন; সে সময় কলিকাতা দিল্লীর হোটেলে হিজরতকারী নেতাদের অনেকেই Woman,wine and wealth নামক মোহময়ী 'থ্রী ডব্লিউ' এর নাগপাশে আত্মসমর্পন করে কেহবা রাস্তায়, কেহবা নর্দমায় গড়া গড়ি দিয়ে স্বর্গসুখের চূড়ায় বিহার করছিলেন। তাদের সামনে দেশোদ্ধারে উৎসর্গকৃত মুক্তিযোদ্ধাগণ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দান করতে থাকলে, তারা বোবার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছে। খাও; দাও, মজা লোট, –তাছাড়া কিছু করার নাই,তারা ঢক্ ঢক্ ক'রে আরেকপাত্র গলাধঃকরন করতো। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের নছিব পান পাত্রে নিঃশেষ করার জন্যেই যেন তারা মাতোয়ারা। যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাদের হিজরত, সে উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবনা করার ভার পড়ে রইলো ইন্দিরা সরকারের গর্দানে; আর পড়ে রইল সাবেকপূর্ব পাকিস্তানে মাটি কামড় দিয়ে পড়ে থাকা সাড়ে ছয় কোটি জনগনের নছিবের উপর।

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের নছিব ভালো যে, উপযুক্ত সময়ে তারা বুদ্ধি হারা হয় নাই। তারা এদেশটা ছাড়খার হওয়ার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই গড়ে তুলেছিল মল্লায় মহল্লায় শান্তি কমিটি।

শান্তি কমিটিতে যারা সদস্য হলেন, তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের ভিতরে সামরিকবাহিনী কর্তৃক সন্ত্রাস সৃষ্টির মোকাবিলা করা, বেপরোয়া হত্যা লীলা রদ করা। নিজেরাও বেঁচে থাকা, অপরকেও বাঁচতে দেওয়া –এই ছিল শান্তি কমিটির মূল উদ্দেশ্য। কেননা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের অভিপ্রায় নিয়ে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা সীমান্তের ওপারে ইন্দিরা সরকারের ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছিলেন,তারা যে দেশটা মিলিটারীর মুখে অরক্ষিত রেখে গেলেন, এটা নিয়ে তর্কবাহাছ করা কিংবা মাতম করার কোনো ফুরসুত তখন ছিল না। নিজের নিজের বাস্তভিটাতে মাটি কামড় দিয়ে পড়ে থেকে শুধু জানে বেঁচে থাকলেই চলবে না; এদেশটা আমাদের, এদেশের বুকে বাস করার হক কেউ কেড়ে নিতে পারবে না –এই অধিকার আদায় করা ছিল তখন মূখ্য ব্যাপার। কেননা, সাড়ে সাত কোটি অধিবাসীর মধ্যে মাত্র কোটি খানেক লোক সীমান্তের ওপারে হিজরত করেছে, বাদবাকী সাড়ে নয় কোটি লোক দেশের মাটিতেই আছে;–তাদের জানমালের একটা হেফাজত তো দরকার!

পাক বাহিনী যখন টাংগাইল জেলার বিভিন্ন স্থানে ধরপাকড় করতে লাগলো, তখন শান্তি কমিটি প্রথম দিকে দেন দরবার করে একটা সুরাহা করতে চেষ্টা করলো; পরে জনগণের সুবিধার্থে পাক বাহিনীর সংগে ফয়সালাক্রমে আইডেন্টিটি কার্ড দিতে

www.pathagar.com

আরম্ভ করলো। সাধারণভাবে সেই আইডেন্টিটি কার্ডকে বলা হতো ডান্ডি কার্ড। মিলিটারীর লোকেরা সেই ডান্ডি কার্ড দেখে তরুণ যুবক ছাত্র শিক্ষক শ্রমিক মজুর ব্যবসায়ীকে অবাধে চলাফেরা করার অধিকার দিল। কাগমারী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে আমি যে ঢালাওভাবে কতো ডান্ডি কার্ড দিয়েছিলাম, তার কোনো শুমার ছিলনা।

যে দেশে রাজনৈতিক লন্ডভন্ড ব্যাপার ঘটে গেছে, সে দেশে জানমালের হেফাজতের জন্য শান্তি কিমিটি কর্তৃক ডান্ডি কার্ডের প্রচলন একটা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এই ডান্ডি কার্ডের প্রচলনের ফলে স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কলকারখানা রেল-ষ্টিমার বাস প্রভৃতিতে মানুষের চলাফেরা নিরাপদ হতে পেরেছিল। বর্তমানে দেশের যে সমস্ত নামীদামী এলেমদার ব্যক্তি " দালাল খেদাও"জজ্‌বা ধরে বেচইন হয়ে পড়েন, তারাও সেই আমলে সেই ডান্ডি কার্ডের বদৌলতেই বহাল তবিয়তে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জমিনে পদচারনা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই শরমের কথা দেশবাসী যাতে টের না পায়, সেই উদ্দেশ্যে দালাল নিধন করার আওয়াজে তাদের কন্ঠেই আবার জোশ বেশী।

সেই ডান্ডি কার্ড প্রচলনের ফলে গ্রামেগঞ্জে শহরে বন্দরে মুক্তিযোদ্ধারা অবাধে চলাফেরার সুযোগ পেল। শান্তি কমিটির সদস্যগণ ডান্ডি কার্ড দেওয়ার সময় খুব যে বাছবিচার করতেন, এমন দেখা যায় নাই। সামান্য পরিচয়ের সূত্র ধরেই ডানিড কার্ড বিতরণ করতেন। তার ফলে ডান্ডি কার্ড সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে দেশের মধ্যে বিচরণ করা সহজ হয়ে গেল। সীমান্তের ওপারে গিয়ে অল্প ক'দিন সামরিক ট্রেনিং নিয়ে দেশের মধ্যে এসে শান্তিকমিটির কোনো একজন প্রভাবশালী সদস্যের নিকট থেকে ডান্ডি কার্ড সংগ্রহ করে হাজার হাজার তরুণ যুবক অবাধে চলাফেরা করার সুযোগ পেয়েছিল। এই সুবিধার বিষয়টা সীমান্তের ওপারেও আলোচিত হতো। এমনকি পাক বাহিনী এ দেশীয় বেকার যুবকদের রুটিরুজির ভরসা দিয়ে যে রাজাকার, আলবদর, আল-শামস্ নামক আধা সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছিল,-তার মধ্যে শান্তিকমিটির সার্টিফিকেটের জোরে বহু মুক্তিযোদ্ধা অনুপ্রবেশ করেছিল,-এ ব্যাপারটাও তখন কারো অজানা ছিল না।

কিন্তু পরবর্তী কালে শান্তিকমিটির ভূমিকার চরম অপব্যাখ্যা করা হয়। অবশ্য তার মূলেও ছিল বিশেষ একটা রাজনৈতিক মতলব।

এ দেশের তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে শান্তি কমিটির সদস্যদের ছত্রছায়ায় দিনে দিনে সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছিল, এমনকি পাক বাহিনীর সহায়ক শক্তি রাজাকার, আলবদরের মধ্যে ও প্রচুর পরিমাণে ভেজাল ঢুকিয়ে ফেলেছিল, এবং ক্রমে ক্রমে এদেশের বুকে পাকবাহিনীর জন্য একটা অস্বস্তিকর অবস্থা পয়দা করেছিল, তাতে ক'রে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের ভিত্তি এ দেশের অভ্যন্তরেই পয়দা হয়ে গিয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ কারণে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, এভাবে আরো

www.pathagar.com

কিছুকাল চলতে থাকলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে গ্রামে গঞ্জে নগরে বন্দরে ছড়িয়ে থাকা তরুণ যুবককেরাই এক সময় পাক মিলিটারীকে প্রতিরোধ করতে রুখে দাঁড়াতো এবং আখেরতক আজাদী ছিনিয়ে আনতে পারতো।

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতেই মুক্তিযোদ্ধাগণ পেয়েছিল আসল সহায়। বেঙ্গল রেজিমেন্ট অর্থাৎ বঙ্গ'শার্দুলের বেশ কয়টি ইউনিট,ই·পি·আর·, বি·ডি· আর·ও পুলিশ বাহিনীর বেশ কয়টি ইউনিট পাক বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। মরহুম প্রেসিডেন্ট মেজর জিয়া যে বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী ইউনিটের একজন কর্মকর্তা ছিলেন, –এ কথা কে না জানে। তিনি যে আজাদী ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সকল বিচ্ছিন্ন বাহিনীকে ডাক দিয়েছিলেন,–এটাও সকলের অজানা ছিল না। পাক বাহিনীর ঐসব বিদ্রোহী সৈনিক ও কমান্ডারগণ ছিলেন তরুন মুক্তিযোদ্ধাদের দিশারী।. পাকবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কমান্ডারের জন্য সীমান্তের ওপারে গিয়ে স্বল্প কালিন ট্রেনিং গ্রহণের প্রয়োজন ছিলনা। পূর্ব থেকেই তাদের উচ্চতর ট্রেনিং ছিল;তাছাড়া তারা যখন বিদ্রোহ ক'রে পাকবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন; তাঁরা একদম খালি হাতে মাঠে নামেন না। পাকবাহিনীর যে সমস্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম তাদের দখলে ছিল, সেগুলো নিয়েই তারা নিরাপদ স্থানে ঘাটি গড়ে তুলেছিলেন।

তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে ফিরে এসে যে, দুটো সহায়কশক্তির ছত্রছায়ায় দিনে দিনে বাড় বারন্ত হচ্ছিল তার প্রথমটি হচ্ছে পাকবাহিনীর সেই বিদ্রোহী গ্রুপ; এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাদেরই আত্মীয় স্বজন দ্বারা গঠিত শান্তিকমিটির সদস্য বৃন্দ।

ঐতিহাসিক সত্য রক্ষার খাতিরে বলে রাখা ভাল যে, শান্তিকিমিটি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ বাসিন্দাদের জানমালের হেফাজতে যে ভূমিকা পালন করেছিল, আজাদী হাসিলের পরে রাজনৈতিক মতলব বাজেরা তাকে ভিন্ন অর্থে দেখাবার কোশেশ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে সেই মতলব বাজদের পাঠানো সংবাদ অনুযায়ী স্বাধীন বাংলা বেতারে শান্তিকমিটির বিরুদ্ধে দালালীর অভিযোগ তোলা হয়েছে। এবং দালালীর জন্য চরম খেসারতও দিতে হবে বলে হুশিয়ারীও দেওয়া হয়েছে। ৭১ এর ডিসেম্বর থেকে ৭৫ এর আগষ্ট পর্যন্ত শান্তিকমিটির সদস্যদেরকে দালাল হিসাবে যত রকমে শায়েস্তা করা সম্ভব, সবকিছুই করা হয়েছে।

তবে একথাও সত্য যে, শান্তি কমিটির মধ্যে কিছু কিছু মতলব বাজ ছিল। দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের সকল দলের ভিতরেই কিছু না কিছু মতলব বাজ থাকেই। মুক্তিবাহিনীর ভিতরও কিছু কিছু জেল পলাতক জাঁহাবাজ দাগী আসামী কিংবা খুনী ব্যক্তি ছিল; সেই সংগে তাদের মধ্যে বিশেষ মতলববাজও ছিল। যাদের উদ্দেশ্য ছিল নিরীহ জনগণকে নিংড়িয়ে মোটা রকমের তহবিল বাগিয়ে নেওয়া। মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ারটাই তাদের কাছে কাম্য ছিল ; মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা তাদের মধ্যে কিছুমাত্র ছিল না। তেমনী শান্তিকমিটির মধ্যে কিছু কিছু মতববাজ ছিল, যারা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য

www.pathagar.com

পাক বাহিনীর ছত্রছায়ায় আখের গুছিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সেই ধরনের লোক জনগণের কাছে চিহ্নিত ছিল। দেশের প্রচলিত আইনে তাদের কবীরা গুনাহর ন্যায্য বিচার হলে জনগণ খুশী হতো।

কিন্তু শান্তিকমিটির বৃহত্তর অংশ যারা সাধ্য মতো নিরীহ মানুষের খেদমত করেছে, সাধ্যমত মুক্তি সেনাদের সাহায্য দান করেছে, যাদের উদ্দশ্য ছিল, নিজে বাঁচে, অপরকেও বাচতে দাও; তারা কখনো ভাবতেও পারে নাই যে, নগন্য সংখ্যক মতলবাজদের সংগে ঢালাও অপরাধে তারাও অভিযুক্ত হবে এবং দালাল হিসাবে রাষ্ট্রের নিকৃষ্টতম শাস্তির শিকার হবে।

কিন্তু ভারত থেকে ফিরে আসা হাজী গাজীদের ভিতর প্রচ্ছন্ন ভাবে লুকিয়ে থাকা কিছু কিছু মতলব বাজদের প্রপাগানডার বরকতে শান্তি কমিটির সদস্যদের উপরে ঢালাওভাবে দালালীর অভিযোগ খাড়া করা হয় এবং তাদের ভোটাধিকার হরনসহ যাবতীয় শাস্তি হয়রানীর বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করা হয়। শান্তি কমিটির সদস্যদের সংগে আওয়ামী লীগারদের সম্পর্ক দাঁড়ায় ভাশুর ভাদ্র বৌয়ের মত অর্থাৎ মুখ দেখা-দেখি নাজায়েজ।

আওয়ামী লীগের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী মতলবাবজদের কণ্ঠে হরদম মাতম আহাজারী শোনা যায় শান্তি কমিটির সকল সদস্যদের বিরুদ্ধেই। সরকার কেন সকল শান্তিকমিটির সদস্যকে পাইকারী নিধন করছে না, এই আহাজারিতে সর্বদা তাদেরকে বেচইন দেখা যায়।

একথা কে না জানো যে,ছয়কোটি লোক ভারতে হিজরত না করে বাংলাদেশের মাটি কামড় দিয়েই পড়ে ছিল। এবং সেই ছয় কোটি লোকের বৃহত্তর অংশ শান্তিকমিটির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল; কেই ছিল প্রাদেশিক শান্তিকমিটিতে, কেউ ছিল জেলাশান্তিকমিটিতে, কেউ ছিল মহকুমার, থানা, ইউনিয়ন, এমনকি গ্রাম্য শান্তিকমিটিতে। সেই সমস্ত শান্তিকমিটি কিভাবে গঠিত হয়েছিল সেকথাও ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু আওয়ামী নেতারা শান্তিকমিটি গঠনকারী সরকারী কর্মকর্তাদের গুনাহ্খাতা মাপ করলেও বেসরকারী লোকদের গুনাহ্খাতানা মঞ্জুর করে কঠোরতম সাজা দানের উছিলা খাড়া করেছিলেন। সম্ভবতঃ ভারতে হিজরত বাসকালেই তাদের মগজে চুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, শান্তিকমিটির লোক মানেই দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ; আওয়ামী লীগ মানেই ভারতীয় কংগ্রেসের পাকিস্তানী সংস্করণ। কাজেই দুটো জিনিস পরস্পর বিরোধী। হয় দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসীরা থাকবে, নয়, অখন্ড ভারতের বিশ্বাসীরা থাকবে। এক ঘরমে দো-পীর,-কিছুতে খাপ খাবে না। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, এই সব কারণেই শান্তিকমিটিয় সদস্য অর্থাৎ যারাই দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী তাদের বিরুদ্ধে ঢালাও অপপ্রচার চালানো হয় এবং তাদের খতমের জন্য বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করা হয।

www.pathagar.com

পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, ৭১ এর নয় মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের যে রূপরেখা গড়ে উঠেছিল, তাতে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক জান্তার সংগে মোকাবিলায় একদিন চূড়ান্ত ফয়সালা হয়েই যেতো। বাংলাদেশের আজাদী কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারতোনা। দুদিন পরে হলেও আজাদ বংলাদেশছিলঅবধারিত।

কিন্তু আওয়ামী লীগের দেশত্যাগী সদস্যগণ তড়িঘড়ি ইন্দিরা সরকারের কাছে দাসখত লিখে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সম্প্রসারণ ও আধিপত্যবাদের কালো অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন বলে যে বদনাম জাহির করা হয়, সেটা একদম ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, পরবর্তী ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে সেটাকে নাহক বদনাম বলা মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায়।

আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে বেগম ইন্দিরা গান্ধী মস্কো ছুটে গেলেন। ৯ই আগষ্ট সোভিয়েট পরাশক্তির সংগে বিশ বছরের মৈত্রীচুক্তির ছদ্মাবরনে সম্প্রসারণ নীতির একটি নীল নক্শা চূড়ান্ত করলেন।

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামে গঞ্জে মুক্তি বাহিনীর নওজোয়ানেরা সংঘবদ্ধ হতে শুরু দিল। নভেম্বরের শেষের দিকে গ্রাম অঞ্চল মুক্তিবাহিনীর নওজোয়ানদের দখলে চলে গেল। তবে মুক্তিবাহিনীর কোনো সুষ্ঠু প্রশাসন পদ্ধতি গড়ে না ওঠার ফলে গ্রাম অঞ্চলের জীবন ধারায় পাকিস্তানী প্রশাসন পদ্ধতি চালু থেকে গেল। খাজনা ট্যাক্স আদান-প্রদান,ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকের লেনদেন যেমন ছিল তেমনি চলতে লাগলো। মাঝে মাঝে গ্রাম অঞ্চলের কোনো কোনো এলাকায় মুক্তিবাহিনীর জমায়েতের সংবাদ পেয়ে পাকবাহিনী দলে দলে গিয়ে গোলাগুলি শুরু দিত। মুক্তিবাহিনীর দামাল নওজোয়ানেরা খানিকক্ষন ফাঁকাগুলি বর্ষন করে কোনো একদিকে হাওয়া হয়ে যেতো। সংগে সংগে খবর ছড়িয়ে পড়তো যে, সাংঘাতিক একটা লড়াই হয়ে গেছে।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের লড়াই চলতে চলতেই ডিসেম্বর এসে গেল। ৩রা ডিসেম্বর রাত্রি ১২-১৫ মিনিটে বেগম ইন্দিরা গান্ধী ভারতব্যপী ইমার্জেন্সী ঘোষণা করলেন এবং সেই সংগে ঘোষনা করলেন পাকিস্তানের সংগে সর্বাত্মক যুদ্ধ।

৪ঠা ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বিকাল ১টায় জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ভাষায় সমগ্র জাতিকে ভারতের নির্লজ্জ আগ্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে পর্বতদৃঢ় ঐক্য নিয়ে মোকাবিলা করার জন্য তিনি আকুল আহবান জানালেন।

কিন্তু ইন্দিরা সরকারের তরফ থেকে যুদ্ধ পরিচালিত হলো উল্টো নীতিতে। ১৯৬৫ সনে ইন্দিরা সরকার যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি মোতায়েন করে। কিন্তু ৭১ এর ৩রা ডিসেম্বর ইন্দিরা সরকার সর্বশক্তি মোতায়েন করলেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

www.pathagar.com

স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথে আক্রমন পরিচালনা ক'রে ইন্দিরা সরকার সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক ষ্ট্র্যাটেজী চরমভাবে দুর্বল ক'রে ফেললেন। ঢাকার আশেপাশে বোমা নিক্ষেপ ক'রে ভারতীয় বিমান বাহিনী আকাশপথের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করায় পাকিস্তান বিমান বাহিনী পশ্চিম দিক থেকে অমৃতসর ও রাজস্থানের উপর বোমা নিক্ষেপ করে দিল্লী যাওয়ার হুমকি পয়দা করল। দুর্ধর্ষ পাকবাহিনীকে দিল্লীর পথে আখের তক ঠেকিয়ে রাখা যাবে কিনা, এই দুর্ভাবনায় ইন্দিরা সরকার তড়িঘড়ি মন্ত্রী সভার সদস্যগণকে এবং ভারতীয় যুদ্ধ বাজদের সভা ডাকলেন। উক্ত সভায় ভারতকর্তৃক সাবেক পূর্ব পাকিস্তান দখলের বিশ্বব্যাপী বদনাম ঢাকার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হল। এটা আন্দাজ করা হলো যে, ভারতীয় বাহিনী এককভাবে পূর্ব পাকিস্তান দকল করে নিলে দিল্লীর উপর পাকবাহিনী যে চাপ সৃষ্টি করবে; সেটা সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। শেষে অবস্থা এমনও হতে পারে যে, নাকের বদলে নরূন নিয়েই খুশী থাকতে হবে।

ইত্যাদি খতিয়ে দেখে ইন্দিরা সরকার ইতিহাসে রাজ্য জয়ের যত রণকৌশল আছে, সবকিছুর উলেটা নীতি নির্ধারণ করলেন। তিনি ৭১ এর ৬ই ডিসেম্বর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে কুটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করলেন। এই স্বীকৃতি প্রদানের ফলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের প্রবাসী সরকার বাংলাদেশ সরকার হিসেবে বৈধতা লাভ করলো। অতঃপর রাজনৈতিকি রূপ রেখা রাতারাতি পাল্‌টে গেল।

পাকিস্তান সরকারের একটা ধারণা ছিল, ইন্দিরা সরকার যদি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান দখল করেই ফেলে,তার জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে ইন্দিরা সরকারের কাছ থেকে চরম খেসারত আদায় করা যাবেই। ইতিপূর্বে পাকিস্তানে শ্লোগান উঠেছিলঃ দিল্লী চলো! দিল্লী চলো!! কিন্তু ভূট্টো সাহেব ভাষন দিলেন, দিল্লী মুসলমানদের চিরস্মরনীয় ইতিহাসের পীঠস্থান। দিল্লীর কোনোরূপ ক্ষতি, মুসলমানদেরই ক্ষতি।

এহেন অবস্থায় পাকিস্তান সরকার কুটনৈতিক বেকায়দায় পড়লেন। ৭ই ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান ভারতের সংগে কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তিনি জনাব নূরুল আমিন ও জেড, এ, ভুট্টোকে ডেকে পাকিস্তানে বেসামরিক সরকার গঠনের অনুরোধ জানালেন। সেই সরকারে জনাব নূরুল আমিন প্রধান মন্ত্রী এবং জেড,এ, ভূট্টো থাকবেন ডেপুটিপ্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু জনাব নূরুল আমিনের চোখে তখন পদ্মা–মেঘনা যমুনার পানি। তাঁর জন্মভূমি ভারতের আগামী কবজার ভিতরে। এ সময় তাঁকে ময়ুর সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে লাভ কি! সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটা মানুষের জন্য, প্রতিটা ধুলিকণার জন্য তাঁর অন্তরের উত্তাল ভালবাসাকে যদি একটা মুহূর্তের জন্য তিনি ভূলে থাকতে পারতেন, তাহলে পাগলের মত একবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে, একবাব জেড, এ, ভুট্টোর কাছে ছুটাছুটি ক'রে

www.pathagar.com

ভিখারীর কণ্ঠে বলতেন না, আপনারা কিছু একটা করুন। পূর্ব পাকিস্তান যে একেবারে রসাতলে গেল!

তখন মিঃ ভুট্টোর সুরে সুর মিলিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছেনঃ মিঃআমিন! ওয়েট এ্যান্ড সি (Mr. Amin, wait and see) সেই অপেক্ষা করতো করতেই আজ দেখতে দেখতে বেড়ার আগুন চালে ধরেছে; সারা বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছে। এতক্ষনে মিঃ প্রেসিডেন্টের চোখ খুলেছে। তিনি এখন মিঃ আমিনকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর গদির লোভ দেখাচ্ছেন।

মিঃ আমিন জানতেন,তাতে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সুবিধা হওয়ার সকল সম্ভাবনা ইতিপূর্বেই ভন্ডুল হয়ে গেছে। ইতিপূর্বেই পদ্মা,মেঘনা, যমুনা দিয়ে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে ।ইতিপূর্বেই সিকিমের লেন্দুপ দরজির মত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বুকে চিরকালের জন্য একটি পুতুল সরকারের মৌরশী কবুলিয়ত পয়দা হয়ে গিয়েছে। তিনি দীর্ঘিকাল সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির শীর্ষে অবস্থান করে দেখেছেনঃলর্ড ক্লাইভকে দিয়ে মীরজাফর বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে খতম করে পুতুল হয়ে সিংহাসনে বসার যে কলংকময় ইতিহাস পয়দা করেছিলেন, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ৭১ সনে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে যাচ্ছে। কেননা, তিনি জানতেন, মীরজাফরেরা কোনোদিন মরেনা; সিরাজউদ্দোলারাই মরে। সিরাজউদ্দৌলারা হচ্ছে গাছ, জমিনের বুকেই তারা গজায় আর মীরজাফরেরা হচ্ছে পরগাছ,অন্য গাছের গা বেয়ে ফন্‌ফন্ ক'রে লতিয়ে সেই গাছের ডালপালায় ভর দিয়ে জগতে তাদের বাহার দেখায়।

জনাব নুরুল আমিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণে প্রধান মন্ত্রী হন নাই কেননা, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার তাকৎ পাকিস্তানের কোনো প্রধানমন্ত্রীর সাধ্যের মধ্যে ছিল না। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক অবস্থা ইতিমধ্যেই অনেক পাল্টে গেছে ।সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করতে গেলেই দেখা যাবে,গ্রাম গঞ্জে শহর বন্দরে সংগঠিত শান্তি কমিটির ভূমিকা কিছুমাত্র কম ছিল না। কেননা, মুক্তিযোদ্ধারা কেহই ভিন্ দেশ থেকে আসে নাই; শান্তি কমিটি ও দু'একজন লোক দিয়ে তৈরী নয়। প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি ইউনিয়ন, প্রতিটি থানা, মহকুমা,জেলার সকল স্তরের জনগনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল শান্তি কমিটি। শান্তি কমিটির সদস্যদেরই আত্মীয় পরিজন সন্তানাদি ছিল মুক্তিযোদ্ধা, ছিল,ই·পি·আর,বি·ডি·আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সৈনিক। সেই মুক্তিযোদ্ধারা যদি হেরে যায়, সে পরাজয় তাদেরই এবং তারা যদি জিতে যায়, সে জয়ও তাদেরই।

কাজেই শান্তি কমিটির বহু সদস্য মনে প্রাণে কামনা করতেন,দেশে কোনো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ না হোক।

৭১ এর ৬ই ডিসেম্বরের পরে দেখা গেছে প্রকৃতপক্ষে কোন রনাঙ্গণেই পাক মিলিটারীর সংগে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধে নাই। ডিসেম্বর মাসের প্রথম থেকেই ইন্দিরা সরকার আকাশবানীর মারফত ঘনঘন প্রচার করতে লাগলেনঃ পূর্ব পাকিস্তানের জেনালেরগণ Surrender করুন,

www.pathagar.com

আপনাদের আর কোনো আশা ভরসা নাই; আমরা স্থলপথ, জলপথ ও আকাশ পথ সকল পথের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি। তারই ফলে দেখা গেল, ১৬ই ডিসেম্বরে বিনা যুদ্ধে জেনারেল নিয়াজী অস্ত্র সমর্পন করে ৯৩ হাজার পাক সৈন্যসহ ভারতের পথে পাড়ি জমালেন। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মাটি পাকভারতের সৈন্যদের রক্তের সয়লাবে ভেসে গেল না।

বিনাযুদ্ধে ঢাকার পতন,বিনাযুদ্ধে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের পতন, একথাই প্রমাণ করে যে, যুদ্ধ পরিচালনার মতো সামরিক অবস্থা তখন অনুকূল ছিলনা। পাকবাহিনী নয় মাস কাল সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে বাস করেই এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এদেশের জনগনই এদেশের ভাগ্য আলাদা ক'রে ফেলেছে। এটাকে গায়ের জোরে ধরে রাখা যবে না। ইতিহাসে সুপণ্ডিত জেনারেল নিয়াজী এটা ভালোভাবেই বুঝতেন যে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দুই জার্মানী, দুই কোরিয়া, দুই ভিয়েতনাম,দুই ইয়েমেন পয়দা হয় মাত্র। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে রক্ত ঢেলে দুই বাংলাদেশ পয়দা করে সোজা সরল নিরীহ জনগণের জন্য অশেষ দুর্গতি সৃষ্টি করলে ইতিহাসে সেইটা হবে সবচেয়ে দুঃখজনক অধ্যায়। তার চেয়ে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাতকোটি মানুষ একত্র হয়ে থাকুক। সেই জনবলে একদিন তারা আপন পায়ে দাঁড়াতে পারবেই। সুপন্ডিত জেনারেল নিয়াজীর সেই আত্মসমর্পন যুদ্ধনীতির ইতিহাসে যত কলংকময় বদনাম বহন করুক, মানবতার ইতিহাসে সেটা বেমেছাল বৈশিষ্ট লাভ করেছে, –এসম্বন্ধে কোনো আন্দেশা করা চলে না। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, বাংলাদেশের কোথাও ভারতীয় ও পাক সেনাদের মধ্যে জয় পরাজয়ের ফয়সালা করার উদ্দেশ্যে কোনো বড় রকমের মোকাবিলা হয় নাই। সেই নতিজা আমরা টাংগাইল জেলাতেও দেখেছি। টাংগাইল সদরে পাক সেনা এবং তাদের সহায়ক বাহিনী রাজাকার আলবদর আল্‌শাম্‌স বিভিন্ন ঘাটিতে মোতায়েন ছিল। "শহীদ হয়ে যাও, কিন্তু পিছিয়ে এসো না",–হেড কোয়াটার থেকে এ ধরণের কোনো পোড়ামাটি নীতি গ্রহণের নির্দেশ থাকলে টাংগাইলেন রনাংগণে কী পরিমান রক্তক্ষয় হতো, সেটা ভাবতেও গা শিউরিয়ে ওঠে। লড়াইয়ের যা নিয়ম, তা ই যদি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হতো; তাহলে টাংগাইলের জন–জীবনে লড়াইয়ের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারতো। কিনতু টাংগাইলের জন জীবনের একটি পাতাও নড়লো না; রক্তারক্তির কোনো শিহরণ ও জাগলো না।

১১ই ডিসেম্বর বিকেল থেকেই ভারতীয় ছত্রীসেনারা নামতে শুরু দিল টাংগাইল জেলা সদরের উত্তরে পৌলী নদীর কিনারে। টাংগাইলের জন সাধারণ এতকাল ছত্রীসেনার গল্প শুনেছে; কিন্তু চোখে দেখে নাই। এবারে সেটা তাদের চোখে দেখার বরাত হলো। আকাশে স্থির হয়ে থেমে থাকা হেলিকপ্টার থেকে হিজল ফুলের মালার মতো ছত্রীসেনারা নেমে এলো মাটিতে। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে টাংগাইলবাসী চেয়ে দেখলো সেই অপুর্ব দৃশ্য। কোথাও কোনো টু শব্দ নাই; ছত্রীসেনাদের ঘিরে ধরার

www.pathagar.com

কোনো আঞ্জাম আয়োজন নাই। তারা যেন পূর্ব থেকেই সব কিছু ঠিকঠাক করে টাংগাইলবাসীর ঘরে সম্মানিত মেহমানের মতো ছাটকাট রাস্তায় হাজির হলো। বিয়ে-শাদির দাওয়াতে একদল মেহমান ভূরিভোজন সেরে চলে যায়, আরেকদল মেহমান এসে দস্তর খানায় খেতে বসে। এও যেন ঠিক তাই।

ভারতীয় ছত্রীসেনা নামলো টাংগাইল সদরের মাইল দুই দূরে। এদিকে টাংগাইল সদর থেকে পাক সেনা ও তাদের সহায়ক বাহিনী রাজাকার আলবদর আল শামস্ তড়িঘড়ি মাল-সামান বেধেঁ ছেদে বাসটাকে গাদাগাদি করে ছুটে চলল ঢাকার পথে। ঢাকার পথে যাত্রার সময় রাইফেল মেশিনগান কেবল উঁচিয়েই রাখলো।; কোথায়ও একটা ফুট ফুস্ করতেও দেখা গেল না।

সন্ধ্যা নাগাদ সমগ্র টাংগাইল শহর মুক্ত হলো। রাত্রির মধ্যেই ভারতীয় ছত্রীসেনারা টাংগাইল শহরের দখলি লাভ করলো। শেষ রাত্রির দিকে টাংগাইলের চারিদিক থেকে মুহুর্মুহু জয়বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে মুক্তিসেনারা শহরে জমায়েত হতে শুরু দিল। সকাল হতে হতেই হাজার হাজার মুক্তিসেনা দিয়ে টাংগাইল শহর ভরে গেল।

কয়েক দিনের মধ্যেই যখন মুক্তিসেনারা ঘরে ফিলে এলো, তখন দেখা গেল, এমন কোনো পরিবার নাই, যার দুএকজন নওজোয়ান মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয় নাই। হয় ছেলে, নয় ভাই, নয় ভাতিজা, নয় শ্যালক, নয় নিকট আত্মীয়, কেউ না কেউ মুক্তিসেনা হিসাবে গাজী হয়ে ফিরে এসেছে। মুক্তি-বাহিনীর সংগঠনও একটা মাত্র ছিলনা। খোদ আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের সর্দারীতে মুক্তিবাহিনী তো ছিলই; ছাত্র ইউনিয়ন এবং পাকবাহিনীর দলত্যাগী সামরিক জওয়ানদের সর্দারীতেও মুক্তিবাহিনী ছিল।

অক্টোবর নভেম্বর মাস থেকেই মাইনুকার চর কিংবা ভারতের অন্যান্য ক্যাম্প থেকে সংক্ষিপ্ত সামরিক ট্রেনিং দিয়ে এক একটা বাহিনীকে একজন প্লাটুন কমান্ডারের সর্দারীতে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে পাঠানো শুরু হয়েছিল। তারা পাকসেনাদের গতিবিধির খোঁজ খবর নিতে নিতে বিশেষ হুশিয়ার হয়ে দেশের ভিতরে প্রবেশ করতো। প্রত্যেক বাহিনীকেই প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগেই রাখতে হতো। বার বার ছুটাছুটি করে ভারতীয় সীমান্তে গিয়ে গোলাবারুদ সংগ্রহ করে আনা অত্যন্ত ঝুঁকির ব্যাপার ছিল। কাজেই থ্রি -নট-থ্রি ষ্টেনগান, ব্রেনগান ও গোলাগুলির বাক্স,- সব কিছু সহই এক একটা বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কোনো একটা সুবিধা মতো গ্রামে আস্তানা গড়ে তুলতো। এভাবে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি গ্রামেই কিংবা দুতিনটি গ্রাম মিলে এক একটা মুক্তিবাহিনীর আস্তানা গড়ে উঠেছিল।

সেই সব গ্রামের শান্তি কমিটির লোকেরা শহরে বন্দরে আসা যাওয়া করতো। তাদের স্থানীয় কর্তৃ পক্ষের সাথে দহরম মহরম ছিল; কিন্তু কেউ মুক্তি সেনাদের

www.pathagar.com

সম্পর্কে খবর পাচার করতো না। শহর বন্দরে ছিল পাক সেনা ও আধা সামরিক বাহিনী রাজাকার আলবদর; গ্রামে ছিল মুক্তি সেনারা। শান্তিকমিটির লোকেরা দু'তরফেই সালাম আলাইকুম বিতরণ করে খোশহালে দৈনন্দিন কায়কারবার সমাধা করতো। এমনও ঘটনা দেখা গেছে, যে লোক রাতের বেলায় একদল মুক্তি সেনাকে ভোজ দিয়ে বিদায় দিয়েছে, সেই লোক দিনের বেলায় আরেক দল পাকসেনাকে ভোজ দিয়ে বিদায় করছে। যেন কারো সাতে পাঁচে নাই।

বাংলাদেশের সকল এলাকার শান্তিকমিটির সেই ধরণের সহায়ক ভূমিকার ফলেই মুক্তিসেনাদের কাজ যতটা বিপজ্জনক হওয়ার আশংকা ছিল; ততটা হতেপারে নাই। অনেক মুক্তিসেনা মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে যে পরিমাণ পেরেশানী ভোগ করেছে, সেটা পুষিয়ে নিয়েছে টাকা পয়সা সঞ্চয় করে। অনেক মুক্তিসেনা আজাদীর পরে মালদার লোক হিসেবে সোসাইটিতে কায়েম হতে পেরেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বয়ান পাঠকগন দেখতে পাবেন টাংগাইলের ইতিহাস ২ খন্ডে সমাপ্ত আমার সুবিশাল গ্রন্থে।

কাদের সিদ্দিকীর নওযোয়ানেরা যে দিন ঢাকা টাংগাইলের ১৪টি পুল উড়িয়ে দিয়েছিল, সেদিনটি ছিল কোরবানীর ঈদ ইং ১৯৭১ পাকবাহিনী ও তার সহায়ক বাহিনীর প্রায় সকলেই ছিল কোরবানীর ঈদ যাপনের কাজে ব্যস্ত। সামান্য কয়েকজন রাজাকার প্রতিটি পুলে পাহারায় মোতায়েন ছিল। রাজাকারগণ ছিল এদেশের বেকার যুবক। মুক্তিসেনাদের সংগে লড়াই করে গাজী হওয়ার চেয়ে রুটি রুজির সুরাহা করাই ছিল তাদের কাছে মুখ্য। কাজেই অনেক সময় শোনা গেছে, কোনো রাজাকার বাহিনীর কাছে একদল মুক্তিসেনা হুমকি প্রদান করলেই তারা অস্ত্রত্যাগ ক'রে সোলে ক'রে বসতো। সেই অবস্থায় ঢাকা টাংগাইল রোডের প্রতিটি পুলে যে গুটিকতক ভেজাল রাজাকার ছিল, তাদের হুমকি দিয়ে ভাগিয়ে টাইমবোমের সাহায্যে ১৪টি পুল উড়িয়ে দেওয়া কাদের বাহিনীর নওজোয়নেদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার ছিল না।

সেই পুলগুলি উড়িয়ে দেওয়ার ফলে শুধু পাকবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থার সংকট পয়দা হয় নাই, টাংগাইলের জন জীবনেও ব্যাপক সংকট পয়দা হয়েছিল। দেখতে দেখতে লবন, কেরোসিন ও সিগারেটের মূল্য বেসামাল হয়ে উঠেছিল। সে সময়কার তীব্র কেরোসিনের সংকট মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রথম শাহাদৎ বরন [redacted] আদি টাংগাইলের বিশিষ্ট নওজোয়ান মিঞা মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ওরফে মাখন। মাখন বা জামান সাহেব ছিলেন একজন প্রতিভাবান ছোটগল্প লেখক ও নাট্যকার। সেই সুবাদে এই গ্রন্থকারের সংগে ছিল তার গভীর মহববত। টাংগাইলের জনজীবনে তীব্র কেরোসিনের সংকট মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ১১ই নভেম্বর মোতাবেক জামান সাহেব তাঁর নিজের ও এই গ্রন্থকারের যা কিছু পুঁজিপাটা ছিল,সাকুল্য গুছিয়ে ৩৫ হাজার টাকার একটা ক্যাশ নিয়ে এক ট্যাংক কেরোসিন তেল আনার জন্য ১১ই নভেম্বর ঢাকার উদ্দেশ্যে টাংগাইল ত্যাগ করেছিলেন। তিনি টাংগাইল থেকে ঢাকা

[redacted]

www.pathagar.com

গিয়েছিলেন কেরোসিন তেল এনে টাংগাইল বাসীর মুখে হাসি ফুটাবেন এবং কিছু মুনাফার দৌলতে এই গ্রন্থকার ও তার নিজের বাপ মার জীবনে কিছু ফুল ফুটাবেন,– এই ভরসা নিয়ে। কিন্তু তিনি সেই যে গেলেন; আর কোনো দিন ফিরে এলেন না। জামান সাহেবের শোকে ওদিকে জামান সাহেবের মায়ের এবং টাকার শোকে এদিকে এই গ্রন্থকারের বেগম সাহেবার হার্টফেলের অবস্থায় হিমশিম খেতে খেতে কিভাবে যে দিন মাস বছরগুলি কেটে গেছে, সেটা এক আলেমুল গায়েব ছাড়া কেউ জানে না।

যে সময় জামান সাহেব ঢাকার পথে রওনা হয়েছিলেন,সে সময়টা ছিল অত্যন্ত বিপদ সংকুল। পাক মিলিটারীদের মধ্যে তখন টাকা পয়সা হাতিয়ে নেওয়ার এক বেপরোয়া মনোভাব। লড়াই যদি বাঁধেই, কে মরে, কে বাঁচে, তার যখন কোনোই স্থিরতা নাই,তখন বেঁচে থাকতে যা হাতের কাছে পাওয়া যার, গুছিয়ে তুলে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়াই বেহ্তের। সম্ভবতঃএই ছিল পাকবাহিনীর অনেকের মনোভাব। বিভিন্ন চেক পোষ্টে তখন বাসযাত্রীদের দেহতল্লাশী হতো। এই সুত্রে গুজব ছিল যে, কারো কাছে বড় রকমের তহবিল পাওয়া গেলেই, সেটা রেখে দিয়ে তাকে বলা হতো, এ্যাবাউট টার্ণ, কুইক মার্চ। বেচারা টাকা পয়সার মায়া ছেড়ে দিয়ে জান নিয়ে বাঁচার জন্য এ্যাবাউট টার্ণ করেই প্রাণ পণে কুইক মার্চ করতো ।এ দিকে পিছন থেকে একটা দ্রুম ক'রে আওয়াজ শোনা যেতো। দেখা যেতো, সেই কুইক মার্চ করা লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে চেক পোষ্টের কয়েক গজ দূরেই। তার আত্মাটা ততক্ষণে কুইক মার্চ করেছে বেহেস্তের পথে।

এভাবে পাকসেনারা প্রচুর টাকা পয়সা জমিয়ে ফেলেছিল বলে প্রকাশ। ১৬ই ডিসেম্বরের পরে ঢাকার অলিগলি ও নর্দমার মধ্যেও টাকার বান্ডিল দেখা গেছে। পাক সেনারা পূর্বে যা কিছু হাতিয়ে নিয়েছিল, সেগুলো দেশের বাড়ি পাঠাবার মওকা পেলেও শেষের দিকে যা জোগাড় করেছিল, সেগুলো পাঠাবার কোনো মওকা পায় নাই। কাজেই টাকাগুলো যেখানে, সেখানে এমনকি পানির মধ্যে ফেলে দিয়ে ভারতীয় বাহিনীর কাছে তারা খালি হাতে আত্মসমর্পন করেছিল।

জামান সাহেবের অভাবে টাংগাইলবাসীর মুখে হাসি ফুটাবার দায়িত্ব আরো বহু লোকেই নিয়েছে; কিন্তু তার বাপ–মা এবং এই গ্রন্থকারের শেষ সম্বল খোয়া যাওয়ার ফলে যে রিক্ততার পেরেশানী পয়দা হয়েছিল, তার এহছানির দায়িত্ব মেহেরবান আল্লাহ ছাড়া কেউ নিতে পারে নাই। তবে আজাদীর জন্য কিছু মূল্য দিতে হয়। বিনামুল্যে হিরাজহরত পেলে, সেটা নাকি কাঁচের মতোই মনে হয়। বিনামূল্যে আজাদী পেয়ে অনেকেই সেটা সামান্য কিছু নগদ মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা দেখলেই বিকিয়ে দেওয়ার জন্য বেজায় উতালা হয়ে ওঠে। তার পরিবর্তে আজাদীর পথে শহীদ জামান সাহেব তাঁর আত্মীয় স্বজন ও এই গ্রন্থকারের স্মৃতিতে বিনিময়মূল্য হিসাবে অমর হয়ে আছেন, এইটাই শেষভরসা।

www.pathagar.com

শুধু এই গ্রন্থকারের শেষ পুঁজিপাটা খোয়া যাওয়ার মধ্যেই যদি কেচ্ছাটা খতম হয়ে যেতো, তাহলে এই ঘটনাটা ইতিহাসের পাতায় উঠার ইজ্জত লাভ করতো না। কিন্তু এই ঘটনাটাই রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পথ ধরে ব্যক্তি জীবনের ইতিহাসে করুণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যক্তি জীবনকে কতখানি তছনছ করেছিল, সেটা বোধহয় লাখো লেখনিতে লিখেও খতম করা যাবে না। কেননা, ব্যক্তির সংখ্যা নগন্য সংখ্যক ছিল না। কয়েক হাজারকে অতিক্রম করে কয়েক লাখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৬ই ডিসেম্বরের আগেই এই গ্রন্থকারের সঞ্চিত পুঁজি পাটা খোয়া গেল। সান্ত্বনার মতো হাতে কিছুই রইল না। টাকার শোকে এই গ্রন্তকারের বেগম সাহেবা প্রায় পাগলের অবস্থা। এর মধ্যে ১৯৭২ সনের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ সরকার উঁচু নীচু ভেদাভেদে মাথাপিছু গড় বেতন ৪০০ শত টাকা ধার্য করলেন। রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ নামায় আনুষ্ঠানিকভাবে সহি দস্তখত দিয়ে আমরা সকলেই সেই গড় বেতনের টাকা গ্রহণ করলাম।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে কাদের সিদ্দিকী সাহেব, এনায়েত করিম, আবদুস ছবুর প্রমুখ সহযোগিদের নিয়ে কাগমারী কলেজে তশরিফ আনলেন। উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ হিসাবে এই গ্রন্থকার অন্যান্য সহকর্মী এবংছাত্রবৃন্দ মিলে তাকে সাদর সম্বর্ধনা জানালাম। কাদের সিদ্দিকী এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে আমাদের সকলকে নতুন রাষ্ট্রে নতুনভাবে নতুন উদ্যমে কাজ ক'রে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

১১৭২ সনের ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি এক বিকেলে এক স্নেহভাজন ছাত্র এই গ্রন্থকারের টাংগাইলস্থ বাসায় এসে জানালো যে,কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র সরে থাকা উচিৎ। কেননা,এই গ্রন্থকার যতদিন কলেজে আছে,ততদিন সামনের দরোজা দিয়ে কলেজের গদি দখলের স্বপ্ন যাদের কোনো দিনই সফল হবে না, তারা পিছনের দরোজা দিয়ে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থকারকে খতম করার মতলব আটছে।

এই গ্রন্থকার শুধুমাত্র নিষ্ঠাবান শিক্ষাবিদ এবং স্বাতন্ত্রধর্মী সাহিত্যিকই নয়। এই গ্রন্থকার বিশ শতকের দুনিয়াব্যাপী ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবের মধ্যে লালিত বর্ধিত। সেই কারণেই এই গ্রন্থকার যে একজন দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবি এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। কাজেই তাবেদারী দৃষ্টিকোণ থেকে এই গ্রন্থকারের দেশপ্রেমের উপর তহ্মত দিয়ে আওয়ামী নেতাদের কান ভারী করার কারসাজী প্রতিপক্ষরা পুরোদমেই শুরু দিয়েছিল। আওয়ামী নেতাদের নীরব সম্মতির হাবভাব লক্ষ্য করে সেই প্রতিপক্ষরা এই গ্রন্থকারকে খতম করার একটা কোশাদা মওকাও পেয়ে গিয়েছিল।

সেই ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়েই এই গ্রন্থকার "আগে জান বাঁচানো ফরজ, পরে বিপক্ষের সংগে মোকাবিলা"–এই ফতোয়া অনুযায়ী কলেজে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

অতঃপর এই গ্রন্থকারের সেই স্নেহভাজন ছাত্র রাত্রি নাগাদ ৯টার সময় একখানা টয়োটা গাড়ী এনে বাসার গেটে থামিয়ে সেই গাড়ীতে এই গ্রন্থকারকে আরোহণের আহ্বান জানালো। তখন এত যে গুমখুন, ও হাইজ্যাক হচ্ছিল, সে সব কিছুই তোয়াক্কা না করে নির্ভয়ে এই গ্রন্থকার সেই টয়োটার মধ্যে গিয়ে উঠলো। টয়োটা ষ্টার্ট দিয়েই সোজা কাগমারী –সন্তোষের দিকে ছুটে চললো। সন্তোষ অতিক্রিম করার পরে সেই ছাত্র এই গ্রন্থকারকে কোথায় রেখে আসলে সুবিধা হয়, জানতে চাইলো। এই গ্রন্থকার ধলেশ্বরী নদীর কিনারে পোড়াবাড়ীর ঘাটে পৌছে টয়োটা থেকে নেমে পরলো। তখন রাত প্রায় ১০টা। শুভ্র জোছনায় ধলেশ্বরী নদীর বিশাল চর ঝিক্‌মিক্ করে হাসছিল। এই গ্রন্থকার সেই চাঁদের আলোয় ধলেশ্বরী নদীর চরের মধ্যে পা ফেললো। রাত্রি প্রায় ১২ টা নাগাদ এই গ্রন্থকার মওলানা ভাসানী•সাহেবের সুদীর্ঘকালে বিশ্বস্ত সাথী খাদেমআলী সরকারের বাসায় গিয়ে হাজির হলো। পরের দিন টাংগাইলের বাসায় খবর পৌছে গেল, এই গ্রন্থকার ছহিছালামতেই হিজরত বাস করছে।

টাকা খোয়াবার পরেই শুরু হলো এই গ্রন্থকারের জিন্দেগী নিয়ে টানা হেচড়ার পালা। উদ্দেশ্য হাসিলকারী মহল কাগমারী কলেজের সভাপতি ও বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র উজির আবদুল মান্নান সাহেবের নিকট হরহামেশা দেন দরবার করে এই গ্রন্থকারের মতো কওমের শত্রু(?) ভূ–ভারতে আর একজনও যে নাই, তার স্বপক্ষে মুখরোচক নতিজা খাড়া করতে শুরু দিল।

ইতিমধ্যে ১৯৭২ সনের ৪ঠা এপ্রিল কাগমারী কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো টাংগাইল ষ্টেডিয়াম ময়দানে। বলে রাখা ভাল, সেই ১৯৭২ সনে ষ্টেডিয়াম ছিল; কিন্তু গ্যালারী বিশিষ্ট দেওয়ালের বেষ্ঠনী ছিল না। সেই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এই গ্রন্থকার হাজির থাকলো। এই গ্রন্থকারকে পেয়ে সমগ্র ছাত্রদের মধ্যে বিপুল আনন্দ লক্ষ্য করা গেল। পুরস্কার বিতরণের সময় অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষকে (এই গ্রন্থকার) সম্মানী পুরস্কার স্বরূপ খুব দামী দু'খানা তোয়ালে উপহার দেওয়া হলো।

হৃষ্টচিত্তে বাসায় এসে এই গ্রন্থকার স্ত্রীপুত্রদের সংগে মিলিত হলো। কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যার পরে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন সশস্ত্র যুবক এই গ্রন্থকারের বাসা ঘেরাও করে খতম করার হুম্‌কি ধাম্‌কি দিয়ে অবিলম্বে হাজির হতে বলতে লাগলো। এই গ্রন্থকার জানালা দিয়ে তাদের মেজাজ ও চেহারা পরখ করে বাসার পিছনের দরোজা দিয়ে অন্ধকারের ভিতর অন্য বাসায় চলে গেল। তারা এই গ্রন্থকারের সন্ধান না পেয়ে বাসার মূল্যবান আসবাবপত্র মালামাল লুট করে নিয়ে গেল। এই গ্রন্থকারের বেগম সাহেবাকে বেয়নেটের দ্বারা খুন করতে উদ্যত হলে এক আত্মীয় খলিল সাহেব তাতে বাধা প্রদান করেছিলেন। সেজন্যে খানিকটা খুনের খেসারত তার দেহের উপর দিয়েই কেটে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

অতঃপর এই গ্রন্থকার হুজুর ভাসানী সাহেবের নেকদোয়া নিয়ে চলে গেল ঢাকা। সেখানে স্বরাষ্ট্র উজির আবদুল মান্নান সাহেবের কাছে হাজির হলো। সেখানে দেখা গেল, প্রতিপক্ষরা স্বরাষ্ট্র উজিরকে পূর্ব থেকেই আগ্‌লে বসে আছে। কাজেই এই গ্রন্থকার কিছু দিন তাঁর কাছে ঘোরাঘুরি করে কোনো ফায়দাই উঠাতে পারলো না। মান্নান সাহেবও এই গ্রন্থকারকে কিছু দিন অন্যত্র সরে থাকারই পরামর্শ দিলেন।

এই সময় এই গ্রন্থকার টাংগাইলের কর্তা ব্যক্তিদের অন্যতম এই গ্রন্থকার সম্পাদিত ''হিতকরী''পত্রিকার এক কালিন সহকারী সম্পাদক ও বিশেষ স্নেহাস্পদ আনোয়ারুল আলম শহীদকে এক পত্রে জানিয়েছিল। ''ইছায়ী ১৮৯৮ সনের দিকে দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার,বিষাদ সিন্ধু ও গাজী মিঞার বস্তানীর অমর লেখক মীর মোশাররফ হোসেনকে ভাবাবেগ প্রসুত তহমত দিয়ে টাংগাইল থেকে তাকে চির বিদায় গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। নব পর্যায়ে প্রকাশিত মীর সাহেবের সেই''হিতকরীর'' বর্তমান যুগের সম্পাদক আমার প্রতিও একই নাটক অভিনীত হতে যাচ্ছে,–একথাটা তুমি গভীরভাবে খতিয়ে দেখো।''সেই পত্রটি তার হস্তগত হয়েছিল কিনা জানা যায় নাই। তবে কলেজ থেকে এই গ্রন্থকারের পদচ্যুতির তোড়জোড় আয়োজনের কোনো রূপ ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায় নাই।

অপর দিকে টাংগাইলের বাসা থেকে এই গ্রন্থকারের বেগম সাহেবা সন্তোষে হুজুর ভাসানী সাহেবের কাছে গিয়ে সবিস্তার জানালেন। এবং হুজুরকে এর একটা ফয়সালা করার জন্য তিনি কান্নাকাটি করতে লাগলেন। হুজুর ভাসানী সাহেব বেগম সাহেবাকে অত্যন্ত দরদের সংগে বলেছিলেনঃ দেখো মা! আমার জন্মস্থান সিরাজগঞ্জের ছেলে বলেই রহিমকে আমি কাগমারী কলেজে ধরে রেখেছিলাম। সে বেচারাও কলেজটার জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করেছে, তার সম্বন্ধে তুমি আর কতো বলবে মা! আমি সব জানি! রহিম যেদিন কাগমারী কলেজের হর্তাকর্তা হয়েছে, সেই দিন থেকেই তার একদল প্রতিপক্ষও পয়দা হয়েছে। তারা পাকিস্তানী আমলে রহিমের মাসের পর মাস বেতন বন্ধ রেখেছে। রহিমের বিরুদ্ধে একটার পর একটা মামলা দায়ের করেও তাকে হটাতে পারে নাই। রহিম আমার কাছে এসে শুধু দোয়া চেয়েছে; কিন্তু অন্য কারো কাছে মাথা নত করে নাই। রহিম এবার ও আমার কাছে এসেছিল। আমি তাকে বলেছিঃ তুমি ঢাকায় মান্নান সাহেবের কাছে যাও। সেই ধমক দিয় । সব ঠিক কইরা দিবে। তবুও তোমাকে আমি বলি, এই অরাজকের মধ্যে তুমি একটু খামোশ হইয়া থাকোমা।।

হুজুর ভাসানী সাহেবের এই অছিয়তের পরে আমাদের সকলের পক্ষেই খামোশ হয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিছু দিন পর সন্তোষের রোস্তম আলী সরকার আমার বিষয়টা হুজুর ভাসানী সাহেবের কাছে পেশ করেছিলেন। তারা সকলেই আমার প্রতি গভীর মমতাও মহব্বত পোষন করতেন। আমার মামা বীর বরূহা গ্রামের মরহুম ইউসুফ আলী খান ছিলেন মাওলানা ভাসানী হুজুরের মুরীদ। তিনি১৯৭৩ সনের দিকে

www.pathagar.com

কোনো এক সময় হুজুরের কাছে বসে আমার প্রসংগ উঠিয়ে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমার ভগিনা রহিম সাহেব সিরাজগঞ্জ শহরে বড়ই মুসীবতের ভিতর দিন কাটাচ্ছেন। তিনি প্রিন্সিপালের পদ ব্যতীত অন্য কোনো পদে চাকুরী করতেও রাজি হচ্ছেন না; এদিকে বেকার অবস্থায় সাতপাঁচ করে জিন্দেগী কাটাতেও পারছেনা। হুজুর বেচারার কিছু একটা হিল্লা করলে তবেই রক্ষা।

তাদের জবাবে হুজুর বলেছিলেন; দেখো, আমি রহিমকে মামলা করে নিয়ে আসবো। কিন্তু সে সময় এখনো হয় নাই।

আমার আত্মকথায় মফিজ ভাইয়ের বয়ান লম্বা করার আর মোটেই জরুরাত ছিল না। কিন্তু পরবর্তী কয়েকটা ঘটনা এমন ভাবে আমাদের ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত ভাবে ঘটে গিয়েছিল, সেগুলি বয়ান না করলে আত্মকথা অপূর্ণই থেকে যায়।

১৯৭২ সনের মে জুন মাসে আমি ঢাকায় গ্রীনরোডে আমার উকিল শ্বশুর ডাঃ আমিনুল হক সাহেবের বাসায় থেকে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র উজির জনাব মোঃ আবদুল মান্নানের অফিসিয়াল বাসায় গিয়ে সকালে নিয়মিত হাজিরা দিতাম এবং সুযোগ পেলেই তাঁকে অনুরোধ করতাম আপনি কাগমারী কলেজের প্রেসিডেন্ট, আপনি বলে দিলেই কলেজে হাজির থেকে আমি আমার বর্তমান দায়িত্বশীল ভাইস প্রিন্সিপালের পদে কাজ চালিয়ে যেতে পার। আপনি শুনেছেন, আমাকে একদল লোক কলেজে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমার কথায় তিনি শুধু তাঁর ব্যস্ততার কথা বলতেন ; কিন্তু ফাইনাল আশ্বাস দিতেন না। এভাবে মাস দেড়েক তার বাসায় ঘুরে বিরক্ত হয়ে একদিন আমার উকিল শ্বশুর ডাঃ হককে বললাম, আমি তো মান্নান সাহেবের মনের কথা বের করতে পারলাম না। আপনি মেহেরবানী করে একদিন তার কাছে যান। এবং বলেন আমার সম্বন্ধে একটা ডিসিশন নেওয়ার জন্য, আমাকে তারা কলেজে রাখবে কি,রাখবে না, কারন, টাংগাইলের থানাপাড়া বাসায়, আমার স্ত্রী নূরজাহান পারভেজ ও মুন্নী এই দুটো ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে ভীষন ব্যাকুল অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। আমার স্ত্রী টাংগাইলের প্রায় অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িতে দৌড়াদৌড়ি করেছেন এবং তার নির্দোষ স্বামীর প্রতি মেহেরবানী করার জন্য অনুনয় বিনয় করেছেন।

ডাঃ আমিনুল হক আমার কথা মোতাবেক তৎকালিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে গিয়ে আমার প্রসংগ তোলা মাত্র মান্নান সাহেবের মনের কথা ফাঁস হয়ে গেল। তিনি বললেন। রহিম সাহেব প্রতিদিন আমার বাসায় এসে বসে থাকেন, এদিকে সবাই আমাকে তাঁকে গেরেফতার করছে না কেন, এই মর্মে সমালোচনা করতে থাকে আপনি তার শশুর। আপনাকে পেয়ে ভালোই হলো। আপনি রহিম সাহেবকে কিছু দিন আত্মগোপন করে থাকতে বলবেন।

আমার উকিল শশুর সাহেবের কাছে মান্নান সাহেবের কথা শুনে আমি বললাম, এবার মান্নান সাহেবের থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। আমি আত্মগোপন করে আছি

www.pathagar.com

এটা প্রমান করতে পারলেই,তার ক্লাশমেট মরহুম লতিফ সাহেবকে আমার ভাইস-প্রিন্সিপাল পদে বসিয়ে দিতে পারেন।

কিন্তু সেই মুদ্দতে আমরা তো ছিলাম নিহায়েৎ নাচার। আমি বাধ্য হয়ে ঢাকা থেকে সিরাজগঞ্জ চলে গিয়েছিলাম। আমার উপর আত্মগোপনের তহমত চাপিয়ে কাগমারী কলেজের প্রেসিডেন্ট মান্নান সাহেব এক মিটিংয়েই ভাইস প্রিন্সিপালের পদ থেকে আমাকে অপসারন করে সেই পদে তাঁর ক্লাশমেট মরহুম লতিফ সাহেবকে ভাইস প্রিন্সিপাল পদে নিয়োগ করেছিলেন। সেই বৈঠকে কিংবা পরবর্তী অপর কোন বৈঠকে আমার পারমানেন্ট বাংলার অধ্যাপক পদ থেকে তারা আমাকে বরখাস্ত করেন নাই। সে পদটি শূন্য ঘোষনা করে সে পদে নতুন কোন বাংলা অধ্যাপক নিয়োগ করেন নাই। আল্লাহ তায়ালাই তাদের মতো ষড়যন্ত্র কারীদের সীনার মধ্যে সীল গালা লাগিয়ে দিয়েছিল, যাতে তারা আর কোনো পদক্ষেপের বিষয় ঘূনাক্ষ, ইয়াদ করতে না পারে।

আমি সিরাজগঞ্জ ফিরে গিয়ে মফিজ তালুকদারকে জানালাম, ভাই আমি কাগমারী ফুল ফ্লেজেড ডিগ্রী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলাম। কাজেই তোমার পিতার নামে স্থাপিত কোরপ আলী ইন্টারমেডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল পদ ছাড়া অন্য কোনো পদে আমি চাকুরী করতে পারবো না। মফিজ ভাই বললো। ঠিক আছে দিন পনেরো পরে যা-হয়, তোমাকে বলবো।

সেই দিন পনেরোর মধ্যে মফিজ তাঁর কলেজে প্রিন্সিপাল নিয়োগ করে আমাকে জানালো, তাঁর কলেজে তো প্রিন্সিপালের পদ খালি নাই; তবে তার ভায়রা ভাই মমিন তালুকদারের বেলকুচি কলেজে প্রিন্সিপালের পদ খালি আছে। কথাটা শুনে আমি দেলে বেজায় এছানি বোধ করলাম। আমরা যখন ইকবাল হল ছাত্র সংসদে ছাত্র লীগের প্রার্থী মনোনীত হয়ে নির্বাচন করেছি, তখন তৎকালিন ইস্ট পাকিস্তান ছাত্র লীগের প্রেসিডেন্ট মমিন তালুকদার থাকতেন ফজলুল হক মুসলিম হলে। আমরা তো তার কাছে গিয়ে উমিদারী করতাম, তিনিও ইকবাল হলে এসে আমাদের জন্য ইলেকশান ক্যাম্পেন করতেন। আমরা তাকে বিশেষ তাজীমের সংগে মমীন ভাই বলে ডাকতাম। আমরা আবার একই কনষ্টিয়েন্সির বাসিন্দাও। কাজেই আমাদের মধ্যে মিল মহব্বত ভালোই ছিল। সেই ভরসায় মনে করেছিলাম, বেলকুচি কলেজের প্রিন্সিপালের পদটা আমার না হয়েই যায় না। আমার বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধা সম্বন্ধী ভাই মোঃ ইসমাইল হোসেন (যিনি এখন সপরিবারে আমেরিকার বাসিন্দা) তার দোস্ত আমির হুসেন ভুলো, আমিনুল ইসলাম তালুকদার প্রমুখকে সংগে নিয়ে তৎকালিন খাদ্য প্রতিমন্ত্রী মমিন তালুকদার সাহেবের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। মমিন তালুকদার সাহেব বললেন, তৎকালিন প্রধান মন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর সাহেবের কাজীপুর কলেজে প্রিন্সিপালের পদ খালি আছে। বেলকুচি কলেজ কিংবা কাজীপুর কলেজে প্রিন্সিপাল নিয়োগের এক্তিয়ার ক্যাপ্টেন মনুসুর সাহেবের হাতেই ন্যস্ত।

www.pathagar.com

কাজেই আমরা তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ক্যাপটেন মনসুর সাহেবের বাংলোয় গেলাম। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে পড়ার সময় আমরা ছিলাম ক্যাপ্টেন সাহেবের বিশ্বস্তকর্মি। সেটা তিনি খুবই ওয়াকিব ছিলেন বলেই ইকবাল হল থেকে আমি ১৯৫৭-সনে ই, পি, সি, এস, পরীক্ষা দেওয়ার সময় ক্যারেকটার সার্টিফিকেট তাঁর কাছ থেকে চেয়ে এসেছিলাম। তিনি ছিলেন সে সময় ইস্ট পাকিস্তানের বানিজ্য মন্ত্রী। তিনি নিজে সার্টিফিকেট টাইপ দস্তখত করে পিওন মারফত ইকবাল হলে আমার ৮নং রুমে পৌছে দিয়েছিলেন।

কাজেই আমার ধারনা বেলকুচি বা কাজীপুর এর যেকোনো একটি কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিয়োগের ব্যাপারে ক্যাপটেন মনসুর সাহেব খোশহালে এজাজত দিবেন। তাদের কাছে তদবির শেষে সিরাজগঞ্জ ফিরে গিয়ে আমি আশায় আশায় বুক বেঁধে বসে রইলাম। কিছু দিন পর শোনা গেল বেলকুচি ও কাজীপুর উভয় কলেজেই প্রিন্সিপাল নিয়োগ করা হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমার নছিবে ঐ পদের কোনোটারই শিকা ছেঁড়েনাই।

তারা নাকি টাংগাইলের নেতাদের কাছ থেকে আমাকে রুশভারতের বেজায় বিরোধী হিসাবে রিপোর্ট কালেকশন করেছেন। রুশভারতের তাবেদারদের ভাষায় আমরা ছিলাম দালাল।

যাহোক, রুটি রুজির যখন সকল আশাই একে একে শেষ হয়ে গেল, তখনও তাদের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বললাম না, ভাই! আমি রুশভারতের বিরোধিতা আর কখ্খনো করবো না। আমি একেবারে তোমাদের তস্য গোলামের গোলাম হিসাবে জিন্দেগী কাটাতে রাজী আছি।

কিন্তু বিবেকের তাড়নায় উপোসটাই মেনে নিয়েছি, দৌলতকে মেনে নিতে পারি নাই। কারন আমার বাপদাদার কাছ থেকেই অছিয়ত লাভ করেছি, মুসলমানরা কখনো মুর্দা কত্তম নয়। সারা দুনিয়ায় মুসলমানরা জিন্দা কত্তমের মতো বুজ দিল বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষ না করেই টিকে আছে; টিকে থাকবেই। কাজেই আমাকে আল্লাহ হেফাজত করবেন। তারপর থেকে আমি সিরাজগঞ্জ শহরে পার্টনার শীপে প্রেসের ব্যবসা করেছি ইসমাইল ভাইয়ের সাথে। তিনি আমাকে ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করার ফলে শহীদুল ইসলাম তালুকদারের সাথে পাটনার হিসাবে পাটের ব্যবসা করেছি। সেও আখেরে আমাকে ন্যায্য হিস্যা না দিয়েই বিদায় করেছে। তারপর আমি নিজে বাহির গোলা রোডে সোনার বাংলা প্রকাশনী স্থাপন করে আমার, দুই উঠোনের ছায়া, বারোয়ারী মন, পদ্মা মেঘনা যমুনা, শেষ প্রহরের চিঠি এই চারখানা উপন্যাস বিভিন্ন জেলার লাইব্রেরীতে বিক্রী করে জিন্দেগী চালাতে লাগলাম।

কিন্তু তাতেও যখন সংসার চলতো না বড় বাজারে একটি দোকান নিয়ে বিস্কুট, জর্দা, সাবান, তৈল ইত্যাদি নিজ হাতে বিক্রী করতাম। আমার ছেলে পারভেজ ও

www.pathagar.com

মুন্নীকে স্কুলে পড়াবার তাকৎ আমার ছিলনা। তারা খেলাধুলা করেই দিন কাটাতো। পিছনে সবাই আমাকে সমালোচনা করেছে, রুশভারতের বিরোধী ভূমিকার জন্যই বেচারা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। কেউ তার সহায়তায় হাত বাড়িয়ে দেয় না। আমি সেগুলি কানে শুনতাম, তবে বিচলিত হতাম না। কেননা, আমার ইমানী জোশ ছিল হামেশা তাজা ।ইসলামী রেনেসাঁ দুনিয়াতে মার খেয়ে যাবে, বাংলায় ব্রাহ্মন্যবাদ টিকে যাবে– এটা কিছুতেই হতে পারে না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আমার আব্বার কাছ থেকে একটি দোয়া শিখেছিলাম, সেটা ঘুমাবার সময় ব্যতীত হামেশা জেকের করতাম। দোয়াটা সকলের জন্যই এখানে লিখে দিচ্ছিঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজোবেকা মেনাল্ হাম্মেওয়াল হুজ্নে, আউজো বেকা মেনাল আজ্জে ওয়াল কাস্লে, আউজোবেকা মেনাল জোব্নে ওয়াল বোখ্লে, আউজোবেকা মেনাল্ গালাবাতেদ্ দায়নে ওয়া কাহ্রেহের জালে–

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই দোয়ার বরকতেই পরবর্তী সময়ে আমার জিন্দেগীতে বহু ধাক্কা সামাল দিয়ে আমি মনজিল মকশুদে হাজির হওয়ার জন্য হিম্মতের সংগে পা ফেলেছি।

পূর্বেই বলেছি আমি তখন সিরাজগঞ্জের বাহিরে গোলা রোডে সোনার বাংলা প্রকাশনী ও লাইব্রেরী খুলে আমার নিজের লেখা উপন্যাস বাংলাদেশব্যাপী বাজারজাত করে কোনো রকমে ডালভাত যোগাড় করে চলছিলাম, শেষের দিকে কর্মচারী রাখারও তাকৎ ছিলেন। ১৯৭৫ সনের ১৪ই আগষ্ট আমি নিজেই দুইশত বইয়ের একটি বাণ্ডিল নিয়ে চট্টগ্রামের লাইব্রেরী গুলিতে বেচার উদ্দেশ্যে ঢাকায় হাজির হয়ে এক দোস্তলোক মোঃ আমিনুল ইসলামের কমলাপুর বাংলাদেশ ব্যাংক কলনিতে অবস্থিত বাসায় রাত্রিটা যাপনের জন্য বিরতি দিয়েছিলাম।

পরদিন অর্থাৎ ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট সকালে রেডিও খুলেই একটা ভিন্ন কন্ঠের আওয়াজ শুনতে পেলাম, আমি মেঃ ডালিম বলছি। স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।

খবরটা শোনার পরও অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে কেউই "ইন্নালিল্লাহে----- রাজেউন" উচ্চারণ করতে পারে নাই। ঐদিন বিকেলের মধ্যেই খন্দকার মোশতাককে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ঘোষনা করা হল। তখন দেশবাসীর মধ্যে হুশ ফিরে এলো। তখন দেশবাসী খতিয়ে দেখতে পেলো যে, শেখ মুজিবের মৃত্যুতে কারো পক্ষেই ইন্না লিল্লাহে ---- রাজেউন পড়ার নছিব হয় নাই।

১৫ই আগষ্ট থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য রাজধানী ঢাকায় কারফিউ জারী করা হ'ল। কয়েক দিন পরে কারফিউ কিছু কিছু করে শিথিল করা হল। ১৮ শে আগষ্ট থেকে দেশব্যাপী যানবহন চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার খবর পাওয়া গেল। আমি ১৯শে আগষ্ট ঢাকা থেকে রওনা দিয়ে কাগমারী কলেজে এসে হাজির হলাম। কলেজের অফিসে নেমেই আমার প্রিয় ছাত্র কলেজের হেডক্লার্ক মোঃ নিজাম উদ্দিন মিয়াকে

www.pathagar.com

বললামঃ বাবাজী! কলেজের গবর্নিং বোডির রেজুলেশন বই আমাকে একটি বারের জন্য দেখতে দাও। অতীব তাজীমের সাথে নিজাম উদ্দিন খাতাগুলি নজদিকে এগিয়ে দিলে আমি তার ভিতরে আমার সম্বন্ধে যেসব রেজুলেশন লেখা হয়েছে, সেগুলি কপি করে নিলাম। অতঃপর সরাসরি সন্তোষে হুজুর ভাসানী সাহেবের কাছে গিয়ে ছালাম-কদমবুচি করে বললাম, হুজুর ! কাগমারী কলেজ থেকে আমার চাকুরী তো যায় নাই। যদিও কলেজটি এখন সরকারী হয়েছে; কিন্তু বেসরকারী আমলে চাকুরী খোয়া না যাওয়ার ফলে সরকারী কলেজে যোগদান করার আমি সম্পূর্ণ হকদার। ইছায়ী ১৯৫৮ সনে আমি কাগমারী কলেজে বাংলার অধ্যাপক পদে চাকুরী পাই এবং সেই পদেই আমার চাকুরী পারমানেন্ট হয়। ১৯৭০ সনে আমি বাংলার অধ্যাপক হিসাবেই কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু ভাইস-প্রিন্সিপাল পদের জন্য আলাদা কোনো বেতন গ্রহণ করি নাই।

ইছায়ী ১৯৭২ সনে কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপালের পদ থেকেই আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে; কিন্তু সেই সঙ্গে বাংলার অধ্যাপক পদ থেকে আমাকে বরখাস্ত করে সেখানে শূন্যতা পয়দা করা হয় নাই। কাজেই কলেজে আমার পারমানেন্ট চাকুরী খোয়া যায় নাই। সেটা ঠিকই আছে। এই প্রসংগে আরো একটি বিষয় হুজুরকে ইয়াদ করালাম। কাগমারী কলেজ সরকারী করার প্রায় দুই মাস পরে বহুদিন আগে কলেজ ত্যাগ করে কলিকাতায় বসবাসরত কালীপদ রায়কে ডেকে এনে চাকুরীতে বহাল করা হয়েছে। কথাগুলি শোনার পর মওলানা ভাসানী হুজুর বললেন, রহিম ! তুমি এক খন্দকার, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টও এক খন্দকার। আর দেরী করোনা। তাড়াতাড়ি খন্দকার মোশতাকের কাছে দরখাস্ত দাও। তোমার চাকুরী ফিরে পাইবা।

যদিও বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের উছিলায় আমি কাগমারী কলেজের চাকুরী ফিরে পাই নাই; তবে চাকুরীটা ফিরে পেয়েছিলাম ঠিকই। আমি কাগমারী কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল হিসাবে চাকুরী হারিয়েছিলাম, আবার সেই ভাইস-প্রিন্সিপাল হিসাবেই চাকুরিতে বহাল হই। তবে সরকারী চাকুরীর যোগ্যতা অনুসারে কলেজটি জাতীয়করন করার তারিখ ১/২/১৯৭৫ ইং হতে আমাকে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে আত্মীকরন করা হয়।

আমি বিশ শতকে দুনিয়াব্যাপী ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবের মধ্যে লালিত বর্ধিত। উনিশ শতকের পরাভব চেতনার দাড়িপাল্লায় মেপে যারা আমার সে সময়কার ইজ্জতপূর্ন বর্তমান এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত নষ্ট ক'রে আমার মুখ থেকে রুটি-রুজি কেড়ে নিয়েছিলেন, তাদের সম্বন্ধে ইতিহাসের রায় যত নির্মমই হোক, তাতে আমার সান্ত্বনার কিছুই নাই কেননা, ইতিমধ্যে আমার চাকুরী জীবনের সম্ভাবনাময় বিশটি বছর এমনভাবেই আমার জীবন থেকে খ'সে গেছে যে, আমাকে বিস্‌সিল্লাহ বলে সম্পূর্ণ শূন্য থেকে শুরু দিতে হয়েছে।

www.pathagar.com

আমি পদচ্যুত হওয়ার পর সম্পূর্ণ রিক্ত নিঃস্ব অবস্থায় আমার পরিবার নিয়ে যে অবস্থায় পড়েছিলাম, সেই আয়েব বা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার একমাত্র ইতিহাসের তাগিদেই প্রকাশ করা যেতে পারে। আমার স্ত্রী মেয়ে মুন্নীকে নিয়ে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের কাঁধে এবং আমি একটি ছেলে পারভেজকে নিয়ে আমার আত্মীয় বন্ধুদের কাঁধে, তাদের ভাতে, তাদের পয়সায়, ইছায়ী ১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৭ সন পর্যন্ত চরম জিল্লতির মধ্যে দিন গুজরান করেছি।

আমি ইছায়ী ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্টের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে মহামান্য প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের কাছে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের মাধ্যমে আমার পদচ্যুতির বিষয়টি পরীক্ষা ক'রে আমার সাবেক পদ ভাইস-প্রিন্সিপাল হিসাবে পূনর্বহালের আবেদন পেশ করি। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার বিষয়টির উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় এবং ইছায়ী ১৯৭৭ সনের মার্চ মাসে আমাকে সদাশয় সরকার ভাইস-প্রিন্সিপাল হিসাবে পুনর্বহাল করে ১·২·১৯৭৫ তাং- থেকে বাংলাদেশ এডুকেশন সার্ভিসে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করেন। এই সময়ের মধ্যে আমার সম্ভাবনাময় বিশ বছর সম্পূর্ণ নির্দোষ নিরাপরাধ অবস্থায় আমার জীবন থেকে ঝ'রে গেলেও এবং পদ মর্যাদার দিক দিয়ে তার যথাযথ ক্ষতিপূরণ না হলেও বিংবা আমরণ ভূলতে পারবো না, এমন জিল্লতির স্মৃতি জীবন থেকে মুছে না গেলেও, আমার চির বাঞ্ছিত শিক্ষকতার পেশায় ফিরে এসে দেশ ও কওমের বৃহত্তর খেদমতে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পেয়েই আমি সদাশয় সরকারের কাছে চির কৃতজ্ঞ বোধ করেছি।

চাকুরীতে পুনর্বহালের মাঝখানে প্রায় উনিশটি মাস বহু বহু খ্যতিমান, বহু হৃদয়বান ব্যক্তি আমার প্রতি অপরিসীম মমতা ও দরদ দেখিয়েছিলেন। সংক্ষিপ্তভাবে তাদের একটা ফিরিস্তি দিয়ে আমার ঋনের বোঝা কিছুটা লাঘব করতে চাই। বাংলাদেশ বস্ত্রকল করপোরেশনের সাবেক চেয়ারম্যান এবং সিরডাবের পরিচালক জনাব এ, টি, এম, শামসুল হক (সাবেক সি, এস, পি,), শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের সাবেক যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ ফেরদাউস খান, সাবেক উপসচিব জনাব মীর এনায়েত হোসেন, শিক্ষা উপদেষ্টার সাবেক একান্ত সচিব জনাব মোঃ ওবায়দুল হক, সাবেক সেক্সন অফিসার দীপক কুমার সাহা ও জনাব জালাল উদ্দিন আহমদ, অফিস সহকারী জনাব মোঃ সাদেকুর রহমান ও জনাব মোঃ আক্কাস আলী, সাবেক জনশিক্ষা পরিচালক জনাব মোঃ নূরুসসাফা, সাবেক সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নোমান, সাবেক সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম খান, সাবেক প্রশাসনিক অফিসার জনাব মোঃ সাদউল্লাহ, কলেজ বিভাগীয় সাবেক প্রধান সহকারী জনাব মোঃ নইমউদ্দিন বিশ্বাস, ও প্রধান সহকারী জনাব কাজী লুৎফর রহমান ও জালাল উদ্দিন আহমদ, ক্যাশিয়ার জনাব মোঃ মূশা, প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীয়েটের প্রবীন সহকারী জনাব মোঃ লোকমান হোসেন, শিল্পকলা

www.pathagar.com

একাডেমীর সাবেক সেক্রেটারী এবং পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা জনাব মোঃ আবুল হোসেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রলায়ের সেক্শন অফিসার মোঃ মতিয়ুর রহমান, টাংগাইলের ডেপুটি কমিশনার জনাব শেখ হাবিবুল্লাহ, সাবেক অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব মোঃ আউয়াল, সাবেক ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব মোঃ আবদুল হাই, সাবেক প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব সৈয়দ মোঃ শামসুল আলম, ডেপুটি কমিনারের সাবেক প্রধান অফিস সহকারী জনাব মোঃ সাদেক রেজা, সাবেক সহকারী জনাব মোঃ আবদুল জব্বার, জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস, ডেপুটি কমিশনারের একান্ত সহকারী জনাব নাজমুস্ সাকিব মুকুল, সাবেক পেশ্কায় জনাব মোঃ নইম উদ্দিন, সাবেক পেশকার জনাব খন্দকার মোঃ আনিসুর সহমান, করটিয়া সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আ, ফ, ম, খলিলুর রহমান, কুমুদিনী কলেজের অধ্যাপক জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, কাগমারী এম, এম, আলী সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ মোশারফ হোসাইন, ঐ কলেজের অধ্যাপক মোঃ আবদুল লতিফ মিয়া এল, এলবি, অধ্যাপক জহুরুল ইসলাম খান, লাইব্রেরী ক্যাটালগার মরহুম মওদুদ হোসেন খান মজনু, অফিস সহকারী মোঃ শামসুল হক, মোঃ আবদুস সাত্তায় ও মোঃ জমশের আলী, ঢাকার শহিদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ জনাব মীর আবুল হোসেন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রশাসনিক অফিসার, কে, হাফিজুর রহমান, বরুহা হাই স্কুলের হেড মাষ্টার জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, এবং অন্যান্যদের মধ্যে জনাব মোঃ আবদুল জলিল খান, জনাব মোঃ শাহজাহান আলী খান, জনাব মোঃ মোযহারুল ইসলাম খান, মোঃ শায়েস্তা খান, জনাব খলিল আহমদ খান, জনাব মোঃ মোকাদ্দেস আলী, জনাব মোঃ আবদুল জাব্বার মিয়া এ্যাডভোকেট, জনাব মোঃ সুলতান, জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার মাস্টার ; মোঃ আবদুল মজিদ তালুকদার এবং সন্তোষ মটবাড়ীর মরহুম জনাব মোঃ রোস্তম আলী মিয়া প্রমুখের মেহেরবানীর শুকরিয়া আদায় আমার সারা জিন্দেগীতে সম্ভব নয়।

বহু জিল্লতি ও দীর্ঘ পেরেশানীর দরিয়া সাতরে আমি কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী সরকারী কলেজে অধ্যাপনার চাকুরীতে ফিরে আসার পর সম্পূর্ণ শূণ্য হাতে জিন্দেগী শুরু করি। ১৯৭২ সনে থানাপাড়ার যে-মোহাম্মদ আলী রেঞ্জারের কোয়াটার ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম, ১৯৭৭ সনে সিরাজগঞ্জ থেকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ পুনরায় সেই বাসাতে এসে ঠাঁই পাই। ১৯৭৭ সনে মাত্র ৭১০/-টাকা বেতনে শুরু করি জিন্দেগানী। আমার জিন্দেগীর সুখী সমৃদ্ধ সুন্দর বিশটি বছর যাদের বদ্কারীতে বরবাদ হয়ে গেছে, তাদের কাছে আমার চিরকালের দাবীঃ ফিরিয়ে দাও আমার সুখী সুন্দর বিশটি বছর ?

কিন্তু আমি জানি, আমার এই আহাজারী সম্পূর্ণই নিষ্ফল। এই টাংগাইলে এ ধরনের ইতিহাস ইতিপূর্বেও ঘটেছে। ১৮৮৮ সনের মুদ্দতে অমর গ্রন্থ বিষাদ সিন্ধুর লেখক মীর মোশাররফ হোসেনের উপর এক ধরনের তহ্মত দিয়ে মিথ্যা মামলার

www.pathagar.com

আসামী করলে তিনি রাতারাতি রংপুরে পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে রংপুর থেকে তার নিজ জন্মস্থান কুষ্টিয়ার কুমার খালীতে গিয়ে জিন্দেগী কাটান।

ইছায়ী ১৯৩১ সনে মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে সন্তোষের জমিদারগন টেস পাচারের মামলা ঠুকে তাকে ৮ ঘন্টার মধ্যে বাংলা ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন। সে কাহিনী আছে "শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী গ্রন্থে। ১৯৪৭ সনে মওলানা ভাসানী পুনরায় সন্তোষ-কাগমারী এসে আস্তানা গাড়েন। তাঁর এন্তেকালের পর তাঁর ঐতিহাসিক মাজার সন্তোষ জমিদার বাড়িতেই অবস্থিত। মওলানা ভাসানীর মাজার আজ সারা দুনিয়ার মানুষের তীর্থস্থান।

আমি টাংগাইলে ফিরে টাংগাইল শহরে এক টুকরা জমি কিনে হাউস বিল্ডিং করপোরেশন থেকে ১লাখ ৬ হাজার টাকা ঋন নিয়ে একতালা ইমারত বানিয়ে স্ত্রীপুত্র কন্যা সহ বসবাস করছি। টাংগাইলেই কিছু আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। নিজ গ্রাম সিরাজগঞ্জ জেলার রায়দৌলতপুরে আমার জন্মভিটায় আমার মাথা গোঁজার একখানা ছাপড়াওনাই।

মওলানা ভাসানী ১৯৪৭ সনে আসাম থেকে ফিরে এসে তাঁর জন্মভিটা সিরাজগঞ্জের সয়াধানগড়ায় মাথা গোঁজার ঠাঁই পান নাই। তিনি রহমতগঞ্জ কলেজে গিয়ে পরিত্যক্ত ইমারতে স্ত্রী আলেমা ভাসানীও পুত্র কন্যা নিয়ে আস্তানা গেড়েছিলেন। পরে সপরিবারে টাংগাইলে চলে আসেন। সয়াধানগড়া গ্রামের ভিটা আবাদ করার নছিব তাঁর হয় নাই।

আমি আমার গ্রামের ভিটায় একটা বাসগৃহ তৈরী করে বসবাস করার নিয়াত করেছি। আমার এলাকার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য আরো নিয়াত করেছি, কিছু দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে। আমার এই সব নিয়াত পুরন করার মালিক আল্লাহ। যদি আল্লাহ চায় আমার নিয়াতগুলি পুরণ করা পর্যন্ত আমার হায়াত দারাজ করতে, তাহলে আমি নিশ্চয়ই কামিয়াবী হাসিল করবো।

আমি হাউস বিল্ডিংস করপোরেশনের ঋন শোধ দিয়ে আমার বাড়িটা মুক্ত করতে পানি নাই। এরশাদ সরকারের আমলে একটা অর্ডিন্যাস জারী করা হয়েছিল যে, কারো সপরিবারে মাথা গোঁজার ঠাঁই বাসগৃহ থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না। ৫ ডিসিমাল জমির উপর ৮ শত স্কোয়ার ফুটের বাড়িটা আমার মাথা গোঁজার একমাত্র ঠাঁই। যদি কোনো সরকারের শিরঃপীড়ার কারন হয়, তাহলে হয়তো আমার ওয়ারিশদেরকে এ বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করাও হতে পারে। সেটা দেখার ভার রইলো দুনিয়ার মানুষের।

বিভিন্ন খেলাফী ঋনের লক্ষ লক্ষ টাকা মাফ করা হয়েছে এদেশের বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে। আবার সরকারীভাবে সম্পদ সম্পত্তি দান করা হয়েছে বহু বহু মানুষকে। তারা এমনি ব্যক্তি যাদের নাম দেশবাসী জানেনা। কিন্তু সভ্যতা যতদিন আছে, ততদিন আমার কালজয়ী গ্রন্থগুলি মানুষের চিন্তা ও চিত্তের খোরাক জোগাবে। নতুন দিকনির্দেশনা নিশ্চয়ই দেবে।

www.pathagar.com

কাগমারী কলেজের প্রতিষ্ঠা উন্নয়নে এবং প্রতিষ্ঠা কর্মচারী নিয়োগের মূলে সাবেক অধ্যক্ষ জনাব এ, জলিলের সাথে আমার অবদান বোধকরি কেউই অস্বীকার করবে না। কিন্তু নতুনভাবে সরকারী চাকুরীর পাইপের মধ্যে ঢুকে দেখতে পেলাম, যোগ্য অযোগ্যের বালাই নাই। পাইপের মধ্যে আমার সামনে ভেড়া ছাগল যে-ই থাক, তার প্রমোশন না হওয়া পর্যন্ত আমার প্রমোশনের যো নাই। তার ফলে যে সহকারী অধ্যাপক পদে ঢুকলাম, সেই একই পদে ষোল বছর ঘানি টেনে বেরিয়ে এলাম অর্থাৎ অবসর গ্রহন করলাম। আমার এল, পি, আর থাকা কালেই বেগম খালেদা জিয়ার সরকার প্রমোশনের দুয়ার খুলে দিলেন। দেখতে দেখতে সমস্ত কৃতি-অকৃতি লোকেরা লাফিয়ে লাফিয়ে মগডালে উঠে গেলেন।

আমি যখন চাকুরীতে ঢুকেই বুঝতে পারলাম, এখানে প্রতিভা বিকাশের পথ নাই, তখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে লেখনিকেই মজবুত করে ধরলাম। যদিও ইতি পূর্বেও আমার লেখনি চালনা বন্ধ ছিলনা, কিন্তু এখন সেটাকে আরো কষে ধরলাম। এবং সারা দুনিয়ার মানুষের খেদমতে কিছু রেখে যাওয়ার নিয়াত বেধে মশগুল হয়ে পড়লাম।

আল্লাহ্‌র অসীম মেহেরবানীর ফলে "শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী" এই শিরোনামে আমি পাকভারত বাংলাদেশের কয়েক শত বছরের অতীত ইতিহাস খুঁটে খুঁটে মহাকবি ফেরদৌসির শাহনামার মতো বিশাল কেতাব পয়দা করেছি। শাহনামা যেমন পারশ্যের রাজা বাদশাহের কাহিনী ছন্দ সুষমায় চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে, "শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী" কেতাবেও পাক-ভারত বাংলাদেশের হিন্দু মুসলিম শিখ-খৃষ্টান প্রভৃতি জন নেতাদের জীবনী চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। এই একখানা কেতাব ঘরে থাকলে আশুতোষ দেবের ডিক্‌শোনারীর মতো এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ডিকশোনারী হাতের কাছেই মওজুত আছে বলে মনে হবে। বস্তুতঃ কোনো সাধারন মানুষের জীবনীর উপর এত বিশাল কেতাব দুনিয়ার অন্য কোনো ভাষার আছে বলে আমাদের জানানাই।

আমার এই বিশাল ও বিখ্যাত কেতাবে আমি যে সবারই পছন্দ মাফিক কথা বলতে পেরেছি, এই ফখর করিনা। তবে যারা সংখ্যায় বিপুলভাবে মেজোরিটি, তাদের পছন্দ মাফিক কথাই আমি বলেছি। বিশেষতঃ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় ২০০কোটি মুসলমানের তরক্কি হাসিলের জন্যই আমার কোশেশ।

www.pathagar.com

এই বিশাল কেতাব খানা আমার পেনশন গ্রাচুয়িটির টাকায় ছাপাতে গিয়ে প্রায় লাখ খানেক টাকা ধারদেনা করেছিলাম। কিন্তু পীর মা আলেমা ভাসানী, সৈয়দ এরফানুল বারী, আলহাজ খন্দকার আজিজুল হক বাকা মিয়া, অধ্যাপক মীর সোহরাব আলী, অধ্যাপক আমীর খসরু, ডাঃ মোঃ আবদুস সালাম, এডভোকেট আলহাজ মোঃ আবদুল কদ্দুস, এডভোকেট সৈয়দ আজমল হায়দার, মোঃ জিন্নত আলী, এডভোকেট মোঃ আবদু সাত্তার এডভোকেট কামাক্ষানাথ সেন, বুলবুলখান মাহবুব, অধ্যাপক মাহমুদ কামাল, মোঃ আরফান আলী, প্রমুখের তাৎক্ষনিক সহযোগিতায় এবং বইটি দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রয়ের সুপারিশ পত্র দিয়ে টাংগাইলের ডেপুটি কমিশনার জনাব খন্দকার আবদুল মতিন এবং বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ ইউনুস মিয়া যে দীর্ঘ মেয়াদী মহতী পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলেন, তার বদৌলতে আমি ধার দেনায় জর্জরিত হওয়া থেকে রোখছোৎ পেয়েছি। সেজন্য উপরোক্ত মহৎ ব্যক্তিদের কল্যান কামনায় আল্লাহ্‌র দরবারে আমি হামেশা মোনাযাত করি।

আমার আরো একটি মশহুর কেতাব বাংলাদেশী উপন্যাসের ধারা। এই কেতাবটি ডক্‌টরেট ডিগ্রী লাভের নিয়াতে রচনা শুরু করেছিলাম। কিন্তু যখন কেতাবখানা শেষ হলো, তখন পুনঃপাঠের সময় আমার মালুম হল, এই কেতাবের উপর ডক্‌রেট ডিগ্রী জুটবে না। কেননা, যারা ডক্‌টরেট দেওয়ার ক্ষমতা ধারণ করে বসে আছেন, তারা আমার কথায় খুশী হতে পারবেন না। ইসলাম ও মুসলমানের তরক্কি হাসিল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য–যে উদ্দেশ্য বহু আলেমের এলেমের আওতায় পড়ে না। কাজেই তারা আমাকে কেন ডক্‌রেট ডিগ্রী দিয়ে তাদের কাতারে শামিল করবেন? আমার 'শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী' কেতাব খানাই তো ডক্‌রেট ছাড়াও আরো কোনো মগডালের ডিগ্রী থাকলেও, সেটা হাসিল করতে পারে। কেননা, খালি কথার ফুলঝুরি দিয়ে তো অতো বিশাল কেতাব পয়দা হয় নাই? ঐ বিশাল কেতাবে প্রায় ২৫ পৃষ্ঠা হচ্ছে দলিলের নির্দেশিকা।

যে কওম গুনীজনের কদর জানেনা, সে কওম তো মুর্দা। আমি সেটা মালুম করতে পারি বলেই আমার কোনো আফসোস নাই। যে মুর্দা কওম আমার জীবিতকালে আমার ইজ্জতের কথা ভাবতে পারছে না, সে কওমই একদিন দেখবে যে, তাদের পথের দিশা হয়ে অথৈ সাগরের বাতিঘরের মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে 'শতাব্দীর

www.pathagar.com

জননেতা মওলানা ভাসানী', বাংলাদেশী উপন্যাসের ধারা 'টাংগাইলের ইতিহাস' প্রভৃতি আমারই রচিত কালজয়ী কেতাবগুলি।

আমার টাংগাইলের ইতিহাস খানা শুধু টাংগাইল জেলায় নয়, সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি কেতাবটির ভূমিকায় বলেছিলাম,টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশী কওমের তীব্র প্রাণ স্পন্দন অনুভব করা যাবে টাংগাইলের ইতিহাসে। আমার সেকথা হরফে হরফে মিলে গেছে।

খুলনা, কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহী, মোমেনশাহী, কিশোরগঞ্জ, বাখরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, পাবনা, প্রভৃতি জেলার ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলি দ্বিতীয় সংস্করনে পা দেওয়ার নছিব পায় নাই। অথচ টাঙ্গাইলের ইতিহাস ৪র্থ সংস্করণ শেষ হতে চলছে। ৫ম সংস্করণ ছাপিয়ে না গেলে একদিন টাংগাইলবাসী হায় আফসোস করতে বাধ্য হবে।

ইছায়ী ১৯৭৭ সনে টাংগাইলের জনপ্রিয় ডেপুটি কমিশনার জনাব শেখ হাবিবুল্লাহর মদদ মেহেরবানী ও অর্থানুকূল্যে টাংগাইলের ইতিহাস প্রথম সংস্করন প্রকাশিত হয়। তারপর টাংগাইলের ডেপুটি কমিশনার জনাব মোঃ রেজাউল ইসলামের মদদে টাংগাইলের ইতিহাস দ্বিতীয় সংস্করন প্রকাশিত হয়। তারপর টাংগাইলের কৃতিসন্তান দারাজ দিল মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসানের মদদ মেহেরবানী ও অর্থানুকূল্যে টাংগাইলের ইতিহাস তৃতীয় সংস্করন প্রকাশিত হয়। তারপর টাংগাইলের ডেপুটি কমিশনার জনাব মোঃ গোলাম মর্তুজা ও এ, এস,এম, মোবাইদুল ইসলাম প্রমুখের মদদে টাংগাইলের ইতিহাস চতুর্থ সংস্করন প্রকাশিত হয়।

টাংগাইলের ইতিহাসের পিছনে মদদ কারীদের বিষয় ভেবে দেখলেই মালুম করা যায়, ইতিহাস খানা কতখানি জনপ্রিয়! অথচ উপরে যে সব জেলার ইতিহাস প্রসঙ্গ বয়ান করেছি, সেসব ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের সঠিক ইতিহাস ও শান্তি কমিটির ভূমিকার উপর কোনো কিছুই আলোচিত হয় নাই, তবুও কালের তাগিদে সেগুলি পিছিয়ে পড়ে আছে।

সবচেয়ে খাঁটি কথা হচ্ছে, সত্য কথা হামেশাই অপ্রিয়। অথচ সেই অপ্রিয় সত্য কথা বয়ান করেও টাংগাইলের ইতিহাস এর পথ যাত্রার বিরাম নাই। কালকে অতিক্রম করে সে মহাকালের দিকে রওনা দিয়েছে।

www.pathagar.com

আমার আরো দুটি ঐতিহাসিক কীর্তির কথা এখানে বয়ান করতে হয়। কাগমারী কলেজের জন্য আমি একটি প্রতীক তৈরী করে দিয়েছিলাম। প্রতীকের ছন্দটি হচ্ছে এরূপঃ

শাহজামানের স্মৃতি বিজরিত কাগমারী পরগোনা।

আলী–ভাসানীর স্পর্শ লভিয়া আজিকে হয়েছে সোনা।

আমার টাংগাইলের ইতিহাসে প্রতীকটি তৈরীর ব্যাক গ্রাউন্ড অর্থাৎ শানে নজুল ও মানে মতলব দেওয়া আছে।

আমার দ্বিতীয় প্রতীক টাংগাইলের জন্য। প্রতীকটির ছন্দ হচ্ছে এরূপঃ

নদীচর খালবিল গজারির বন। টাংগাইল শাড়ি তার গরবের ধন।।

এ প্রতীকটি রচনার শানে নজুলও আমার টাংগাইলের ইতিহাসে আছে।

টাংগাইলের তৎকালিন এস· ডি· ও· জনাব শামসুল হক সাহেব ১৯৬২ সনে আমাকে কার্য নির্বাহী সম্পাদক করে পাক্ষিক হিতকারী পত্রিকা প্রকাশ করেন। বর্তমান নাট্যবিতানের দোতালায় সুসজ্জিত অফিস ছিল। তার ফোন নং ৩৬। আমি ছিলাম হিতকারীর সম্পাদক ছাড়াও এ· পি· পি· আজাদের নিজস্ব সাংবাদিক হিতকারী অফিস ছিল টাংগাইলের প্রথম প্রেসক্লাব।

আমার উপন্যাসের মধ্যে পলাশভান্ডার উপকথা ও যমুনা চরের বাসিন্দা সামাজিক– সমস্যা ভিত্তিক। দুই উঠোনের ছায়া, বারোয়ারী মন, পদ্মা যমুনা মেঘনা, শেষ প্রহরের চিঠি প্রভৃতি উপন্যাসগুলি মনস্তাত্বিক। আমি কোথাও কোনো পান্ডিত্য ফলাতে কোশেশ করি নাই। সাধারন মানূষের সাথে আজীবন মিলেমিশে থেকে আমি সাধারন মানুষের মুখের জবানকেই আমার প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে এস্তেমাল করে এসেছি। আমি রায়দৌলতপুরের ইমাম বংশের ওয়ারিশ হিসাবে মুসলমানী জবানের সাথে আজন্ম পরিচিত, এবং এই উপমহাদেশের দিশারী মনীষি মওলানা মোহাম্মদ আলীর মতোই, আমি প্রথমতঃ একজন মুসলমান, দ্বিতীয়ত একজন মুসলমান, শেষ্তঃ একজন মুসলমান বৈ, অন্য কিছু নই,–এই মতবাদে ইমান মজবুত রাখতে পেরেছি বলেই আমার কেতাবের ভাষা পাঠ করে কোন্ পন্ডিত বা আলেম নাক সিটকায়, কোন্ আলেম বদনাম রটায়, সেজন্য আমি থোরাই তোয়াক্কা করি। যারা কলিকাতাইয়া আলেমদের তারীফ ও তোহফা হাসিলের জন্য বিস্‌মিল্লাহ বলে শুরু

www.pathagar.com

দিয়ে ওঁম শান্তি বলে শেষ করেন; অর্থাৎ সচেতনভাবে তাদের রচনা থেকে আরবী উর্দু ফারসী লফ্জো ছেঁটে কেটে ফোঁটা কাটা বামুনের ভাষার উমদা মুসাবিদা জাহির করেন জানিনা, তাতে তাদের অন্য আখের গোছায় কিনা, কিন্তু আমি তাদের বাহামের লোক নই। আমি আমার হতভাগা কওমের সাথে শত লাভের হাতছানিতেও গাদ্দারী করতে প্রস্তুত নই ব্রাহ্মন্য কাল্চারের তাবেদারেরা আমার মুন্ড চিবিয়ে খাক্, তাতে আমার কিচ্ছু আসে যায় না। আমার নিজ কওমের যেদিন ঘুম ভাংবে, সেদিন তারা ফজর থেকে এশা তক আমার কথা ইয়াদ করবেই–সেদিন আমি জান্নাতেই থাকি আর যেখানেই থাকি।

কাগমারী কলেজটি টাংগাইলের শহরতলীতে গ্রামীন পরিবেশে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিষ্ঠা করে তিনি সেই কলেজের আধা মাইল দুরে অপর একটি গ্রামীন পরিবেশ সন্তোষ রাজবাড়ির আঙিনায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। আমি সেই কাগমারী কলেজে আমার সারা জিন্দেগী অতিবাহিত করে এখন অবসর জিন্দেগী কাটাচ্ছি টাংগাইল শহরে একটি বাড়ি করে।

আমার টাংগাইলের ইতিহাস টাংগাইল বাসীর শির উন্নত করেছে সারা দুনিয়ায়। সে জন্য টাংগাইল বাসীর তরফ থেকে তাদের কতিপয় কৃতি সন্তান টাংগাইলের ডেপুটি কমিশনার জনাব খন্দকার আব্দুল মতিন এর পৃষ্টপোষকতা ও সভাপতিত্বে টাংগাইলের ইতিহাসে এই প্রথম বারের মতো বিশেষ শানশওকতের সংগে জমজমাট অনুষ্টানাদির মাধ্যমে "গুনীজন সম্বর্ধনা" প্রদানের সময় আমাকেও সম্বর্ধনা প্রদান করেছেন। বিগত ৭ই জানুয়ারী, ১৯৯৪ ইছায়ী সনে লায়ন মোঃ নজরুল ইসলাম ; লায়ন এস, এম, শাহজাহান শিরাজ তালুকদার এবং নাজ ট্রাভেল এন্ড ট্যুরস লিঃ এর বাবুল আরেফিন, মোঃ আব্দুর রশিদ সিদ্দিকী, ডাঃ জয়নুল আবেদীন, মোঃ শাহাবুদ্দীন, মোমেনুল ইসলাম মিলন, মনজুর আহমদ বুলবুল প্রমুখ টাংগাইলের 'গুনীজন' সম্বর্ধনার আঞ্জাম করেছিলেন। সভাপতি ছিলেন টাংগাইলের ডেপুটি কমিশনার খন্দকার আব্দুল মতিন, এবং প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন। প্রত্যেক গুনীজনকে একটি স্বর্ণপদক একটি এলবাম একটি ফুলের তোড়াও একটি ক্যালেন্ডার দিয়ে ইজ্জত প্রদান করা হয়। কলেজের শিক্ষক হিসাবে জনাব প্রিন্সিপাল এম,এ, জলিল,জনাব প্রিন্সিপাল হুমায়ূন খালিদ, অধ্যাপক মীর সোহরাব আলী, স্কুলের শিক্ষক হিসাবে জনাব আবুল কালাম শামসুজ্জামান খান,

www.pathagar.com

জনাব মোঃ শামসুদ্দীন মিয়া, জনাব মদনমোহন গোস্বামী, জনাব দুঃখীরাম রাজবংশী, জনাব মোসলেম উদ্দিন, সাহিত্যিক হিসাবে জনাব ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, জনাব মফিজ-উল হক, জনাব খন্দকার আব্দুর রহিম (এই গ্রন্থকার), জনাবা হেলেনা খান, কবি হিসাবে জনাব আবদুস সাত্তার, জনাব মুফাখখারুল ইসলাম, জনাব আল মুজাহিদী, জনাব ডক্টর মাহবুব সাদিক, ডাক্তার হিসাবে জনাব প্রফেসর মির্জা মাজহারুল ইসলাম, জনাব ডাঃ এইচ, আর,খান, সাংবাদিক হিসাবে জনাব মীর নূরুল ইসলাম, জনাব কামরুল হাসান চৌধুরী, নাট্যকার হিসাবে জনাব মামুনুর রশিদ, জনাব গোলাম আম্বিয়া নূরী, সমাজ সেবক হিসাবে মরহুম আলহাজ্জ তাজউদ্দিন মিয়া, জনাব মওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম রাজী, ক্রীড়া সংগঠক হিসাবে জনাব অধ্যাপক গোলাম রসূল মোল্লা, জনাব চঞ্চল নন্দী, জনাব ফরিদা আনোয়ার প্রমুখ ২৭ জন "গুনী" ব্যক্তি টাংগাইল জেলায় সর্ব প্রথম সার্বিকভাবে তাজিম লাভ করেন। যদিও আমি সিরাজগঞ্জের অধিবাসী হিসাবে আমার পরিচয় আমার প্রতিটা গ্রন্থেই রেকর্ড করে রেখেছি, তবুও টাংগাইলের অধিবাসীরা তাদের প্রানঢালা সম্বর্ধনা আমাকে প্রদান করে তাদের প্রতি আমার গভীর শুকরিয়া জাহিরের মওকা করে দিয়েছেন।

টাংগাইলে আমার আরো দুএকটা অবিস্মরণীয় কীর্তি আছে। তার মধ্যে টাংগাইল ক্লাব পুনর্গঠন এবং ক্লাবের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের বিষয়টা নগন্য নয়। ইছায়ী ১৯১২ সনে টাংগাইলের এস, ডি, ও পদস্থ অফিসার ও অভিজাত ব্যক্তিদের সান্ধ্যকালিন চিত্তবিনোদনের জন্য একটি ক্লাব বা মিলনায়তন কায়েম করেছিলেন। ক্লাবটি পরিচালনার জন্য ইংরেজিতে রচিত একটি গঠনতন্ত্র ছিল। আমি ১৯৫৮ সনে কাগমারী কলেজে যোগদান করার অল্প কিছু দিন পরই উক্ত ক্লাবের মেম্বর হয়েছিলাম। আমি ঐ ক্লাবে প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত হাজিরা দিতে গিয়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহবত লাভ করেছি। তৎকালে এস, ডি, ও মুন্সেফ এস, ডি, পি, ও সহ পদস্থ অফিসার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মশহুর প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর বড় ভাই এডভোকেট এবাদত আলী খান, খন্দকার আব্দুস সামাদ এম, এ, বি-এল, এম, এন, এ, এডভোকেট এরশাদ আলী খান, এডভোকেট সুকুমার নিয়োগী, এডভোকেট সুধীর রায় প্রমুখের সাথে আমার পরিচয় গভীর হয়েছিল। সে আমলে টাংগাইল ক্লাবের গঠনতন্ত্র মোতাবেক সেকেন্ড অফিসার হতেন সেক্রেটারী এবং পাবলিকের মধ্যে হতেন এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী। আমি কাগমারী

www.pathagar.com

কলেজের নবীন অধ্যাপক অবস্থায় যে সময় টাংগাইল ক্লাবের এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছিলাম, তখন থেকে ব্যাপকভাবে টাংগাইলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আমার মিল মহববত পয়দা হয়েছিল। জনাব নূরুর রহমান খান ইউসুফজী বি-এল, এম, এল-এ, মওলানা হেকিম হাবিবুর রহমান, জনাব মোঃ আব্দুল জলিল খান, মির্জা আশরাফ আলী, আলহাজ্জ এমদাদ আলী খান, করটিয়া সাদত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এ, এফ, এম, খলিলুর রহমান, জননেতা আব্দুল মান্নান, নিজাম উদ্দিন আহম্মদ মোক্তার, খোদা বক্স মোক্তার, নিকুঞ্জ বিহারী সাহা, অজিত কুমার হোম, ক্ষিতিশ চন্দ্র পাল, মহেন্দ্র নাথ পাল, আব্দুল জববার মোক্তার প্রমুখের সাথে আমার পরিচয় ছিল অনেক গভীর। বয়সের ব্যবধান ভুলে টাংগাইলের বহু প্রবীন ব্যক্তি কেন যে আমাকে প্রীতির সহবত দান করতেন, সেটা তারাই ভাল ওয়াকিবছিলেন।

১৯৭১ সনে টাংগাইল ক্লাব মিলিটারীদের এক্তিয়ারে চলে যায়। ১৯৮১ সনে টাংগাইলের ডি,সি, জনাব নূর আহমেদ হাবিবুল্লাহ উক্ত ক্লাবের কর্তৃত্ব আমাদের হাতে তুলে দেন। আমি, খন্দকার বদর উদ্দিন এম, পি, সৈয়দ আবদুল খালেক, হামিদুল হক মোহন, আবদুস সালাম পিন্টু এম, পি, অধ্যক্ষ কাজী আতাউর রহমান, মরহুম এডভোকেট মিয়া মোঃ নূরুল ইসলাম, মরহুম এডভোকেট নঈম উদ্দিম আহমেদ, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসাক, অধ্যাপক জহুরুল ইসলাম খান, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম খান, অধ্যাপক আমিনূল ইসলাম, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক আমীর খসরু, অধ্যাপক হাবীবুল্লাহ ভূয়া, অধ্যাপক মোঃ জয়নাল আবেদীন (সাদত কলেজ), অধ্যাপক মোঃ জয়নাল আবেদীন (কাগমারী কলেজ), অধ্যাপক গোলাপ হোসেন দেওয়ান, অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ চাকলাদার, অধ্যাপক আবদুর রশিদ, অধ্যাপক গোলাম রসূল মোল্লা,আলহাজ্জ খন্দকার আজিজুল হক বাকামিয়া, আলহাজ্জ হানিফ উদ্দিন আহমেদ, ডাঃ এইচ আর খান, সৈয়দ আবদুল্লা হেল ওয়াসেক এডভোকেট, মোঃজিন্নত আলী মিয়া, বুল বুল খান মাহবুব, এডভোকেট সিরাজুল হক তালুকদার, এডভোকেট সৈয়দ আজমল হায়দার, মোঃ শামসুল হক (পৌর পিতা), অধ্যাপক শামসুল হক, মোঃ আবুল কাশেম ভূয়া, মোঃ হায়দার আলী, মোঃ হারুন-অর-রশিদ, খন্দকার নাজিমউদ্দিন, খন্দকার সাইদুর রহমান ম্যাথন, খালেকজ্জামান খান লাবু, শাহনূর ইসলাম খান, আবু কায়সার মোল্লা, মোঃ খোরশেদ আলম,

www.pathagar.com

এডভোকেট কামাক্ষা নাথ সেন, সৈয়দ আবদুল গনী, এডভোকেট এস, এম, আসলাম, মোঃ নূরুল ইসলাম, এম, এ, হামিদ, জাহাঙ্গীর হোসেন, অধ্যাপক খলিলুর রহমান প্রমুখের আন্তরিক সহযোগিতায় টাংগাইল ক্লাব পুনর্গঠন করেছিলাম। অতঃপর আমি বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে ক্লাবের জন্য বাংলায় গঠনতন্ত্র রচনা করে দিয়েছিলাম। ছোট কাল থেকে টাংগাইল ক্লাবের সাথে জড়িত ছিল ক্লাবের পিওন জুড়ান আলী। ক্লাবটির কর্তৃত্বে রদবদল ঘটলে তার চাকুরীও চলে যায়। আমি জুড়ান আলীকে ক্লাবের প্রতি তার অকৃত্রিম দরদের জন্য পিওনের চাকুরীতে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসি। সেই থেকে এখন পর্যন্ত জুড়ান আলী ও তার ছেলে হিট্‌লু এই ক্লাবের সংগে মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধআছে।

উল্লেখ করার মতো টাংগাইলে আমার আরো একটা কাজ আছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, এডভোকেট এবং জোতদার শ্রেনীর বহু লোক বেপারী পাড়ায় জমি কিনে বাড়ি ঘর তৈরী করে বসবাস করছেন। ইং ১৯৭৯ সনে আমিও তাদের সংগে শরীক হই। সিরাজগঞ্জ শহরের দোয়াতবাড়ীতে অবস্থিত আমার বাড়ির একমাত্র টিনের ঘরটি ভেংগে এনে এখানে বেপারী পাড়ায় কেনা আমার জমির উপর কায়েম করি। তারপর ইং ১৯৮০ সনে হাউস বিল্ডিং করপোরেশন থেকে লাখ খানেক টাকা লোন নিয়ে সেখানে একতালা ইমারত তৈরী করি। ঐ সময়ই বেপারীপাড়া যে রোডের পাশে আমার বাড়ি, সেখানে সরকারী এতিমখানা থাকায় আমি উহার নাম রেকর্ড করাই এতিমখানা রোড হিসাবে। আমার একাজে সহায়তা করেন, তৎকালীন টাংগাইলের পৌরপিতা জনাব মোঃ শামসুল হক এবং পৌরসভার কর্মচারী জনাব আবু সাঈদ মিয়া ও প্রধান সহকারী জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন, মোঃ আবু কায়সার প্রমুখ। এতিমখানা রোডের পশ্চিম পাশে বাগান বাড়ী অবস্থিত। সেই বাগান বাড়িকে কেন্দ্র করে আমরা প্রথমে 'বাগান বাড়ি সমাজ' এবং পরে সেই সমাজের নিজস্ব মসজিদ কায়েম করি। অতঃপর 'আমি বাগানবাড়ী মসজিদ ভিত্তিক সমাজের' জন্য প্রতিবছর কোরবানীর চামড়া বেচা টাকার ষাট ভাগ জমা করে একটি কল্যান তহবিল চালু করি।

এই 'বাগান বাড়ি সমাজ ও মসজিদ' কায়েমে আমি যাদের সাথে শরীক থেকে অক্লান্ত মেহনত করেছি, তারা হচ্ছেন জনাব শামসুদ্দিন মিয়া, মোঃ খোরশেদ আলম,

www.pathagar.com

এডভোকেট সোহরাব হোসেন, এডভোকেট এ, বি, সিদ্দিকী, জনাব আবু তাহের খান মাখন, অধ্যাপক এম, এ, লতিফ, মোঃ জিন্নাত আলী মিয়া মোঃ বেলায়েত হোসেন, মোহাম্মদ আলী, মোঃ আবু সাঈদ, মোঃ আমীর হামযা, মোঃ আতোয়ার রহমান, ডাঃ আবদুর রহমান তালুকদার (ডাঃ) আবদুস সামাদ, মোঃ ওয়াজেদ আলী তালুকদার, মোঃ বাকী মিয়া, মোঃ সোলায়মান মিয়া, মোঃ ইব্রাহিম মিয়া, মোঃ আবুল বাশার, মোঃ আবদুল বারী, মোঃ ফরহাদ খান, মোঃ মোকাদ্দেস আলী, আমির হোসেন এবং বাগানবাড়ীর অন্যান্য বাসিন্দা, যাদের অবদান চিরকাল ইয়াদ করা হবে বলে আমি মনে করি।

অনাদি কাল থেকে ভাংগা গড়ায় ওস্তাদ বিশাল যমুনা নদীর পশ্চিম পাড়ে সিরাজগঞ্জ আমার জন্মস্থান,পূর্বপাড়ে টাংগাইল আমার কর্মস্থান এবং বাসস্থানও বটে। একটি নদীর দুটি তীর যেন দুটি স্নেহের হাত সিরাজগঞ্জ ও টাংগাইলরূপ দুটি আদরের সন্তানের কাঁধে রেখে শাসনে ও মমতায় কতকাল অবধি লালন-পালন করে এসেছে তার লেখাজোখা নাই। আফ্রো এশিয়া লাতিন আমেরিকার মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী এবং তাঁর জীবনীকার আমি এই দুটি জেলার মাঝখানকার মনস্তাত্ত্বিক সীমারেখা মুছে একাকার করে ফেলেছি। আমি বিয়ে করেছি সিরাজগঞ্জ শহরের কোপদাসপাড়া গ্রামের শেখ মোঃ নইমউদ্দিনের মেয়ে বেগম নূরজাহান নীনাকে। কোপদাসপাড়া গ্রামটি যমুনা নদী ভেংগে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। আমার শশুর ছিলেন রাজপুত্রের মতো চেহারার মানুষ। কিন্তু লেখাপড়ায় ছিলেন বিমুখ। তিনি বিয়ে করেছিলেন দোয়াত বাড়ী গ্রামের মধু শেখের মেয়ে আমেনা বেগমকে। সেই সূত্রে আমার মামা শশুরের সংখ্যা ছিল ১১ জন। সেই ১১ জন মামা শশুরের মধ্যে জসিম উদ্দিন, মজিবর, শুকুর হাজী, আবদুল আজিজ ও করিম মুন্সী প্রমুখ এবং তাদের সন্তানাদি তারুমিয়া, জহির, রওশন, আকসেদ, ইসমাইল, ইব্রাহিম, হাবিব, হেলাল ,সাইফুল প্রভৃতির মাধ্যমে দোয়াত বাড়ী, জানপুর প্রভৃতি গ্রামের প্রায় সকল মানুষই আমাদের আত্মীয়তার আওতায় পড়ে গেছেন। আমার গ্রামের মরহুম মোঃ সোলেমান তালুকদারের মেয়ে ও মোঃ আবদুল সাত্তারের বোন আমেনা বেগম আমার দ্বিতীয় শ্বাশুড়ী। সে পক্ষে আমার শ্যালক ও শ্যালিকাদের মধ্যে নূরুল ইসলাম দিলীপ, শামিম, নাছির, বাচ্চু ও লাভলী, প্রভৃতির মাধ্যমে এবং তাদের অপর ভাই বোন, মিতা ও রতন প্রভৃতির দ্বারা সিরাজগঞ্জের বুকে ব্যাপকভাবে

www.pathagar.com

আমাদের আত্মীয়তা ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া হোসেনপুরের আবদুর রউফ খানও আমাদের আত্মীয়, আমার খেলার সাথী ও ক্লাশমেট। আমার আর একজন পেসারের দোস্ত নূরুন্নবীখান খ্যাতনামা ডাঃ মহীউদ্দিন খানের ছোট ভাই।

যমুনা নদীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গাবের পাড়া গ্রাম এবং বর্তমানে মাধবপুর গ্রামের বাশিন্দা মোঃ ফরমান আলী সরকার আমার মামা। হাতেম ও মোসলেম আমার মামাত ভাই। আমার মামার আপন ছোট ভায়রা বীর বরুহা গ্রামের মরহুম ইউসুফ আলী খানের কন্যা জামাতা কাকুয়ার আদি নিবাসী মোঃ আবদুস সাত্তার সরকার মাষ্টার। সেই সুবাদে টাংগাইলের প্রথিতযশা এডভোকেট জনাব মোঃ আকবর আলী, ও মশহুর ডাঃ মোশাররফ হোসেন, এডভোকেট সোহরাব আলী, এডভোকেট আবু বকর সিদ্দিকী এবং পদস্থ অফিসার সরকার রমযান আলী প্রমুখ আমাদের আত্মীয়তার গন্ডির ভিতরে পড়েছেন। সম্প্রতি আমার একমাত্র ছেলে খন্দকার রাশিদুল হাসান পারভেজ শাদী করেছে টাংগাইলের থানা পাড়া নিবাসী জনাব মোঃ ফজলুল হক এর মেয়ে রুবী বেগমকে। পারভেজের শ্যালিকা মীনা ও শিউলি এবং তার একমাত্র শ্যালক শাহিন।

সম্প্রতি আমার একমাত্র মেয়ে নূরুন্নাহার পারভীন মুন্নির শাদী হয়েছে এই কেতাবে বার বার উল্লেখিত অধ্যাপক এম, এ, খালেক সাহেবের বড় ছেলে মোঃ নাজমুল হুদা তাজ মিয়ার সাথে। অধ্যাপক এম, এ, খালেক কাগমারী কলেজে আমার কলীগ (সহকর্মী) ছিলেন। তিনি আমার মামাত বোনের জামাই ইতিপূর্বে উল্লেখিত সাত্তার মাষ্টারের ভাইপো। সেই সুবাদে পুরোনো আত্মীয়। সম্প্রতি তাঁর বড় ছেলে নাজমুলের সাথে আমার একমাত্র মেয়ে মুন্নীর শাদী হওয়ায় সেই আত্মীয়তা আরো ব্যাপকতা লাভ করেছে। আমার বিয়াই খালেক সাহেব শাদী করেছেন বাশাইল থানার দাপনা জোড় গ্রামের মোঃ নাজিমুদ্দি দারোগা সাহেবের মেয়ে হামিদা বেগম কে। সেই সুবাদে বাদশা মিয়া, হাবিবুর রহমান মোঃ জিল্লুর রহমান, দেওয়ান আবদুল মোতালেব, মোঃ আবদুল বারী ও তার ছেলে মোঃ হারুন-অর-রশিদ, অধ্যাপক মাহমুদ কামাল, ও আরো বহু ব্যক্তি আমাদের আত্মীয়তার গন্ডিতে পড়েছেন। আমার বিয়াই খালেক সাহেবের ১ম ছেলে মোঃ নাজমূল হুদা (তাজমিয়া) আমার মেয়ের জামাই, তার দ্বিতীয়ছেলে মোঃ কামরুল হুদা সেলিম এম, এসসি (ইতিহাস) ফাষ্ট ক্লাস, পি, এইচডি গবেষনারত,

www.pathagar.com

তৃতীয় ছেলে শামসুল হুদা শামিম বি, এ, শ্রেনীর ছাত্র। বিয়াই সাহেবের প্রথম মেয়ে অধ্যাপিকা নাজমুন্নাহার এম, এ, তাঁর স্বামী খ্যাতিনামা সাংবাদিক খন্দকার আবদুল মোমেন এম, এ বি-এড, তাঁর ২য় মেয়ে শামসুন্নাহার বি-এ, তার স্বামী এস, এম, তরীকুল ইসলাম এম,এ, ফাষ্ট ক্লাশ রিসার্চ অফিসার, তথ্য দপ্তর, সউদী আরব, রিয়াদ, তাঁর তৃতীয় মেয়ে কামরুন্নাহার বি,এ, অনার্স, এম-এ সমাজ বিজ্ঞান, তার স্বামী মোঃ আবদুস সবুর খান, বি, এসসি ইনজিনিয়ার, চট্টগ্রামে চাকুরী রত। তাঁর চতুর্থ মেয়ে নূরুন্নাহার তসলিমা (লীমা) বি-এ ক্লাশের ছাত্রী।

একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করার মতো। আমার এক ছেলে ও একটি মেয়ে। তারা হামেশা বই পাঠে মশগুল থাকে ; কিন্তু কেউই একটা গল্প-কবিতা লিখতে পারে না। আমার বিয়াই অধ্যাপক খালেক সাহেব পড়েন খুব; কিন্তু লেখক হওয়ার কোশেশ করেন না। কিন্তু তাঁর চারিটি মেয়েই তুখোড় লেখিকা। আমি তাদের প্রকাশিত লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি।

আমি আল্লাহ পাকের কাছে লাখো শুকরিয়া আদায় করছি এই কারনে যে, আমার জীবনী লেখা এবং প্রকাশ করার নিয়াত আল্লাহ কবুল করেছেন। দুনিয়া জোড়া আল্লাহর কোটি কোটি বান্দার মধ্যে কয়জনের নছিবে এত বড় কামিয়াবী হাসিল হয়! আমি কোনো মালদার লোক নই। আজ পর্যন্ত দিন এনে দিন খাওয়া ছাড়া আমার নছিবে কোনো জমানো টাকা কড়ি নাই। ব্যাংকে আমার প্রত্যেকটা একাউন্ট শূন্য।

শুধু আমার প্রবল ইচ্ছাশক্তি বা Will force আমার সম্বল। তবুও আল্লাহ্ পাক যে আমাকে কামিয়াবী হাসিল করালেন, এটাও হয়তো মানব সমাজে প্রেরনার উৎস হয়ে থাকবে। কাজেই আল্লাহ্ পাকের কাছে পুনরায় লাখো শুকরিয়া আদায় করছি।

আমার জীবনী পাঠ করার পর কেহ হয়ত সওয়াল জারি করবেনঃ আপনার আগাগোড়া জীবনী পাঠ করলাম, আপনার জীবনের লক্ষ্য কী What is your aim of life- অর্থাৎ ৮ম শ্রেনী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পর্যন্ত যে Essay টা লিখে এলাম, তার তো কোনো আইডিয়া পেলাম না ? তার জবাবে বলতে হয় যে, সত্যই আমি শরমেন্দা বোধ করছি।

আমার জীবনীর মারফত যদি পাঠকগনকে একথা সম্ঝাতে পেরে থাকি যে, আমাকে আল্লাহ যা করতে চেয়েছেন, আমি তাই হয়েছি, আমার দ্বারা আল্লাহ যা করাতে চেয়েছেন, আমি তাই করেছি, তাহলেই আমি শুকুর আল্হাম্দো লিল্লাহ বলবো। আল্লাহ যদি বাংলাদেশী কওমের তাহযিব-তমদ্দুন হেফাজতের খাতিরে

www.pathagar.com

ইন্‌কেলাবী ভূমিকা রাখার জন্য আমাকে হামেশা নিয়োজিত রেখে থাকেন, তাহলে আমি দেশ ও কওমের উপর ব্রাহ্মন্য ও নাস্তিক্য বাদী সাংস্কৃতিক হামলার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারন করেই যাবো।

আমি দারাজকণ্ঠেই জাহির করবোঃ বাংলাদেশী কওম কখনো মুর্দা কওম নয়। ছিন্ন করো তোমার গর্দান থেকে ১৯৭২ সন হতে পরিয়ে দেওয়া ব্রাহ্মন্য কাল্‌চারের শৃংখল ? হুসেন শাহ্‌, আজম শাহ ও ঈশা খাঁ যে কওমের ইমামতী করে দিল্লীর বিরুদ্ধে আজাদী কায়েম রেখেছিলেন, ঢাকার সোনার গাঁয়ে পারশ্যের বুলবুল মহাকবি হাফিজকে দাওয়াত পাঠিয়েছিলেন, আমরা সেই সে-জাতি।

—ঃ খতম ঃ—

www.pathagar.com

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
খন্দকার
প্রকাশনী
১৯৭৩ইং